বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

মৌলভীবাজার

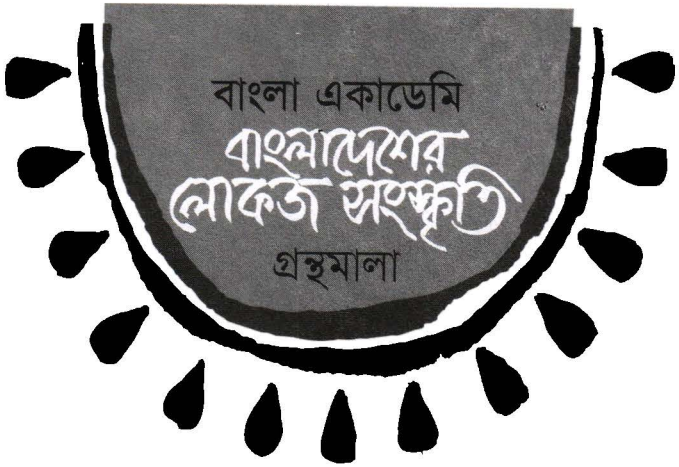

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

মৌলভীবাজার

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী
মাহফুজুর রহমান

সংগ্রাহক
আহমদ সিরাজ
দীপংকর মোহান্ত
অমলেন্দু কুমার দাশ
সৌমিত্র দেব
হাসানাত কামাল

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
মৌলভীবাজার

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৪

বা/এ ৫৩২১

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
কর্মসূচি পরিচালক
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ূম চৌধুরী

মূল্য
দুইশত বিশ টাকা মাত্র

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA: MOULBHIBAZAR (Present state of Folklore in Moulbhibazar District), Chief Editor : Shamsuzzaman Khan. Managing Editor : Md Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan. Publication : Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka-1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : 220.00 only. US $: 7

ISBN-984-07-5330-4

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের

www.pathagar.com

কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *ময়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *ময়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ গ্রন্থমালা ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে

www.pathagar.com

স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

www.pathagar.com

১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যে-সব তথ্যাদি/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।

ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্কওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রাপথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

www.pathagar.com

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে æFrom the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে ফিল্ড-ওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা

www.pathagar.com

(audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয়

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলজ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা,

www.pathagar.com

খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাস্তরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মানিক পির (সাতক্ষীরা), পিরবাড়ি (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুরপুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা, বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর),

www.pathagar.com

গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মণ্ডা (মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), বরিশালের উজিরপুরের গুঠিয়ার সন্দেশ এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহর্‌রমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. উপাদানের বিন্যাস : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি:

www.pathagar.com

ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস
২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।
৩. এলাকার কবি সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম। তবে লোককবি ও পথুয়া সাহিত্যের কথা থাকবে।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা কাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাটকবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথিপাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকখাদ্য (folk food), ঘ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঙ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত ও গাথা (folk Song & ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখী উৎসব, ২. ঈদ উৎসর, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছডি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য ও লোকনৃত্য (folk theatre & folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. ঘাটুগান, ২. গাজির গান, ৩. বাইদ্যা বা বাইদ্যানীর গান, ৪. পালাগান, ৫. একদিল গান, ৬. কবিগান, ৭. জারিগান, ৮. বিষহরির পাঁচালি। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-মেয়েলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. মহিলা খেলা, ৮. পলাগুঞ্জি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র (folk medicine & chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকছড়া ও ভাটকবিতা (folk rythm & vat poem)

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার (folk belief & folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো

www.pathagar.com

পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাহক, সংকলক ও প্রধান সমন্বয়কারী, বাংলা একাডেমির সংশ্লিষ্ট পরিচালক, প্রধান গ্রন্থাগারিক ও ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, পাণ্ডুলিপি সম্পাদক ওয়াহিদা মোমেন চৌধুরী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ – Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান মৌলভীবাজার জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে মৌলভীবাজারের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-৫৫

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
খ. ভৌগোলিক অবস্থান
গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ঘ. নদ-নদী, হাওর, খাল-বিল
ঙ. বনভূমি ও গাছপালা
চ. জনবসতির পরিচয়
ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা
জ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও বিখ্যাত ব্যক্তি
ঝ. মুক্তিযুদ্ধ
ঞ. লোককবি ও লোকসাহিত্য সংগ্রাহক

লোকসাহিত্য (folk literature) ৫৬-৮৩

ক. লোকগল্প/কিস্‌সা/কাহিনি/রূপকথা/উপকথা
খ. কিংবদন্তি
গ. ভাটকবিতা বা ভাটগান
ঘ. লোকছড়া

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ৮৪-৮৮

লোকশিল্প

১.মৃৎশিল্প
২.শীতলপাটি
৩.মণিপুরি তাঁত শিল্প
৪.কারুশিল্প (বাঁশ-বেতের কাজ)
৫.আগর শিল্প ও আতর শিল্প

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ৮৯-৯০

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ ও লোকঅলংকার (folk costume & folk ornaments) ৯১-৯৪

লোকসংগীত ও গাথা (folk song & ballad) ৯৫-১৭১

ক. লোকসংগীত
১. বারোমাসি
২. সারি গান/সাইর গান/হাইর গান

www.pathagar.com

৩. হুরি বা ফাগুয়া বা দোল-এর গান বা বসন্তের গান
৪. জারিগান
৫. বাউলগান
৬. মঙ্গলা গান
৭. কীর্তন
৮. গাজির গীত
৯. মনসাপূজার গান
১০. ধামাইল ও বিয়ের গান
১১. মুর্শিদি/ফকিরি গান
১২. শোকগাথা
১৩. সহজিয়া
১৪. গাঞ্জার গান
১৫. বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর সংগীত
খ. গাথা

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ১৭২

লোকউৎসব (folk festival) ১৭৩-১৭৯
১. শারদীয় দুর্গোৎসব
২. পৌষ-পার্বণ
৩. রাখাল শাহের আসন বা তলা বা ডের
৪. রাখালতলা ও ভৈরবতলার উৎসব
৫. ওরস
৬. আশুরা উৎসব
৭. মণিপুরী রাস উৎসব
৮. রথযাত্রা
৯. ওয়ানগালা
১০. অন্যান্য উৎসব

লোকমেলা (folk fair) ১৮০-১৮২
১.চড়কপূজার মেলা বা চৈত্র সংক্রান্তির মেলা
২.বারুণী মেলা
৩.শাহ মোস্তফার মেলা
৪.শেরপুরের মাছের মেলা
৫.মাধবকুণ্ড বারুণী মেলা

লোকাচার (ritual) ১৮৩-১৯২

লোকখাদ্য (folk food) ১৯৩-১৯৬

www.pathagar.com

লোকনৃত্য (folk dance) ১৯৭-১৯৮
ক. রাসনৃত্য
খ. থাবানচৌবি
গ. কাটি নাচ
লোকক্রীড়া (folk games) ১৯৯-২০৫
১. লাই খেলা
২. নন দাঁইড়
৩. ডাংগুটি
৪. সাতঘর খেলা
৫. গোল্লাছুট
৬. বন্দি
৭. বাঘবের
৮. ফেছকুনার লেঞ্জ
৯. নৌকা বাইচ
১১. লাঠিখেলা
১১. শক্তি পরীক্ষার খেলা
১২. অন্যান্য খেলা
১৩. বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর প্রচলিত খেলা
লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ২০৬-২১১
১. শব্দকর
২. হিরালী
৩. নমশূদ্র
৪. বাদ্যকর
৫. রুহীদাস
৬. ধোপা
৭. বারই
৮. মেথর
৯. গোয়ালা
১০. নাপিত
১১. কামার
১২. কুমার
১৩. পোদ্দার
১৪. মাঝি
১৫. চা-শ্রমিক

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র (folk medicine & chant) ২১২-২২৪

ধাঁধা (riddle) ২২৫-২৩৭

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) ২৩৮-২৪৫

লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাস (folk belief & folk superstition) ২৪৬-২৪৯

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ২৫০-২৫৫

১. লাঙল
২. জোয়াল
৩. মই
৪. কোদাল
৫. খন্তা
৬. হেইত
৭. ঢেঁকি
৮. গাইল ও ছিয়া
৯. মাছ ধরার যন্ত্র
১০. পালকি
১১. ইমবাক

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

প্রাচীনকালে রাজা চন্দ্র নারায়ণের রাজ্য ছিল মৌলভীবাজার। মৌলভীবাজার নামের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রচলিত ইতিহাস থেকে জানা যায়, অষ্টদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে বর্তমান শহর নিকটস্থ গোবিন্দশ্রী গ্রামে হয়রত শাহ মোস্তফা (র.)-এর বংশধর মৌলভী সৈয়দ কুদরত উল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১০ সালে মনু নদীর পশ্চিম পাড়ে জনসাধারণের সুবিধার জন্য নিজস্ব মিরাশদারি ভুক্ত জমির উপর কয়েকটি দোকানঘর স্থাপন করে ভোজ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেন। এই বাজারে নৌ ও স্থলপথে প্রতিদিন পণ্যদ্রব্য ও লোকসমাগম বৃদ্ধি পেতে থাকে। লোকমুখে বাজারটি *মৌলভী সাহেবের বাজার* নামে পরিচিতি লাভ করে। যার পরিবর্তিত নাম মৌলভীবাজার। বাজারটি পরে বড় হতে থাকে এবং ১৮৮২ সালের এপ্রিল মাসে উক্ত বাজারকে কেন্দ্র করে সাউথ-সিলেট মহকুমা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৬০ সালে সাউথ-সিলেট মহকুমার নাম পরিবর্তন করে মৌলভীবাজার মহকুমা নামকরণ করা হয়। ১৯৮৪ সালে মৌলভীবাজারকে জেলায় রূপান্তর করা হয়।

১৯৮৪ সালের ১ জানুয়ারি মৌলভীবাজার সদর উপজেলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কমলগঞ্জ উপজেলা অতীতে ভানুগাছ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯১২ সালে শ্রীমঙ্গল এবং ১৯২২ সালে কমলগঞ্জকে থানা হিসেবে ঘোষণা করে প্রশাসনিক বিন্যাস করা হয়। ১৯৮২ সালে শ্রীমঙ্গল এবং কমলগঞ্জকে উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করে ফরমান জারি করা হয়।

রাজনগর একটি প্রাচীন জনপদ। ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ভানু নারায়ণ ত্রিপুরার রাজার বিদ্রোহী সামন্ত সরদার চন্দ্র সিংহকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দি করে ত্রিপুরার রাজার নিকট হস্তান্তর করেন। ত্রিপুরার রাজা খুশি হয়ে তাঁকে রাজা উপাধি দান করেন। নতুন রাজার উপাধির সাথে যুক্ত করে রাজধানীর নাম রাখা হয় রাজার নগর বা রাজনগর। ১৯৮৩ সালে রাজনগরকে উপজেলা করা হয়।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন বঙ্গদেশকে দু'ভাগে ভাগ করে পূর্ববঙ্গকে আসামের সাথে যুক্ত করে দেন।

১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে পঞ্চম জর্জ দিল্লি এলে দিল্লির দরবারে বঙ্গবিভাজন রহিত হলো। কিন্তু তৎকালীন শ্রীহট্ট থেকে গেল আসামের সঙ্গে। শ্রীহট্টে তখন ছিল ৪ মহকুমা– সদর শ্রীহট্ট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ। সদর মহকুমার আয়তন বেশি হওয়ায় পরবর্তীকালে ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে এটিকে ভেঙে দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার সৃষ্টি করা হয়। করিমগঞ্জে ছিল ৫টি থানা–করিমগঞ্জ, জলঢুপ, পাথারকান্দি, রাতাবাড়ি ও বদরপুর।

www.pathagar.com

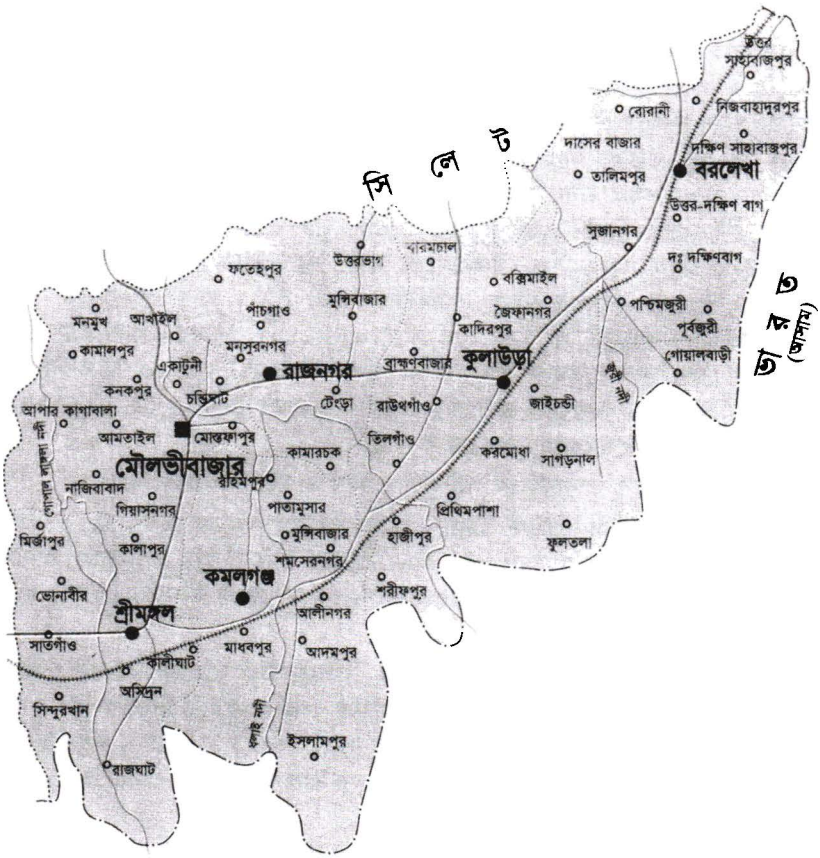

মৌলভীবাজার জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

১৯৪০ সালের ১৮ মে তারিখে জলঢুপ থানাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আর তখনই উদ্ভব হয় বিয়ানীবাজার ও বড়লেখা থানার। ১ জুলাই ১৯৮৩ সালে বড়লেখাকে উপজেলা করা হয়। সমতলভূমিতে বড় এলাকা নিয়ে জনবসতি গড়ে উঠার ফলে কালক্রমে এলাকাটি বড়লেখা নামধারণ করে।

১৯৮২ সালে কুলাউড়াকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়। কুলাউড়া উপজেলার নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। লোকমুখে শোনা যায়– প্রাচীনকালে এক কুলা-বিক্রেতার কুলা ঘূর্ণীবাতাসে উড়ে যায়। বাতাসের মধ্যে কুলা উড়ে যাওয়ার ফলে কুলাউড়ার নামডাক হয়। আবার অনেকের মতে এই এলাকা কুলার জন্য প্রসিদ্ধ বিধায় এই নাম। তাছাড়া অনেকে মনে করেন–কুকিদের ভাষা থেকে কুলাউড়া নাম হয়েছে।

জুড়ী উপজেলা মৌলভীবাজার জেলার সর্বশেষ গঠিত উপজেলা। সিলেট জেলা হতে ৪৮ কিমি. দূরে অবস্থিত এই উপজেলা গঠিত হয় ২৬ আগস্ট ২০০৪ সালে। জুড়ী নদীর কিনারায় গড়ে ওঠা জনপদকেই জুড়ী অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা হয়।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

বিশাল গৌরব ও ঐতিহ্যের অধিকারী এ জেলার আয়তন হচ্ছে ২৬৮২.২৯ বর্গকিলোমিটার। এ জেলার উত্তরে সিলেট জেলার বালাগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলা; দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কমলপুর, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কৈলাশহর, পশ্চিমে হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ ও বাহুবল উপজেলা। ১৯,৯৪২৫২ লাখের মতো মানুষের বসবাস এ জেলায়। এ জেলায় থানা বা উপজেলার সংখ্যা হচ্ছে ৭টি; এগুলো হলো– কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, রাজনগর, কুলাউড়া, বড়লেখা ও জুড়ী। পৌরসভা ৫টির নাম হলো– কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, বড়লেখা, মৌলভীবাজার। এ জেলায় গ্রামসংখ্যা হচ্ছে ২০৩৪টি, ইউনিয়ন হচ্ছে ৬৭টি।

মৌলভীবাজার সদর উপজেলার উত্তরে রাজনগর, পূর্বে কমলগঞ্জ ও রাজনগর, দক্ষিণে শ্রীমঙ্গল এবং পশ্চিমে হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলা। মৌলভীবাজার সদরের আয়তন ৩৪৪ বর্গকিমি.।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলা সদর থেকে ২০ কিমি. দক্ষিণে শ্রীমঙ্গলের অবস্থান। ১৯২৯ সালে শ্রীমঙ্গল বাজার এলাকাকে আরবান এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। শ্রীমঙ্গলে পাহাড় ও ঘন বনাঞ্চল থাকায় বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত ও শীত এখানে পড়ে।

কমলগঞ্জ-শ্রীমঙ্গল প্রাচীন জনপদ হিসেবে খ্যাত। বৃহত্তর সিলেটের অংশ হিসেবে এখানে প্রাচীন অস্ট্রিক জাতির বসবাস ছিল।

রাজনগর উপজেলার উত্তরে সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ, পূর্বে কুলাউড়া, দক্ষিণে কমলগঞ্জ ও পশ্চিমে মৌলভীবাজার সদর উপজেলা। রাজনগর খাল, নদী, হাওর ও পাহাড় বেষ্টিত জনপদ। এখানে বসবাসকারী আদি অস্ট্রেলিয় লোকেরা প্রথম কৃষিসভ্যতার সূচনা করেন।

www.pathagar.com

কুলাউড়া মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা ও প্রশাসনিক অঞ্চল। কুলাউড়া উপজেলার উত্তরে বড়লেখা, জুড়ী ও ফেঞ্চুগঞ্জ, পশ্চিমে রাজনগর ও কমলগঞ্জ, দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা এবং পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা ও আসাম রয়েছে।

বড়লেখা উপজেলা সিলেট শহর থেকে প্রায় ৬৪ কিমি. দূরে অবস্থিত। উপজেলার উত্তরে গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, দক্ষিণে কুলাউড়া, পূর্বে আসাম রাজ্য। ব্রিটিশ আমলে এই অঞ্চলে ঐতিহাসিক নানকার বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এ জেলায় মোগল ও আফগানদের শেষ লড়াই অনুষ্ঠিত হয়েছিল জেলা পতনউষার ইউনিয়নে। আফগান সেনাপতি খাজা উছমান এই যুদ্ধে নিহত হন। তার নামের সঙ্গে কমলগঞ্জের উছমানগড় নামক জায়গাটি চিহ্নিত হয়ে আছে। এছাড়া এ জেলা সিপাই বিদ্রোহের ঝাণ্ডা বা চিহ্ন বহন করছে লাতুর যুদ্ধে। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে মৌলভীবাজার শহরে আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস ও খেলাফত কনফারেন্স হয়েছিল। সেখানে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস-এর সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস, ইন্ডিয়া ওলামায়ে হিন্দ-এর সভাপতি মৌলানা হোসেন আহমদ মাদানী, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ নেতা উপস্থিত থেকে জনগণকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন।

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতি বহন করছে এ জেলার রঙ্গীরকুল আশ্রম– যা কুলাউড়ার পূর্ব পাহাড়ে ১৯২৫ সালে গড়ে ওঠে। এ জেলায় ইতিহাসের বিরাট কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয় জেলার আদমপুর ইউনিয়নের ভানুবিল নামক স্থানে ১৯৩০ সালে। মণিপুরী কৃষকরা ব্রিটিশ ও তাদের পোষ্য জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই আন্দোলনের তদন্তে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-এর তিনজন সদস্য সরেজমিনে ভানুবিলে আসেন। জওহরলাল নেহেরু ও তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জিও সরেজমিন ভানুবিল পরিদর্শনে আসেন।

মোগল আমলে মৌলভীবাজার জেলাসহ সমগ্র সিলেট অঞ্চল বাংলার একটি জেলা হিসেবে শাসিত হয়েছে। ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে বৃহত্তর সিলেটের শহর, বাজার ও গঞ্জকে প্রশাসনিক থানায় পরিচালিত করার প্রস্তাব করা হলে সেই প্রস্তাবে বর্তমান মৌলভীবাজার জেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। জানা যায়, ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ২২ মে লর্ড কর্নওয়ালিশ-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ১০ বর্গকিমি. এলাকা নিয়ে একটা থানা প্রতিষ্ঠা করে একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত করা হলে তখন মৌলভীবাজার এলাকাও সমশেরগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে শাসিত হয়েছে।

১৮৭৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত মৌলভীবাজার এলাকাসহ সিলেট জেলা ঢাকা ডিভিশনের একটা জেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে সিলেটসহ মৌলভীবাজার জেলা আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৮২ সালে মৌলভীবাজার মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে গণভোটের দ্বারা সিলেট জেলার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিসংগ্রামের ভেতর দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়। ১৯৭৮ সালের ২২ এপ্রিল মৌলভীবাজার মহকুমা জেলায় রূপান্তরিত হয়।

www.pathagar.com

জেলার প্রধান কর্মকর্তা হন জেলা প্রশাসক। ১৯৮৪ সালে মৌলভীবাজারের ৬টি থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়। এভাবে সময়ের বিবর্তনে মৌলভীবাজার জেলার প্রশাসনিক রূপান্তর ঘটেছে। পরবর্তীকালে জুড়ী নামে আরও একটি নতুন উপজেলা গঠিত হয়।

ঘ. নদ-নদী, হাওর, খাল-বিল

এ জেলার নদীসমূহের মধ্যে রয়েছে- মনু, বরাক, ধলাই, সোনাই, জুড়ী, কুশিয়ারা প্রভৃতি।

মনু নদী

কুলাউড়া উপজেলার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত মনু নদী অতি প্রাচীন। হিন্দুশাস্ত্রে কয়েকটি পুণ্যশীলা নদীর নাম পাওয়া যায়, এর মধ্যে মনু নদী অন্যতম। হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবতা মনু এই নদীর তীরে বসে শিবপূজা করতেন বলে তাঁর নামে এই নদীর নামকরণ করা হয়। মনু নদীর উৎপত্তিস্থল আসামের ত্রিপুরা পাহাড় থেকে। উত্তর দিকে প্রায় ৬৫ কিমি. প্রবাহিত হয়ে কৈলাশশহর পর্যন্ত গিয়েছে। সেখান থেকে প্রায় ২৫ কিমি. উত্তর-পশ্চিম দিকে লংলা পরগনায় লালবাগ পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে প্রায় ২০ কিমি. প্রবাহিত হয়ে ধলাই নদীর সঙ্গমস্থলে জীবনগঞ্জ পর্যন্ত মিলিত হয়েছে। জীবনগঞ্জ থেকে প্রায় ১০ কিমি. রাজকান্দি ও ইটা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে বালিশিরা পাহাড়ের উত্তর দিক ঘেঁষে মৌলভীবাজার শহরের চাঁদনীঘাট হয়ে সদর উপজেলার ২ নং মনুমুখ ও ৫ নং আখাইলকুড়া ইউনিয়নের উপর দিয়ে মনু নদী প্রবাহিত হয়ে কুশিয়ারা নদীতে মিলিত হয়েছে।

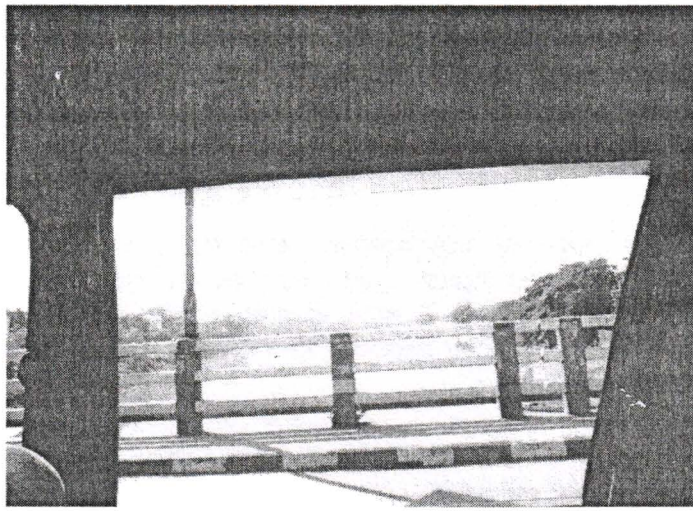

মনু নদী

www.pathagar.com

মনু নদীতে স্থানীয়ভাবে লাছ-বাগড়া মাছ পাওয়া যায়। এই মাছগুলো আশ্বিন মাসের অমাবস্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে উজান বেয়ে উঠত। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তা ধরতে আসত। মনু নদীর তীরে একসময় বাজার বসতো।

বর্ষায় মনু নদী ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। নদীর বাঁধ ভেঙে ঘর-বাড়ি তলিয়ে যায়। বর্ষাকালে মনু নদীতে নৌকাবাইচ হয়। এই নদীতে পূর্বে গঙ্গার ন্যায় পুণ্যস্নান করা হতো। প্রতি বছর শারদীয় দুর্গাপূজায় মৌলভীবাজার শহর ও শহরতলীর প্রায় ২০/২২টি দুর্গামণ্ডপের প্রতিমা বিসর্জন এই মনু নদীর চাঁদনীঘাট ব্রিজের নিকটে হয়। এছাড়া মনু নদীতে হিন্দু নারীরা চৈত্র মাসে বারুণী স্নানের দিনে গঙ্গাদেবীকে তেল-সিঁদুর দিয়ে আরাধনা করে থাকেন।

ধলাই নদী

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব দিকের পাহাড় ধলাই নদীর উৎস। সেখান থেকে উত্তর দিকে বয়ে গিয়ে সিলেট জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে মনু নদীতে মিশেছে। মনু ও ধলা মিলিত হয়ে কুশিয়ারা নদীতে পড়েছে।

বরাক নদী

আসামের মহিপুর ও কাছাড় জেলায় সুরমা নদীর উজান প্রবাহের নাম বরাক। বদরপুরের কাছে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে সিলেটের সমভূমিতে এসে এই শাখা দুটি আবার মিলিত হয়েছে। এই মিলিত ধারা সাধারণ ভাবে বরাক নদী হলেও স্থানভেদে কালনী, ভেড়ামোহনা, বলেশ্বর ও মেঘনা নামে পরিচিত।

জুড়ী নদী

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কোনপাহাড়ি অঞ্চল থেকে নেমে আসা স্রোতধারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে হাকালুকি হাওর দিয়ে কুশিয়ারা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এ স্রোতধারাটি সূচনার দিকে জুড়ী নদী নামে পরিচিত। এই নদীর কোল ঘেঁষে মানুষ বসবাস শুরু করে। নদীর কিনারায় গড়ে ওঠা জনপদকেই জুড়ী অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা হয়।

হাওর

বৃহত্তর সিলেট জেলার বড় অংশ অনেকগুলো হাওর দ্বারা বেষ্টিত। মৌলভীবাজার জেলায় তিনটি বড় হাওর রয়েছে। এগুলো হচ্ছে হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর, কাউয়াদিঘি হাওর। এসব নদী ও হাওর বাংলাদেশের মৎস্যচাষের প্রধান উৎস। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাওর হাকালুকি হাওর কুলাউড়া-জুড়ী-বড়লেখা উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে।

হাওরগুলো নদী ও খালের মাধ্যমে জলপ্রবাহ পেয়ে থাকে। শ্রীমঙ্গলের হাইল হাওরের বাইক্কা বিলে মাছ ও পাখির অভয়ারণ্য রয়েছে। বিভিন্ন জাতের পাখি, মাছ দেখার জন্য পর্যটকরা সেখানে ছুটে যান। এছাড়া হাওরগুলোতে বিভিন্ন মৌসুমে প্রচুর বোরো, আউশ, আমন, শাইল ধান উৎপাদিত হয়। শ্রীমঙ্গলের হাইল হাওর ও

www.pathagar.com

কাউয়াদিঘিতে রয়েছে জীববৈচিত্র্যের অভিনব সমারোহ। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে হাওরের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানকার হাওরগুলো অতিথি পাখিদের সাময়িক বিশ্রামক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অতিথি পাখির আনাগোনা প্রত্যক্ষ করতে প্রতি বছর পর্যটকরা সেখানে ভ্রমণ করেন। অতিথি পাখির মধ্যে কৌড়ি হাঁস, লেঞ্জা হাঁস, জলপিপি, রাজ সরালি, পেটগেন, চকা হাঁস, রাজহাঁস, চামচটুটু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কাউয়া দিঘি

সবচেয়ে সুন্দর ও বড় হাওরটি কাউয়া দিঘি। রাজনগর উপজেলা ও মৌলভীবাজার সদর উপজেলার অংশ নিয়ে কাউয়া দিঘি অবস্থিত। এর পূর্বে রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও ইউনিয়ন, পশ্চিমে আখাইলকুরা ইউনিয়ন, উত্তরে ফতেপুর ইউনিয়ন এবং দক্ষিণে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার একাটুনা ইউনিয়ন। বিশাল এই হাওরের পানি এককালে কাকের চোখের মতো কালো থাকায় হাওরটি কাউয়া দিঘি হিসেবে পরিচিত হয়। কালের বিবর্তনে হাওর বেষ্টিত এলাকায় কৃষিজমিতে ধান উৎপাদনের জন্য মনু নদী প্রকল্প তৈরি হলে মনু নদীর পলিমাটিযুক্ত পানি হাওরে প্রবেশ করায় এখন আর আগের মতো স্বচ্ছ জল নেই। এই হাওরের মাছ খুব সুস্বাদু। প্রতি বছর এই হাওরে নৌকাবাইচ হয়।

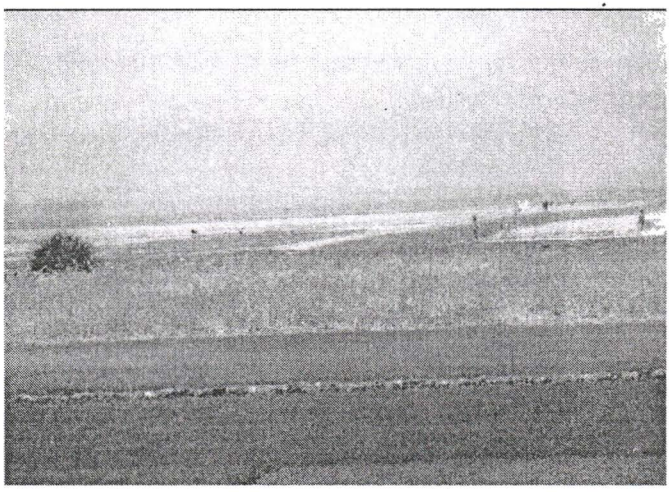

কাউয়াদিঘি হাওর

ছড়া

এখানে শত শত ছড়া রয়েছে। পাহাড় থেকে নেমে আসা ছোট ছোট আঁকাবাঁকা বড় খালকে ছড়া বলা হয়। এর মধ্যে গোপলা ছড়া, নানিয়া ছড়া, বড় ছড়া, লবণ ছড়া, হাতিছড়া, কোদালি ছড়া প্রভৃতি অন্যতম। এই সমস্ত ছড়া বা খাল দ্বারা কৃষকরা বহুবিধ উপকার পেয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত

বড়লেখা উপজেলায় বিখ্যাত মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত অবস্থিত। পাথারিয়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে এই জলপ্রপাত দিয়ে অনরবত পানি গড়িয়ে পড়ছে। সারা বছর এখানে হাজার হাজার পর্যটক আসেন। এখানে রয়েছে প্রাচীন শিবমন্দির, মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত বারুণী স্নানের স্থান হিসেবে খ্যাত। বড়লেখা সদর উপজেলা থেকে ৭/৮ কিমি. দূরত্বে এই নৈসর্গিক সৌন্দর্যের স্থান অবস্থিত। মাধবকুণ্ডের পাশেই রয়েছে খাসিয়া পল্লি।

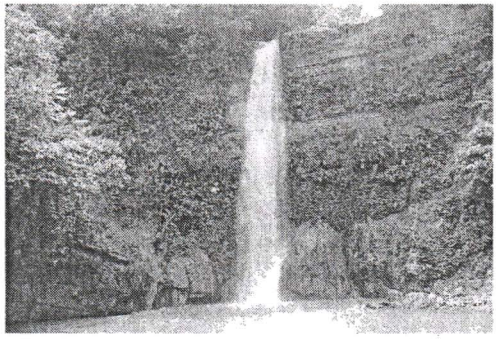

মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত

হামহাম জলপ্রপাত

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের গভীর জঙ্গলে ঘেরা অঞ্চলে হামহাম জলপ্রপাত অবস্থিত।

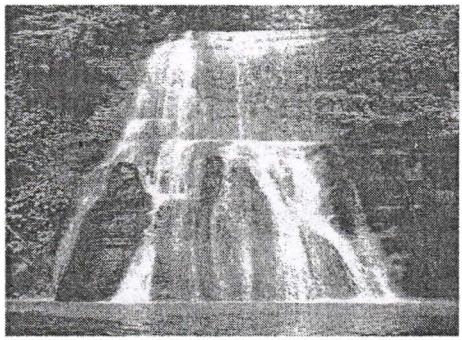

হামহাম জলপ্রপাত

বর্তমানে এই জলপ্রপাতও বেশ দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। জলপ্রপাতের নিকটে ভারত সীমান্ত অবস্থিত। সেখানে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের কিছু লোক বসবাস করে।

মাধবপুর লেক

কমলগঞ্জ সদর থেকে ৬/৭ কিমি. দূরে মাধবপুর লেকটি অবস্থিত। লেকটি ন্যাশনাল টি কোম্পানি মাধবপুর চা-বাগানের অংশ। এই লেকটিতে নীলপদ্মের সমারোহ পর্যটকদের দৃষ্টি কাড়ে। সারা বছর এই দৃশ্য দেখার জন্য পর্যটকদের আনাগোনা লক্ষ করা যায়।

www.pathagar.com

এ জেলার সমতল এলাকায় প্রতিটি বাড়িতেই পুকুর দৃশ্যমান আছে। আছে বিরাট বিরাট দিঘি। এ জেলার বিরাট দিঘিসমূহের মধ্যে আছে কমলগঞ্জের ছয়চিরি দিঘি, হরিনারায়ণের দিঘি, রাজনগরের কমলারাণীর দিঘি প্রভৃতি দৃষ্টিনন্দন ও দর্শনীয়।

ঙ. বনভূমি ও গাছপালা

মৌলভীবাজার জেলার ১০৭ বর্গমাইল এলাকায় সরকারি বনভূমি বিদ্যমান আছে। বাংলাদেশের শতকরা ৯ শতাংশ বনভূমির হিসাব থাকলেও মৌলভীবাজারে আছে ১০ শতাংশ। পাথারিয়া, ষাঁড়ের গজ বা লংলা, রাজকান্দি ও ভানুগাছ অন্যতম বনভূমি। এ জেলার পাহাড়ে নানা ধরনের গাছপালা থাকার কারণে বনাঞ্চল সমৃদ্ধ জেলা হিসেবে খ্যাত। যেমন- গর্জন, শাল, সেগুন, আগর, কাঁঠাল, আম, জাম, জারুল, গামার ইত্যাদি জাতের গাছ বিদ্যমান। এ জেলায় বনভূমি থেকে সেগুন, আম, জাম, জারুল, কাঁঠাল ইত্যাদির কাঠ দ্বারা ঘর-বাড়ির আসবাবপত্র তৈরি হয়। কৃষিজীবীদের নিত্যদিনের কাজের প্রয়োজনে গাইল, ছিয়া, লাঙল, নৌকা তৈরির জন্য এসব কাঠ ব্যবহার করা হয়।

মৌলভীবাজারে অর্জুনসহ বহু ঔষধি বৃক্ষ আছে। হরতকি, বয়রা, আমলকি, কামরাঙ্গা ইত্যাদি সহজেই পাহাড়ে পাওয়া যায়।

ফলজ গাছের মধ্যে লেবু, আনারস, কাঁঠাল, জাম, লিচু, বেল, কামরাঙ্গা, কলা, শরিফা, নারিকেল প্রভৃতি আছে। এগুলো মৌলভীবাজারের সর্বত্রই পাওয়া যায়। বৃহত্তম সিলেট বিশেষ করে মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী, কুলাউড়া, বড়লেখা ও শ্রীমঙ্গল উপজেলার পাহাড়ি এলাকার মাটি কমলা চাষের জন্য খুবই উপযোগী হওয়ায় বিশাল এলাকা জুড়ে কমলার চাষ করা হয়।

মৌলভীবাজারে বিভিন্ন গ্রামে ঐতিহ্যগতভাবে কিছু গাছ ও বাঁশ যুগ যুগ ধরে বিদ্যমান থেকে প্রাকৃতিক আবহে বাড়িগুলো যেন তৈরি করে রেখেছে। মৌলভীবাজারে এখন ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ বাড়িতে লাগানো বনজ, ফলজ বৃক্ষের কাঠ রন্ধনকাজে ব্যবহার করে থাকেন। মৌলভীবাজার জেলা বাঁশ-বেতের জন্য খ্যাত। বাসা-বাড়ি-ঘরের বেড়া ছাড়াও এই বাঁশ কাগজ তৈরির মণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এক সময় ছাতকের মণ্ড কারখানায় বাঁশ সরবরাহের অন্যতম উৎস ছিল মৌলভীবাজার জেলা। এক তথ্যে জানা যায়, এ জেলায় গড়ে প্রতি বছর ১৯৭ কোটি বাঁশ ও ১১ লক্ষ ঘনফুট কাঠ ও জ্বালানি উৎপাদিত হয়। মৌলভীবাজার জেলার আদমপুর, বাঘমারা, ইসলামপুরে মধুচাষ করা হয়। এখানে ছন হয় প্রচুর। এছাড়া মশার কয়েল তৈরিতে এ জেলায় মেন্দা গাছেরও চাষ হয়ে থাকে। এখানে ১৯৬০ সালের জুলাই থেকে রাবার চাষ বা রাবার প্রকল্প চালু হয়। এ জেলার ভাটেরা রাবার বাগান, সাতগাঁও রাবার বাগান, রূপাইছড়া রাবার বাগান, শমসেরনগর রাবার বাগান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জাতীয় উৎপাদনের ২০% রবার এখানে উৎপাদিত হয়।

পাহাড় ও টিলাবেষ্টিত এ জেলায় মূলত সমতলভূমি বিস্তৃত। এখানে টিলাভূমির মধ্যে আদমপুরের পাহাড়, শ্রীমঙ্গলের পাহাড়, জুড়ীর পাহাড় প্রভৃতি পরিচিত।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সর্বাধিক চা-বাগান এ জেলায় অবস্থিত। এখানে ৯০টির মতো চা-বাগান রয়েছে। চা উৎপাদন করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি নদ-নদী থেকে অনুমান করা হয় যে, এ জেলার মাটি হচ্ছে পলল ও জৈব। প্রকৃতপক্ষে এ মাটি বা ভূ-প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়।

এ জেলার মাটি-মানুষ ও প্রকৃতি বৈচিত্র্যময় বিধায় জীবনধারাও বৈচিত্র্যময়। এ জেলার সর্বত্র বিভিন্ন জাতের পাখি দেখা যায়। সচরাচর বাংলাদেশের সব জাতের পাখিই মৌলভীবাজারে দেখা যায়। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে কিছু পাখি এ জেলায় দৃশ্যত কম বা দেখাই মেলে না। এখানে দেশি পাখিসমূহের মধ্যে আছে–দোয়েল, ময়না, টিয়া, তোতা, হরিকল, নীলকণ্ঠ, টেকই বা টুনটুনি, বটই, কুড়ুয়া, বনতিতির, মথুরা প্রভৃতি। এছাড়া আছে হরিণ, বনমোরগ, অজগর, কচ্ছপ, কুঁচিয়া সাপ, গোখরা সাপ, দারাইশ সাপ, হাকানি সাপ প্রভৃতি।

চ. জনবসতির পরিচয়

বাংলাদেশে যত জনগোষ্ঠী আছে মৌলভীবাজার জেলায় এর আধিক্য সর্বাধিক বলে মনে করা হয়। এ জেলায় মূলত বাঙালি জনগোষ্ঠীর বসতি রয়েছে। বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি হিন্দুরা মূল জনগোষ্ঠীর বড় অংশ। তাদের সংখ্যা ৮০ শতাংশের কম হবে না। তবে বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এ জেলাকে মালার মতো ঘিরে রেখেছে। তিন দিকে ভারত সীমান্তবেষ্টিত হওয়ায় জেলার জনবৈচিত্র্য গুরুত্ব বহন করেছে। এখানে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে আছে মণিপুরী, গারো, সাঁওতাল, মুণ্ডা, শব্দকর, রবিদাস, মেথর, খাসিয়া, চা-শ্রমিক প্রভৃতি।

এই চা-শ্রমিকদের মধ্যে অসংখ্য জাত-বর্ণের লোক বসবাস করে, তাদের সংখ্যা মৌলভীবাজারে শতাধিক হবে। যেমন– কৈরি, গোয়ালা, রবিদাস, বর্মা, নুনিয়া, ঘাসী, পাশী, ভর, চাষা, ভুঁইয়া, তাঁতী, মাহারী, বেহারা, কালোয়াড়, পানিকা, বেনবংশী, রাজবংশী, করি, খয়রী, মুড়া, দেশওয়ালী, মালপাহাড়ী প্রভৃতি। তেমনি মণিপুরীদের মধ্যে তিনটি ভাগ যেমন- বিষ্ণুপ্রিয়া, মৈতৈ এবং পাঙ্গন (মুসলিম)।

মৌলভীবাজার জেলার খাসিয়া, গারো, ত্রিপুরী সাঁওতালসহ অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠী পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করছেন। তাদের জীবন ও সংস্কৃতি অবলোকনের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটকরা এসে থাকেন।

ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

খোজার মসজিদ

মৌলভীবাজার জেলা শহর থেকে ৫ কিমি. দক্ষিণ-পশ্চিমে গয়ঘর গ্রামে ঐতিহাসিক খোজার মসজিদ অবস্থিত। প্রায় চারশ বছর আগে মোগল শাসকদের দ্বারা এই মসজিদটি নির্মিত হয়।

মসজিদের বাইরে এবং ভিতরে ফারসি ভাষায় ফলক লেখা রয়েছে। বাইরের ফলকটি কে বা কারা ধ্বংস করে ফেলেছে কিন্তু ভিতরে লেখাগুলো আজও অক্ষত

www.pathagar.com

রয়েছে। মসজিদের নির্মাণ-শৈলী খুবই সুন্দর। দূর-দূরান্ত থেকে বহু দর্শনার্থী এই মসজিদ দেখার জন্য প্রতিদিন ছুটে আসেন।

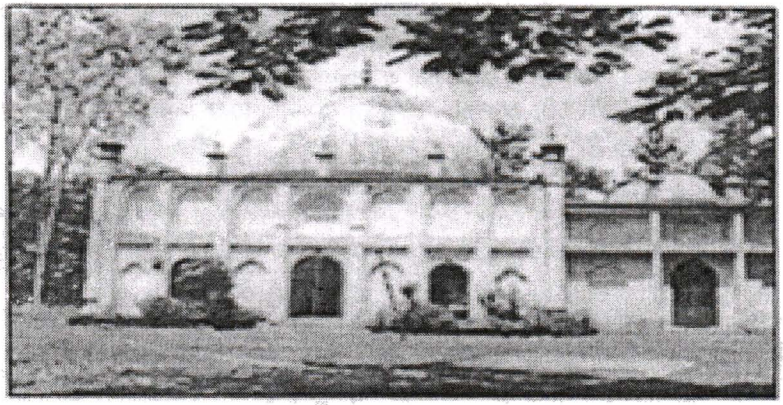

খোজার মসজিদ

ঐতিহাসিক সারদা হল

রাজনগর উপজেলার উত্তরভাগ গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান সারদাচরণ শ্যাম পেশায় ছিলেন উকিল। শ্যাম পরিবারের আর্থিক অবস্থা জমিদারের মতো না হলেও এ অঞ্চলের সব চেয়ে শিক্ষিত পরিবার হিসেবে পরিচিত ছিল। সিলেট শহরে প্রবেশ করতে কীন ব্রিজের উপর দিয়ে যেতে হয়। ব্রিজের শেষ মাথায় আলী আমজাদের ঘড়ির উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি বৃহৎ দালান পরিলক্ষিত হয়, এই ভবনটিই সারদা হল নামে পরিচিত। সারদাচরণ শ্যাম বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য এই হল প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার দিনে এই হলে অনেক সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। বর্তমানে এই হলটি সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে।

নির্মাই শিববাড়ি

আজ থেকে প্রায় ৫৫৫ বছর আগে ১৪৫৪ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীমঙ্গলের বালিশিরা পরগনার শঙ্করসেনা গ্রামে নির্মাই শিববাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে বালিশিরা অঞ্চলে ত্রিপুরার মহারাজা রাজত্ব করতেন। প্রবল শক্তিশালী এ রাজার বিরুদ্ধে কুকি সামন্তরাজা প্রায়ই বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন। একবার কুকি রাজার বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে মহারাজা বিদ্রোহ দমন করার জন্য একদল সৈন্য পাঠান। তুমুল যুদ্ধে কুকিরা পরাজিত হলেও মহারাজার প্রধান সেনাপতি রণক্ষেত্রে নিহত হন। বিয়ের অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই স্বামীহারা হন মহারাজার কন্যা নির্মাই। তখনকার দিনে ভারতবর্ষে সহমরণ প্রথা চালু ছিল। কিন্তু রাজকন্যা সহমরণে রাজি না হয়ে স্বামী নিহত হওয়ার স্থানে এসে শিবের আরাধনা শুরু করেন। তার নামেই নির্মাই শিববাড়ির নামকরণ করা হয়।

www.pathagar.com

পাঁচগাঁওয়ের দুর্গা মন্দির

সাধক সর্বানন্দের বাড়ি রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও গ্রামে। তিনি সরকারি কাজে আসামে বসবাস করতেন। তবে বেশি সময় কাটাতেন গৌহাটিতে। তাঁর নিজ বাড়িতে প্রতি বৎসর ধুমধামের সহিত দুর্গাপূজা উদযাপন করা হতো। কামরূপ কামাক্ষাধামে কুমারী পূজা হয়ে থাকে। সাধক সর্বানন্দ একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রতি বছর কামাক্ষায় কুমারী পূজা করতেন। একবার কুমারী পূজার সময় সাধক সর্বানন্দ ধ্যানরত অবস্থায় কুমারী শিশুর মধ্যে মা দুর্গা দেবীর সাক্ষাৎ পেলেন। মা দুর্গা সেদিন সাধক সর্বানন্দকে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, 'তোর বাড়িতে আমার পূজা করবে এবং আমার গায়ের রং হবে রক্তবর্ণ'। মা দুর্গা আশীর্বাদ স্বরূপ মাথার স্বর্ণসিঁথি খুলে সাধক সর্বানন্দকে দিয়ে বলেছিলেন 'প্রতি বছর পূজোয় আমাকে এই সিঁথি দিয়ে স্নান করাবে'। এরপর থেকে সাধক সর্বানন্দ প্রতি বছর তাঁর বাড়িতে মা দুর্গার পূজা করে আসছেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পাকহানাদার বাহিনী ও রাজাকারগণ সব মালামাল লুণ্ঠন করলেও মায়ের এই সিঁথি অক্ষত থেকে যায়। দেশ স্বাধীন হলে আবার মহা ধুমধামে মায়ের পূজা শুরু হয়। রাজনগরের পাঁচগাঁও-এর অধিবাসী শান্তিপদ দাস এই সর্বানন্দ দাসের বংশধর। তাঁর বাড়ির সামনে বড় দিঘি রয়েছে, এই দিঘির পশ্চিম পাড়ে মায়ের মন্দির। শান্তিবাবুর অনেক সুনাম ছিল। তিনি একজন গুণী ও ধার্মিক লোক ছিলেন। দেশে-বিদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। উপমহাদেশে এক মাত্র ব্যতিক্রম– পাঁচগাঁও-এ দুর্গা মায়ের গায়ের রং রক্তবর্ণ। উপমহাদেশে সব চেয়ে বড় পূজা এই রাজনগরের পাঁচগাঁও-এ প্রতি বছর মহা ধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর পাঁচ দিনব্যাপী পূজাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ লোক জাগ্রত এই দেবী প্রতিমা দর্শন করতে আসেন। বর্তমানে মা দুর্গার বিশাল মন্দির হয়েছে। শান্তিবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় দাস দুর্গা পূজার সকল অনুষ্ঠানাদি পালন করে আসছেন।

জ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও বিখ্যাত ব্যক্তি

মৌলভী সৈয়দ কুদরত উল্লাহ

মৌলভীবাজার শহরের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মৌলভী সৈয়দ কুদরত উল্লাহ সদর উপজেলার গোবিন্দশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম সৈয়দ রহমত। সৈয়দ কুদরত উল্লাহ হযরত শাহ মোস্তফার বংশধর। তিনি ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে দেওয়ানি আদালতের মুন্সেফ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মুন্সেফি আদালতের চাকরি থেকে অবসরের পর নিজ বাড়ি গোবিন্দশ্রী গ্রামেই বসবাস করেন। ১৮১০ সালে মনু নদীর পশ্চিম পাড়ে জনসাধারণের সুবিধার জন্য একটি বাজার স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে মৌলভীবাজার শহরের নামকরণ করা হয়। তিনি একজন দানশীল ব্যক্তি ও সমাজসেবক ছিলেন।

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য ১৭৯৯ সালে রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিলেট বিভাগের প্রথম সাংবাদিক ছিলেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি একজন

www.pathagar.com

কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হলো– শিশুপাঠ নীতিকথা, গীতার অনুবাদ প্রথম খণ্ড, শিশুতোষ গ্রন্থ জ্ঞান প্রদীপ ১ম খণ্ড, শিশুতোষ গ্রন্থ ২য় খণ্ড, নীতিরত্ন, সংশোধিত মহাভারত ১ম খণ্ড, সংশোধিত মহাভারত ২য় খণ্ড ইত্যাদি।

সৈয়দ মুর্তাজা আলী

প্রখ্যাত রম্য সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর দ্বিতীয় অগ্রজ সৈয়দ মুর্তাজা আলী ১৯০২ সালের ১ জুলাই আসামের করিমগঞ্জ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আই.সি.এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেও চাকরি পাননি। দেশবিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। বিভিন্ন পর্যায়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি সেক্রেটারি ও বিভাগীয় কমিশনার পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলা একাডেমির সভাপতি ও বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে ১৭ মে ১৯৭১ সালে বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান, হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, আমাদের কালের কথা, মুজতবা-কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, History of Chittagong, The History of Jaintia প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৩ সালে গবেষণাকর্মের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮১ সালের ৯ আগস্ট তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সৈয়দ মুজতবা আলী

কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯০৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর আসামের করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ সিকান্দর আলী তৎকালীন সময়ে করিমগঞ্জে সাব-রেজিস্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস মৌলভীবাজার সদর থানার দুর্লভপুর গ্রামে। সৈয়দ মুজতবা আলী সরস মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যধারার প্রবর্তক।

সৈয়দ মুজতবা আলী

পাণ্ডিত্য ও সৃজনক্ষমতার বিচিত্র অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায় তাঁর রচনায়। তাঁর বিপুল সংখ্যক রচনার মধ্যে রয়েছে উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি, সাহিত্য-সমালোচনা, প্রবন্ধ

www.pathagar.com

প্রভৃতি। দেশে বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, জলে-ডাঙ্গায়, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, চাচা কাহিনী, ময়ূরকণ্ঠী, অবিশ্বাস্য, ধুপছায়া, দ্বন্দ মধুর, চতুরঙ্গ, শবনম, টুনিমেম, বড়বাবু, শহর-ইয়ার, মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ গল্প, বহু বিচিত্রা, হাস্য মধুর, পছন্দ সই, রাজা উজির, কত না অশ্রু জল, তুলনাহীন ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি, সংস্কৃত, মারাঠি, গুজরাতি, ইংরেজি, ফরাসি, ইতালিয়ান ও জার্মান ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব ও তার তুলনামূলক বিচারে এ উপমহাদেশের স্বল্প সংখ্যক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তিনি অন্যতম এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন নিষ্ঠাবান অনুরাগী। তিনি ১৯৭৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

লীলা রায় (নাগ)

রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, আন্দোলন, সংগ্রামে নেতৃত্বদান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এই উপমহাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করেছে। পাঁচগাঁওয়ের কৃতী সন্তান উপমহাদেশের প্রথম নারী নেত্রী লীলা রায় (নাগ)-কে বলা হতো অগ্নিকন্যা। তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে ১০ বৎসরেরও অধিক কাল কারাবরণ করেন। বাংলাদেশে প্রথম মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা 'জয়শ্রী' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। লীলা নাগ বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রথম নারী। তিনি মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য আন্দোলন করেন। ১৯২৬ সালে ঢাকায় প্রথম 'দীপালি ছাত্রী সংঘ' নামে মেয়েদের সংগঠন করেন। লীলা নাগের পিতা গিরিশ চন্দ্র নাগ ১৮৮৫ সালে গ্রাজুয়েটপ্রাপ্ত হন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

লীলা রায়

এম সাইফুর রহমান

এম সাইফুর রহমান ১৯৩২ সালে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার বাহারমর্দন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় বেতন কমিশনে প্রাইভেট সেক্টর থেকে মনোনীত একমাত্র সদস্য। ১৯৭৩ ও ১৯৭৫-এ বাংলাদেশ

www.pathagar.com

জাতীয় বেতন কমিশনের সদস্য। ১৯৭৯ সালে মৌলভীবাজার সদর আসন থেকে প্রথমবারের মতো জাতীয় সংসদ সদস্য মনোনীত হন। তিনি তিনবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী ছিলেন। তিনি বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, ইসলামি উন্নয়ন ও ইফাদ-এর বাংলাদেশ গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। মৌলভীবাজার তথা সিলেট বিভাগে ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন। ২০০৯ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তারিখে সিলেট যাওয়ার পথে এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

ঝ. মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর মৌলভীবাজারে দেশ স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। মৌলভীবাজার মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সদর থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আজিজুর রহমানকে আহ্বায়ক করে গঠিত হয় মহকুমা সংগ্রাম কমিটি। পর পরই থানা পর্যায়ে সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। রাজনগর থানার আহ্বায়ক মো. জাফর, কুলাউড়া থানার আহবায়ক জয়নাল আবেদীন, বড়লেখা থানার আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলাম, কমলগঞ্জ থানার আহ্বায়ক এম.এ.গফুর এবং শ্রীমঙ্গল থানার আহ্বায়ক আলতাফুর রহমান চৌধুরীকে নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়। কমলগঞ্জ থানার ভানুগাছেও একটি সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সংগ্রাম কমিটি এবং স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম কমিটির নির্দেশ মোতাবেক মৌলভীবাজারের সমন্বিত কমিটি মাঠ পর্যায়ে স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনমত গড়তে কাজ করতে থাকে।

মার্চের মৌলভীবাজারের রাজপথ ছিল সংগ্রামী জনতার উত্তাল স্রোতে আলোড়িত। গ্রাম থেকে শহরসহ সকল জায়গায় প্রতিদিন মিটিং-মিছিলে ছিল উত্তাল। মিছিলের স্লোগান ছিল- "তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা", "স্বাধীন করো, স্বাধীন করো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো", "জিন্নাহ মিয়ার পাকিস্তান, আজিমপুরের গোরস্থান" ইত্যাদি। উত্তাল এই আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করে ছাত্র ইউনিয়ন ও বিপক্ষী ছাত্র ইউনিয়নও পৃথক পৃথক ভাবে কর্মসূচি পালন করেছিল। একই সাথে আব্দুল মালিক ও আব্দুল মছব্বিরের নেতৃত্বে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও ছাত্রলীগ নেতা আব্দুস সোবহান মসুর নেতৃত্বে *জয়বাংলা বাহিনী*-ও গঠিত হয়। মহকুমার সকল থানা ছিল তখন উত্তাল। আমজনতার হাতে ছিল লাঠি এবং চা-শ্রমিকের কাছে ছিল তীর-ধনুক। তারা সবাই এসব নিয়ে প্রকাশ্যে মিছিল-মিটিং করে মৌলভীবাজার মহকুমা শহরে এসে মিলিত হয়ে জনসমুদ্রে রূপ নিতো। আন্দোলনে শরিক হয়েছিল শিল্পীসমাজ। তারা "জাগো অনশন বন্দি" এবং "জয় বাংলা বাংলার জয়" ইত্যাদি গান গেয়ে শহর প্রদক্ষিণ করত।

২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সমাজ পরিষদ দিবসটিকে "কালো দিবস" হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। মহকুমা থেকে থানা– প্রতিদিন মিছিল-মিটিং কর্মসূচির পাশাপাশি পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হতো। স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২২ মার্চ তারিখের মধ্যেই জেলা, মহকুমা ও থানা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের নিকট স্বাধীন বাংলার পতাকার যে ডিজাইন

www.pathagar.com

এসেছিল সে ডিজাইন অনুসারে সেই দিনই মৌলভীবাজার শহরের চৌমোহনায় বর্ষিজুড়া গ্রামের বশির উদ্দিন টেইলারের দোকানে স্বাধীন বাংলার পতাকা তৈরি সম্পন্ন হয়। শহরে দুইশত পতাকা বিতরণের পাশাপাশি থানা পর্যায়েও অনেক পতাকা বিলি করা হয়েছিল। ২৩ মার্চ কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মসূচি অনুযায়ী মহকুমা ছাত্রলীগ পাকিস্তান দিবসকে 'কালো দিবস' গণ্য করে শহরের চৌমোহনায় সমাবেশ করে। মহকুমা ছাত্রলীগের সভাপতি দেওয়ান আব্দুল ওহাব, মুজিবুর রহমান মুজিব, এ.কে. সুজাউল করিম, আব্দুল ওদুদসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। সভা শেষে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবিসহ পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলনের পূর্বে কোর্ট বিল্ডিং থেকে ছাত্রলীগ নেতা মোহাইমিন সালেহের নেতৃত্বে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে ফেলা হয়। ২৩ মার্চ মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর, কুলাউড়া ও বড়লেখা স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হলেও কমলগঞ্জে স্বাধীনতাকামীরা স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করতে পারেননি, কারণ শমসেরনগরসহ আশপাশের এলাকা ছিল মুসলিম লীগের শক্ত ঘাঁটি। পাকিস্তানি পতাকা পোড়ানোর কারণে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম লুকু, নারায়ণ দেবনাথ ও আব্দুর রহিম মধু মিয়াসহ কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশ মধু মিয়াকে গ্রেফতারের ফলে কমলগঞ্জ, ভানুগাছ ও মৌলভীবাজারের স্বাধীনতাকামী আমজনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২৫ মার্চ মহকুমা নেতৃবৃন্দের নির্দেশে অপরাপর সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ৫/৬টি ট্রাক ভর্তি নেতাকর্মীকে নিয়ে ভানুগাছে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন।

২৫ মার্চ সন্ধ্যার পর থেকেই মৌলভীবাজার শহরে আতঙ্ক দেখা দেয়। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা গিয়াসউদ্দিন মনির ও ফয়জুর রহমান মৌলভীবাজার শহরে আসেন এবং সবাইকে সর্তক করে দেন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য। শ্রীমঙ্গলে অবস্থানরত জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য মো. ইলিয়াছের কাছে খবর আসে– আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। আজ রাতেই ক্র্যাক ডাউন হবে। খবর পেয়েই মো. ইলিয়াছ দ্রুত মৌলভীবাজার শহরে পৌঁছেন। চৌমোহনাস্থ বাবু ব্যোমকেশ ঘোষের বাসায় উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের জরুরি বৈঠক হয়। বৈঠকে পরবর্তী করণীয় ও গ্রামে গিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। নেতৃবৃন্দকে নিজ বাসা ছেড়ে অন্যত্র অবস্থানের পরামর্শ দেয়া হয়।

২৬ মার্চ কারফিউ ঘোষণা ও গ্রেফতার

স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ২৬ মার্চ সকালেই সামরিক বাহিনী শহরে কারফিউ ঘোষণা করে। রাতে সেনাবাহিনী মাইক দিয়ে শহরব্যাপী প্রচারণা চালায়। প্রচারণাটি ছিল এরকম -"এক জরুরি এলান হ্যায়... নগরমে কার্ফু লাগা দিয়া.. যো আদমি কার্ফু নেহি মানতা- তব কো গুলি কর রাহা.."। সামরিক বাহিনীর প্রচারণায় ও টহলে শহরের দৃশ্য পাল্টে যায়। শহর নীরব, নিঃশব্দ হয়ে যায়। ব্যবসায়ীরা দোকানপাট তাড়াতাড়ি বন্ধ করে নিজ নিজ ঘরে যেতে তৎপর হয়ে উঠেন। সকালে ফজরের নামাজ আদায়কারী মুসল্লিরা মসজিদ থেকে বের হবার পর পরই সামরিক বাহিনীর হেনস্তার মুখোমুখি হন। সেনারা জিপ থেকে নেমে সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই কিল, থাপ্পড় ও

www.pathagar.com

লাথি মেরে বলতে থাকে-ইয়ে মুল্লুক মে কোয়ি মুসলিম নেহি..সব হিন্দুকা আওলাদ...। মোকাম মে পাগার যাও ছালা..। শহরে শুরু হয় তল্লাশি ও ধরপাকড়। ভোরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন আব্দুল হামিদের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর একটি উচ্চপদস্থ দল শহরের গুজারাই গ্রাম থেকে নব নির্বাচিত এমপিএ ও মহকুমা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব আজিজুর রহমান এবং ঘোষপট্টি থেকে আওয়ামী লীগ নেতা শ্রী বোমকেশ ঘোষকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ২৬ এবং ২৭ মার্চ পাকহানাদার বাহিনী শহরের বিভিন্ন বাসা-বাড়িতে তল্লাশি ও ধরপাকড় করতে থাকে। সদর থানা আওয়ামী লীগ সম্পাদক প্রদ্যুম্ন কুমার রায়কে গ্রেফতারের জন্য বাসাতে হানা দিলে তাকে না পেয়ে তার পিতা প্রসন্ন কুমার রায়কে ধরে নিয়ে যায়। একই ভাবে শহর ও শহরতলীতে পাকহানাদার বাহিনী বহু লোককে ধরে নিয়ে নির্যাতন অব্যাহত রাখে। শহরের অনেক নেতা-কর্মীকে নির্যাতনের পাশাপাশি গুলি করে হত্যা করে। পাকবাহিনীর গ্রেফতার ও নির্যাতনের মাত্রা একদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্য দিকে স্বাধীনতাকামী মুক্তিবাহিনী শহরের বিভিন্ন স্থানে বেরিকেড দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। মৌলভীবাজারের শহরের অবস্থা যখন অবনতির দিকে তখন শ্রীমঙ্গল থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিভিন্ন চা-বাগান থেকে পাইপগান সংগ্রহের কাজ চলে। বড়লেখা উপজেলার মৌবন গ্রামের আজাদ চৌধুরীর বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এলাকার আগ্রহী যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার আব্দুল খালেক ও আকব্দছ আলী। বড়লেখা থেকে নির্বাচিত এমপিএ তৈমুছ আলী ছিলেন একজন মুজাহিদ কমান্ডার। তার নেতৃত্বে জুড়ীতে আরেকটি মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়। উভয় ট্রেনিং সেন্টার থেকে ২৫ মার্চের আগেই প্রায় ৮০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পাকহানাদার বাহিনী মৌলভীবাজার শহরের ভিতরে প্রবেশের ফলে নেতৃবৃন্দের নির্দেশ মোতাবেক বিভিন্ন গ্রাম থেকে স্বাধীনতাকামী আমজনতা মৌলভীবাজার শহর ঘেরাওয়ের প্রস্তুতি নেয়। তন্মধ্যে কামালপুর ইউনিয়ন অন্যতম। মহকুমা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মাহমুদুর রহমান, ছাত্রলীগ নেতা গোলাম মওলা, আব্দুল হকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে কামালপুর বাজার নিকটবর্তী তেতইরতল, আখাইলকুড়া, কাজিরবাজার মনুমুখ, বাজরাকোণা, সরকারবাজার, ত্রৈলোক্ষ্যবিজয়, খালিশপুর, রাধানগর, মীরপুর, পালপুর, খারগাঁও, বাড়ন্তি, দক্ষিণ বাড়ন্তিসহ আশেপাশের গ্রামগুলির জনতা লাঠি, বল্লম, সুল্কি, ঝাঁটাসহ দেশি অস্ত্র নিয়ে জয়বাংলা স্লোগান দিয়ে ঢাকা সিলেট রোডে মৌলভীবাজার শহর অভিমুখে জঙ্গিমিছিল নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। মিছিলটি কামালপুর থেকে রওয়ানা হয়ে থানারবাজার, কনকপুর, শাহবন্দর অতিক্রমের সময় হাজার হাজার জনতা মিছিলে যোগ দেয়। দ্বিতীয়ত ঘেরাও ও কারফিউ ভঙ্গের জন্য একাটুনা ইউনিয়নের চারপাশের হাজার হাজার লোক জঙ্গিমিছিল নিয়ে মৌলভীবাজার শহরের দিকে অগ্রসর হয়। একাটুনা সংগ্রাম কমিটির সভাপতি ছিলেন সুলেমান আলী। ২৮ মার্চ দিনের বেলা শহরে কারফিউ শিথিল হলে শুরু হয় লুটপাট ও শহর ছাড়ার হিড়িক। সামরিক বাহিনীর তল্লাশি ও নির্যাতন অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

২৭ মার্চ সি এন্ড বি ইটখোলাতে সামরিক বাহিনী ৭ জন শ্রমিককে হত্যা করে লাশ ফেলে যায়। ২৮ তারিখ দুপুরে এই ৭ শ্রমিকের লাশ বেরী লেইকের দক্ষিণ পাশে

www.pathagar.com

সমাহিত করা হয়। এখানে ন্যাপকর্মী শ্রী নিবাস পাল উরফে বলাইর লাশও সমাহিত করা হয়। মৌলভীবাজার পৌরসভার উদ্যোগে এখানে স্মৃতিসৌধ তৈরি হয়েছে।

২৬ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মৌলভীবাজার শহরে প্রবেশের পর তাদের আধিপত্যের জাল রাজনগর ও কমলগঞ্জে প্রসারিত করেছিল। শ্রীমঙ্গল তখন উত্তপ্ত হয়ে উঠে। বড়লেখা, কুলাউড়াতে বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল। শমসেরনগরে পাকিস্তানি পতাকা পোড়ানোর কারণে ছাত্রনেতৃবৃন্দের উপর মামলা দায়েরের ফলে মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

২৭ মার্চেই যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। মেজর চিত্ত রঞ্জন দত্ত (সি.আর.দত্ত) সরাসরি যুদ্ধের কমান্ডে থাকবেন বলে মনোনীত করা হয়। অন্যান্য দায়িত্বে থাকবেন লে.কর্নেল এম.এ.রব ও কমাণ্ডার মানিক চৌধুরী। প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করা হয় মোস্তফা আলী এমএনএ-র উপর। লে.কর্নেল রবের উপর বিশেষ দায়িত্ব ছিলো ইপিআরদের সমন্বয় করার। সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত লে.কর্নেল হিসেবে ইপিআরদের নিকট তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বেশি ছিল। হবিগঞ্জের মাধবপুর থেকে শ্রীমঙ্গল হয়ে সিলেট অভিমুখে অভিযানের পরিকল্পনা হয়। সাতটি গাড়িসহ এই দল জয়বাংলা ধ্বনি করে অভিযান শুরু করে। শ্রীমঙ্গলে স্বাধীনতাকামী জনতা এই সংবাদ পেয়ে শ্রীমঙ্গল থানা থেকে সকল অস্ত্র লুঠ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ২৮ মার্চ রাতে শ্রীমঙ্গলের ছাত্রলীগ নেতা এম.এ. রহিম ও আওয়ামী লীগ নেতা ইসমাইল হোসেনের নেতৃত্বে একদল মুক্তিবাহিনী রশীদপুর থেকে এম.এ. রবের দলের সাথে যুক্ত হয়। শ্রীমঙ্গলকে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের সদর দপ্তর হিসেবে ঘোষণা করে পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মানিক চৌধুরী ও লে.কর্নেল রবের পরামর্শে মো. ইলিয়াছ ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সহযোগিতা কামনা করেন। ভারতীয় সামরিক বাহিনী এই প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দেয়। তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা জানাবেন বলে জানান।

২৯ এবং ৩০ মার্চের মধ্যেই যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি শেষ হয়ে যায়। শ্রীমঙ্গলে ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে চলে অস্থায়ী ট্রেনিং ক্যাম্প। মহকুমার সকল থানার সাথে চলে সকল প্রকার যোগাযোগ। হানাদার বাহিনী সাময়িকভাবে মৌলভীবাজার শহর থেকে প্রস্থান করলেও শেরপুর থেকে পুনরায় মৌলভীবাজার আসতে পারে বলে সকলেরই সন্দেহ হয়। মেজর সি.আর. দত্তের পরিকল্পনা অনুসারে ৩০ মার্চ রাতে শ্রীমঙ্গল থেকে মুক্তিবাহিনী দুটি দলে বিভক্ত হয়ে মৌলভীবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। এদিকে মৌলভীবাজার থেকে সৈয়দ মহসিন আলী, আব্দুস সোবহান একলিম, আলী আহমদ খান, ফয়জুর রহমান, মির্জা ফরিদ বেগসহ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিলিত হন। মৌলভীবাজারে মুক্তিবাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে লুকিয়ে থাকা অনেক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ছুটে যান পর্যটন রেস্ট হাউসে। সেখানে মেজর সি.আর.দত্ত, লে.কর্নেল রব ও মানিক চৌধুরীর সাথে দেখা করে যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নেন।

শেরপুরে যুদ্ধ

২৯ মার্চ হানাদার বাহিনী মৌলভীবাজার থেকে সরে গিয়ে শেরপুরে অবস্থান করে। হানাদার বাহিনীর অবস্থান যাচাইয়ের জন্য মেজর সি.আর.দত্ত ছাত্রনেতা সৈয়দ নাছির

www.pathagar.com

উদ্দিনকে সাথে নিয়ে নৌকাযোগে অবস্থানের রেকি করেন ১ এপ্রিল। পাশাপাশি আলী আহম্মদ ও আব্দুল মছব্বির-এর পরামর্শে জনৈক রব্বান মিয়া ও সহযোগী একজনকে দিয়ে ইলিশ মাছ ধরার বাহানা করে নৌকাযোগে রেকির কাজ সম্পন্ন করা হয়। রেকির কাজ শেষ হলে মৌলভীবাজারে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে রিপোর্ট করা হয়। মেজর সি.আর.দত্ত রেকির কাজ শেষ করে বুঝতে পারলেন শেরপুরে ৩ থেকে ৪ প্লাটুন হানাদার বাহিনী রয়েছে। আনসার বা সাধারণ পুলিশ দিয়ে এদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এই দিন বিকালেই শমসেরনগর ও শ্রীমঙ্গল থেকে প্রায় একশত জনের বেশি ইপিআরকে মৌলভীবাজারে আনয়ন করা হয়।

পরদিন হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধের পরিকল্পনা করা হয়। ২ এপ্রিল মুক্তিবাহিনী গভীর রাতে নৌকাযোগে কুশিয়ারা নদী অতিক্রম করে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ত্রিমুখী আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়। ভোররাত্রেই মুক্তিবাহিনী হানাদার বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পরে। মুক্তিবাহিনীর হাতে ছিল ৩০৩টি রাইফেল, অল্প কিছু স্টেনগান এবং তিন দলের কাছে মাত্র ৪টি লাইট মেশিনগান। পক্ষান্তরে হানাদার বাহিনীর কাছে ছিল চাইনিজ রাইফেল, এলএমজিসহ মর্টার। মুক্তিবাহিনীর প্রথম আক্রমণেই হানাদার বাহিনীর ১৫ থেকে ২০ জন্য সৈন্য মারা যায়। অতঃপর শুরু হয় পাল্টা আক্রমণ। ত্রিমুখী আক্রমণে হানাদার বাহিনী পিছু হটতে শুরু করে। সকাল ৮ ঘটিকার মধ্যে হানাদার বাহিনীর আরো সৈন্য সিলেট থেকে এসে যোগদান করে। মুক্তিবাহিনীও এদিকে শক্তি বৃদ্ধি করে। নবীগঞ্জ থেকে প্রচুর আনসার, মুজাহিদ ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রনেতা মাহবুবুর রব সাদির নেতৃত্বে শেরপুর রণাঙ্গনে যোগ দেয়। ৪ এপ্রিল তেলিয়াপাড়াতে অবস্থানরত বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি প্লাটুন ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে শেরপুর যুদ্ধে যোগদান করে।

এদিকে দেওয়ান ফরিদ গাজী ভারতীয় বিএসএফ-এর কর্নেল লিমাইয়ার নিকট থেকে ১০ বাক্স বুলেট, গ্রেনেড, ত্রিশটি চাইনিজ রাইফেল ও ৬/৭টি স্টেনগান সংগ্রহ করেন। এই অস্ত্রগুলি শেরপুরের যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধ চলাকালে কুশিয়ারা নদীর পাড়ে হাজার হাজার লোক জয়বাংলা ধ্বনিতে মুখরিত করে তুলে। শেরপুরের যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর ৭০ থেকে ৮০ জন সৈন্য নিহত হয়েছিল। আহত হয়েছিল প্রায় একশত। শেরপুর যুদ্ধের প্রথম দিনে মুক্তিবাহিনীর দুজন সদস্য শহিদ হন। তারা হলেন- হবিগঞ্জের হাফিজ উদ্দিন ও মাহফিল উদ্দিন। পরবর্তী দিন মিলে প্রায় ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়েছেন বলে জানা যায়। শেরপুর যুদ্ধে ১০/১২ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়েছিলেন।

সিলেট কীন ব্রিজ অতিক্রম করে হানাদার বাহিনীর একটি দল মৌলভীবাজার অভিমুখে যাত্রা করে। পথিমধ্যে গ্রাম-গঞ্জ জ্বালিয়ে দিয়ে মৌলভীবাজারের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। হানাদার বাহিনী যত মৌলভীবাজারের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তার পেছনে মুক্তিবাহিনীও রাতের আধাঁরে চোরাগুপ্তা হামলা চালাতে থাকে। এতে হানাদার বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে যাত্রাও বিলম্বিত হতে থাকে। ১৫ এপ্রিল হানাদার বাহিনী সাদিপুরে এসে পৌঁছে। এই দিনই মুক্তিযোদ্ধা ও হানাদার বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। রাতে মুক্তিবাহিনীর চোরাগুপ্তা হামলায় হানাদার বাহিনীর অনেক

www.pathagar.com

সদস্য নিহত হয়। এক পর্যায়ে হানাদার বাহিনী ১৬ ও ১৭ এপ্রিল বোমারু বিমান হামলা চালিয়ে মুক্তিবাহিনীকে পিছনে ফেলে শেরপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১৮ এপ্রিল শেরপুর ও সাদিপুরের মধ্যবর্তী স্থানে পুনরায় উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাঁধে। ১৯ থেকে ২১ এপ্রিল শেরপুরে হানাদার বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল যুদ্ধ হয়। হানাদার বাহিনী এখানেও বিমান হামলা অব্যাহত রাখে। পাশাপাশি হানাদার বাহিনীর অনেক সদস্য সিলেট থেকে এসে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। শেরপুর ও সাদিপুরের দ্বিতীয় দফা যুদ্ধ ছিল খুবই ভয়ানক। প্রায় সাত দিন যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর নিহতের সংখ্যা ছিল চার শতাধিক। শুধু কুশিয়ারার তীরে পারকুলেই হানাদার বাহিনীর প্রায় ৬০ জন্য সদস্য নিহত হয়েছিল। অন্যদিকে আশপাশের বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ভয়াবহ।

হানাদার বাহিনী বিমান হামলা করে মুক্তিবাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করে। তখন হানাদার বাহিনী কুশিয়ারা নদী পার হয়ে মৌলভীবাজারের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এদিকে মুজিবনগর সরকারের বার্তা মোতাবেক মৌলভীবাজারের ন্যাশনাল ব্যাংক-এর ভল্ট ভেঙে টাকা অপসারণের সিদ্ধান্ত হয়। ২৪ এপ্রিল ন্যাশনাল ব্যাংকের ভল্ট ভেঙে টাকা হস্তগত করা হয়। সব টাকা স্থানান্তর করতে না পারায় ভোররাতেই পেশীশক্তি সম্পন্ন লোকজন টাকা লুঠ করে নিয়ে যায়।

কামালপুর যুদ্ধ

মুক্তিযোদ্ধাদের দখল থেকে শেরপুর পতনের পর হানাদার বাহিনী মৌলভীবাজারের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। রাস্তার উভয় পাশে নারকীয়ভাবে অগ্নিসংযোগ ও নির্বিচারে মানুষহত্যা করতে করতে অগ্রসর হতে থাকে। ২৭ এপ্রিল ৫০/ ৬০ জনের মুক্তিযোদ্ধা দল কামালপুর ইউনিয়নের ত্রৈলোক্যবিজয় গ্রামে জোড়া মন্দিরের নিকটে দীনেশ চন্দ্র দেব চৌধুরীর বাড়ির নিকটে বাংকার করে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি নেয়। অপর দিকে মনু নদীর পূর্ব পাড়েও ২০ জনের একটি মুক্তিযোদ্ধাদল হামলার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। হানাদার বাহিনী কাজিরবাজার থেকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে কামালপুরের সীমানায় প্রবেশের সাথে সাথে মুক্তিবাহিনীর বন্দুক গর্জে উঠে। কোনো কিছু বুঝে উঠার আগেই হানাদার বাহিনীর প্রায় ২৫/৩০ জন সদস্য নিহত হয়। এই যুদ্ধে আশপাশের লোকজন ছুটাছুটি করতে থাকলে হানাদার বাহিনীর বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়েছিল অনেক লোক। মুক্তিবাহিনীর ৪ জন সদস্য শহিদ হয়েছিল।

কামালপুর ইউনিয়নেই বেশি লোক হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল প্রচুর বাড়িঘর। ইউনিয়নের মধ্যবর্তী গ্রাম দক্ষিণ বাড়ন্তি। এই গ্রামটি সুরক্ষিত ছিল। এই গ্রামের অমূল্য চন্দ্র দাশের বাড়িতে অনেক হিন্দু পরিবার আশ্রয় পেয়েছিল। তার বাড়িতেই কামালপুর, পৈলভাগ, বাসুদেবশ্রী, ত্রৈলোক্যবিজয়সহ আশপাশের গ্রামের ৩০/৪০টি পরিবার আশ্রয় পেয়েছিল।

গণহত্যা

২৬ মার্চ থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত হানাদার বাহিনী মৌলভীবাজারে যাদেরকে হত্যা করে তাদের মধ্যে রয়েছেন- সৈয়ারপুরে ইটাখোলার ৭ জন শ্রমিক, শহরের ন্যাপকর্মী বলাই

www.pathagar.com

ও কানু, সাবিয়া গ্রামের মাখনচন্দ্র কর, গুজারাই গ্রামের লুন্দর মিয়া, শাহবন্দর গ্রামের তারা মিয়া, রাধানগর গ্রামের জমির মিয়া এবং আব্দালপুর গ্রামের ছাওমণি ঠাকুর। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন থানা থেকে আটককৃত ৬/৭ জনকে প্রথমে পিটিআইতে বন্দি রেখে পরবর্তীকালে হত্যা করেছিল হানাদার বাহিনী। ২৭ এপ্রিল কামালপুরে মুক্তিবাহিনী ও হানাদার বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী বড় যুদ্ধ হয়। নিকটবর্তী গ্রামসমূহে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মৌলভীবাজার সিলেট সড়কে বাসুদেবশ্রী, ত্রৈলোক্ষ্যবিজয়, পৈলভাগ, খালিশপুর, দক্ষিণ পৈলভাগ ও কাজিরবাজার গ্রামে বুলেটবিদ্ধ হয়ে প্রচুর লোক শহিদ হয়েছিল। প্রচুর মৃতদেহ এলোমেলোভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল কয়েকদিন। পাশাপাশি স্বাধীনতাবিরোধী দালালচক্র হানাদার বাহিনীকে নিয়ে বিভিন্ন বাড়িঘরে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। বাধ্য করে এই এলাকার ১৫/২০টি গ্রামের হিন্দু পরিবারকে দেশত্যাগ করতে। অর্ধশত বাড়িঘর পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল।

পৈলভাগ ও দক্ষিণ পৈলভাগ গ্রামে হানাদার বাহিনী প্রবেশ করে অগ্নিসংযোগের পাশাপাশি গ্রামের দেবেন্দ্র সেন ও তার স্ত্রী, প্রমোদ রঞ্জন সেন, পরেশ চন্দ্র সেন, বিজয় কৃষ্ণ সেন, বিহারী লাল সেন, রমণ ধর, বৈষ্ণব মদন দাস, সৌদামিনী দেবী, যামিনী ধরকে গুলি করে হত্যা করে। বাসুদেবশ্রী গ্রামে হানাদার বাহিনী প্রবেশ করে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। নিহত ও আহত হয়েছিলেন প্রচুর লোক। এ গ্রামে শহিদরা হচ্ছেন- সুধীর রঞ্জন ধর, তার দুই পুত্র হিমাশু ও সুধাংশুসহ ৭/৮ জন।

কামালপুর গ্রামে হানাদার বাহিনী ঢুকে বাড়িঘরে তল্লাশির পাশাপাশি অগ্নিসংযোগ করে। গ্রামের সুখময় দত্ত ও তার স্ত্রী-পুত্রকে লাইন করিয়ে গুলি করে হত্যা করে । গুলি করে হত্যা করে সুবল দত্তকে। প্রসুন ধরের পরিবারের সকল সদস্যকে ঠাকুরঘরে একত্র পেয়ে গুলি করে হত্যা করে। একই এলাকার ইয়াকুব আলী ও ইব্রাহিম আলীকে গুলি করে হত্যা করে। আজমণি গ্রামের পিয়ারী মোহন দাস, যোগেশ চন্দ্র দাস, মানদা দাস, বীরেন্দ্র দাশ এবং তার পিতা ও শাশুড়িকে হানাদার বাহিনী গুলি করে হত্যা করেছিল। হানাদার বাহিনী রায়পুর গ্রামের আহমদ, গয়ঘরের আব্দুল মন্নান, আব্দুস সাত্তার ও দোকানের কর্মচারী তসলিমকে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করেছিল। সদর থানার বাউরবাগ গ্রামে হানাদার বাহিনী ঢুকে লুটপাট,অগ্নিসংযোগ করে মানুষদের বাড়িছাড়া করে ফেলে। ১ মে তারিখে হিন্দুপ্রধান এই গ্রামে হানাদার বাহিনী প্রবেশ করে। এই গ্রামের বোবা রামচন্দ্র গুপ্ত, সতু মালাকার, অনিল মালাকার, জিতেন্দ্র মালাকার এবং চানপুর গ্রামের শুধাংশু সুত্রধরসহ কয়েকজনকে হত্যা করেছিল হানাদার বাহিনী। এই দিনই ক্ষিদুর গ্রামে হানাদার বাহিনী প্রবেশ করে গ্রামের শিশির পাল, দ্বীজই পাল, ভবই পাল, বিপিন পাল, খোকা পালসহ মোট ৯ জনকে হত্যা করেছিল। একই গ্রামের ৩ জন যুবতী মেয়েকে পাকবাহিনী ধরে নিয়ে যায়।

ভূজবল ও আজমেরু গ্রাম ছিল হিন্দুপ্রধান। এই গ্রামগুলোতেও পাকবাহিনী ঢুকে বাড়িঘর তল্লাশি শেষে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। পাশাপাশি নারকীয় হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠে। এই গ্রামে হানাদার বাহিনীর গুলিতে নিহত হন পিয়ারী মোহন পাল, গোপেশ

www.pathagar.com

চন্দ্র দাশ, বীরেন্দ্র দাশ ও তার শাশুড়ি। গন্ধর্বপুর গ্রামে ডা. প্রভাত চন্দ্র রায়, তার পুত্র বুলু রায় ও সিতু রায়কে হত্যা করা হয়। হত্যা করেছিল জ্যোতিষী অন্নদা পণ্ডিত ও তার ভ্রাতাকে।

সদর থানার নরিয়া গ্রামটি ছিল হিন্দুপ্রধান। এই গ্রামে হানাদার বাহিনী ঢুকে বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। ফারছা বিল ও বড়হাওরের মধ্যবর্তী গ্রাম নরিয়া। যোগাযোগ অবস্থা ভালো ছিল না। কিন্তু পাকবাহিনীর এদেশীয় দোসররা পাকবাহিনীকে এই গ্রামে এনে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। গ্রামের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি কামিনী কুমার দেব ছিলেন মিরাশদার। তিনি ২৬৪ বিঘা জমির মালিক ছিলেন। তিনি প্রথমে অনেক অসহায় পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ৫ মে তারিখে দালালচক্র নরিয়া গ্রামে হানাদার বাহিনীকে এনে হত্যাযজ্ঞ চালায়। সাধারণ মানুষদের ধরে এনে কামিনী দেবের বাড়িতে লাইন করিয়ে বুলেট দিয়ে গুলি করে হত্যা করে। অতি নিকটে থেকে স্বজনদের হত্যার দৃশ্য দেখে মহিলারা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তাদের আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে উঠে। এ সময় রমন কান্ত হাবিলদার অনুচ্চ কণ্ঠে বলে- রেন্ডিকো ছোড় দাও-তোমহারা সব নিকাল যাও..। পরিশেষে তিনজন যুবতীর ইজ্জতের বিনিময়ে সেদিন রেহাই পেলো ৫০/৬০ জন নারী-শিশু। এদিকে পাকবাহিনীর গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন যোগেন্দ্র দেব, উমেশ দেব, শ্রীধর দেব, দয়াময় দেব, গৌর চরণ দেব, রেবতী দেব, রাকেশ দেব, নকুল দেব, সুনাচান দেব, সুন্দর দেব, গঙ্গাচরণ দেব, অধর দেব, নিখিল শুক্ল বৈদ্য, হরিবল শুক্ল বৈদ্য, হরেন্দ্র শুক্ল বৈদ্য, যতীন্দ্র শুক্ল বৈদ্য, স্বদেশ দেবসহ অজ্ঞাত আরও তিনজন। খানসেনাদের সহযোগী এদেশীয় দালালরা তখন নারকীয় উল্লাসে কামিনীদেবের চার অংশীদার বিশিষ্ট বাড়ির ১৯টি ঘরে অগ্নিসংযোগ করে। কামিনী দেব এবং তার স্ত্রী মুখ্য রাণী দেব ঘরের মধ্যেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। লাশের স্তূপ থেকে অলৌকিক ভাবে বেঁচে এসেছিলেন প্রভাত চন্দ্র দেব।

মৌলভীবাজার শহরে নারকীয় হত্যাকাণ্ড

মৌলভীবাজার শহরস্থ মনু ব্রিজে চলে হত্যাযজ্ঞের প্রদর্শনী। ১৩ মে দুপুরে হাজী উস্তার মিয়া ও সিরাজুল ইসলাম কলন্দর মিয়াকে দু'হাত ও দু'চোখ বাঁধা অবস্থায় চাঁদনীঘাট মনু ব্রিজের রেলিং-এর সাথে রশি দিয়ে বাঁধা হয়। হত্যাকাণ্ড অবলোকন করার জন্য রাস্তায় রাস্তায় পাকবাহিনী ব্যারিকেড সৃষ্টি করে লোকজনকে ভেড়া-ছাগলের মতো তাড়িয়ে মনু ব্রিজের নিকটে জড়ো করে। জনগণের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের জন্য এ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। একপর্যায়ে দুজন সেনা কমান্ডার অতি কাছে থেকে হাজী উস্তার মিয়া ও সিরাজুল ইসলামকে লক্ষ্য করে পিস্তল থেকে চার রাউন্ড গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। মৃত্যু নিশ্চিত হবার পর দুজনের লাশ মনু নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। হাজী আব্দুল মন্নানকে প্রকাশ্যে হত্যা না করে বর্ষিজুড়া পাহাড়ে হত্যা করে লাশ মাটিচাপা দিয়ে রাখে হানাদার বাহিনী।

সদর থানার রায়শ্রী গ্রাম ছিল হিন্দু অধ্যুষিত জনপদ। ৭ মে তারিখে হানাদারবাহিনী এদেশীয় দালালদের সাথে নিয়ে গ্রামে ঢুকে পড়ে। পাকহানাদার বাহিনী হিন্দুদের বাড়িঘর পোড়ানোর পাশাপাশি লুটপাট ও মহিলাদের জোরপূর্বক ধর্ষণে লিপ্ত

www.pathagar.com

হয়ে উঠে। গ্রামের বিখ্যাত মহাজনবাড়ি, মাস্টারবাড়ি নামে পরিচিত সুধন্যা দেবের বাড়ি এবং নলিনী দেবের বাড়িতে হানাদার বাহিনী অগ্নিসংযোগ করে। অদ্বৈত দেব ও তার পুত্র প্রবীর দেবকে গুলি করে হত্যা করা হয়। নরেন্দ্র দেব, সুরেশ দেব, অচিন্ত্য দেব ও মাতঙ্গিনী দেবকে হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। মৌলভীবাজার-কুলাউড়া সড়কের চাটুরা ব্রিজের নিকট নিয়ে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

যুদ্ধের এ পর্যায়ে গণধর্ষণে মেতে উঠেছিল পাকসেনারা। হংসী কবিরাজ নামীয় এক সাধুর সুন্দরী স্ত্রীকে দশজন পাকবাহিনী ধর্ষণ করে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে এই মহিলা মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই গ্রামের আরো দুজন মহিলাকে পাকসেনারা ধর্ষণ করে। ৯ মে পাকসেনারা নিধিরমহল গ্রামে প্রবেশ করে। অক্ষয় কুমার দেব, নলিনী মোহন দেবের বাড়িতে হামলা চালায়। দুই বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে ১৭ জন সাধারণ লোককে ধরে নিয়ে আসে চাঁদনীঘাট ক্যাম্পে। এখানে রাতের অন্ধকারে তাদেরকে হত্যার চেষ্টা চলছিল। এই বন্দিদের মধ্যে স্কুলশিক্ষক অক্ষয় কুমার দেব ছিলেন। উপস্থিত এক মেজরকে দেখে এই শিক্ষক বলেছিলেন- Ò Sir, I am a school teacher. What is my offence that you are killing me? কথা শুনে এই মেজর থমকে দাঁড়ালেন। এই শিক্ষক কমবেশি উর্দুও জানতেন। উর্দু ভাষাতেই বলেছিলেন- 'এদেশ ও মাটিকে আমরা দেবতার মতো ভালোবাসি বলে এই দেশকে ত্যাগ করতে পারিনি। এই দেশপ্রেমের পরিণামই কি মৃত্যু?' কথা শুনে এই মেজর শুধু অভিভূত হননি তার মস্তক অবনত হয়ে পড়েছিল। অল্পক্ষণ চিন্তা করেই নির্দেশ দিলেন- 'ইয়ে সব আদমী কো ছোড় দো।' সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে সেদিন এই ১৭ জন লোক প্রাণে বেঁচে ফিরেছিলেন।

রাজনগর থানায় হত্যাকাণ্ড

রাজনগরে ৫ মে তারিখে হানাদার বাহিনী ঢুকে পড়ে। গোবিন্দবাটী ও মোহলাল এলাকায় ঢুকে তারা ৪/৫ জন পথচারীকে এলোপাথাড়িভাবে গুলি করে। তিনজনকে ধরে নিয়ে যায় চাঁদনীঘাট ক্যাম্পে। তাদেরকে ব্রিজের নিকটে গুলি করে হত্যা করে মনু নদীতে লাশ ফেলে দেয়। রাজনগর থানার পাঁচগাঁও একটি বৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। ১৯৭১ সালের ৭ মে ভোরবেলা ৫০/৬০ জন হানাদার বাহিনী এই গ্রামে আক্রমণ করে। লুটপাট ও অগ্নিসংযোগে গ্রামটি কেঁপে উঠে। মানুষ প্রাণরক্ষার্থে পলায়নের চেষ্টা করলে পাকবাহিনী লোকজনদের ধরে ফেলে। অসহায় নারী-পুরুষদের ধরে আনা হয় গ্রামের দিঘির পাড়ে। এখানে নারী ও পুরুষদের আলাদা করে দাঁড় করানো হয়। পুরুষদের পুকুরে নিক্ষেপ করে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হয়। দিঘির পানি তখন লাল হয়ে উঠে। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডে নিহত হয়েছিলেন ৫৯ জন লোক। পরবর্তীকালে এই গ্রামে পুনরায় হামলা চালিয়ে ১৪ জনকে ধরে নিয়ে হত্যা করে পাকবাহিনী। হানাদার বাহিনী রাজনগর থানার খলাগ্রাম ও মুন্সীবাজার এলাকায় ১৪ মে তারিখে প্রবেশ করে। অত্র এলাকার স্কুলশিক্ষক সৈয়দ নজাবত আলী, ছাত্রলীগ নেতা রফিক ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতা বাদশা মিয়াকে হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে। চাটুরা ব্রিজের নিচে এই তিন নেতাকে হত্যা করে। পাকবাহিনী খলাগ্রাম ও মুন্সিবাজারে প্রচুর বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। হত্যা করে প্রচুর লোককে।

www.pathagar.com

শ্রীমঙ্গল থানায় হত্যাকাণ্ড

পাকবাহিনী শ্রীমঙ্গল থানায় প্রথমে আব্দুল লতিফ চৌধুরীকে হত্যা করে। ১ মে ভাড়াউড়া চা-বাগানে পাকবাহিনী প্রবেশ করে। ৩০/৩৫ জন পাকহানাদার বাগানে ঢুকে ২০/২৫ জন শ্রমিককে ধরে নিয়ে যায় এবং হত্যা করে। পাশাপাশি ভুরভুরিয়া ফাঁড়ি বাগানে পাকবাহিনী ঢুকে আটজন যুবককে ধরে নিয়ে হত্যা করে। মির্জাপুর ও বৌলাশির গ্রামে পাকবাহিনী হানা দিয়ে লুটপাট শুরু করে। পাশাপশি ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে অনেক লোককে হত্যা করে। হত্যা-নির্যাতনের পাশাপাশি চালায় ধর্ষণ।

কমলগঞ্জ থানায় হত্যাকাণ্ড

পাকবাহিনী ২ মে চৈত্রঘাটে তিনটি গাড়ি বোঝাই করে গ্রামে প্রবেশ করে। তাদের এদেশীয় দোসর দালালদের সাথে নিয়ে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। লুটপাটের পাশাপাশি গুলিবর্ষণ করে প্রচুর লোককে হত্যা করে। ৩ মে তিনটি গাড়ি বোঝাই করে পাকবাহিনী দেওড়াছড়া বাগানে আসে । ৭০/৭৫ জন চা-শ্রমিককে ধরে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কমলগঞ্জের পতনউষারে পাকবাহিনী প্রবেশ করে। পতনউষারের শ্রীসূর্য, পাবই, মনসুরনগর সহ কয়েকটি গ্রামে হামলা চালায়। বাড়িঘরে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যাকাণ্ড চালায়। স্থানীয় দালালদের সহায়তায় বিভিন্ন বাড়ি থেকে লোকজনদের লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করার জন্য ধরে নিয়ে যায়। প্রথম লাইন থেকে অনেক সলাপরামর্শ করে ষোলো-সতেরো জনকে রেখে বাকি ত্রিশ-চল্লিশ জনকে বাড়ি ফিরে যেতে বলে। নির্ধারিত ষোলো-সতেরো জনকে তারা শমসেরনগর ডাকবাংলোতে নিয়ে যায়। পরবর্তী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে পাকসেনারা ছয়জন ছাড়া অন্য সকলকে পর্যায়ক্রমে ছেড়ে দেয়। সেই ছয়জন হলেন– শ্রীসূর্য গ্রামের শ্রী রমেশ চন্দ্র দাস (স্বনামধন্য সহকারী প্রধান শিক্ষক, কমলগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়), তাঁর কাকাতো ভাই ব্যবসায়ী যোগেশ চন্দ্র দাস, একই গ্রামের কৃপেশ রঞ্জন দত্ত (দুর্গা), পতনউষারের আপ্তাব আলী, তার ভাই আক্তার আলী এবং মনসুরনগরের আবদুল করিম ওরফে ছওয়াব ডাক্তার। তাদেরকে শমসেরনগর বিমানঘাঁটির রানওয়েতে গুলি করে হত্যা করে। পাকবাহিনীর করা লাইন থেকে ফিরে এসেছিলেন শহিদ রমেশ চন্দ্র দাসের বড় ছেলে রঞ্জিত কুমার দাস, পরবর্তীকালে তিনি মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভানুগাছ ও কুমুদপুর এলাকায় পাকবাহিনী হত্যাকাণ্ড চালায় ও বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

বড়লেখা ও কুলাউড়া থানায় হত্যাকাণ্ড

বড়লেখা থানায় প্রচুর লোককে পাকবাহিনী হত্যা করে। নির্বিচারে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। পাশাপাশি শাহবাজপুরেও গণহত্যা করে ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় । জুড়ী বাজারে নির্বিচারে ঘরবাড়ি জ্বালায়। গুলি করে হত্যা করে প্রচুর মানুষকে। কুলাউড়া থানায় পাকবাহিনী প্রবেশ করে ৬ মে। বিভিন্ন জায়গায় বাড়িঘর জ্বালানো, লুটপাট চালানোর পাশাপাশি নির্বিচারে গণহত্যা চালায়।

www.pathagar.com

জনগণের আত্মরক্ষা

স্বাধীনতাবিরোধী চক্র এক পর্যায়ে প্রতি থানায় শান্তি কমিটি গঠন করে। এই শান্তি কমিটি মানবতাবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থেকে শত শত বাড়িঘর জ্বালানো, লুটপাট, ধর্ষণ ও মানুষ হত্যায় সহায়তা করতে থাকে।

মৌলভীবাজার জেলা ভারতের সীমান্তের সাথে জড়িত। পাকবাহিনী মৌলভীবাজারে এসে যখন গণহত্যা শুরু করে তখন হাজার হাজার লোক নিজের বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে সীমান্তের ওপারে আশ্রয়গ্রহণ করে। আক্রান্ত হওয়ার পর শুধু নিজের প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয়ের সন্ধানে ভারতের শরণার্থী ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। অনেকে যারা দেশ ও মাটির টানে রয়ে গিয়েছিল এ দেশে, তাদের অনেককেই পাকবাহিনী গুলি করে হত্যা করে। বাড়িঘর দেয় জ্বালিয়ে। সুন্দরী মেয়ে ও বধূদের ধরে নিয়ে যায় তাদের ক্যাম্পে। সেখানে যুবতী মেয়েদেরকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে এক পর্যায়ে হত্যা করে ফেলে দেয় জনসম্মুখে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যুদ্ধ

মৌলভীবাজারের বিভিন্ন থানায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। জুলাই মাসে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর বন্টন হলে মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সিলেটের আংশিক এলাকাকে নিয়ে গঠিত হয় ৪ নং সেক্টর। সেক্টর কমান্ডার নিয়োজিত হন মেজর চিত্ত রঞ্জন দত্ত। ৪ নং সেক্টরকে আবার ৬টি সাব সেক্টরে ভাগ করে ৬ জন সাব সেক্টর কমাণ্ডার নিয়োগ দেয়া হয়। তারা হলেন–মাহবুবুর রব সাদী, ক্যাপ্টেন আব্দুর রব, লে.জহির, ফ্লাইট লে. জহির, লে.ওয়াকিলুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন এনাম আহমদ। পরবর্তীতে এই সাব সেক্টর কমান্ডারদের দায়-দায়িত্ব অদলবদল হয়। মৌলভীবাজার মহকুমা এলাকায় আক্রমণ পরিচালিত হয় কুকিতল, কৈলাশহর, কমলপুর ও বড়পুঞ্জি সাব সেক্টর থেকে। সাব সেক্টর কমান্ডাররা হলেন- ক্যাপ্টেন শরিফুল হক ডালিম, ক্যাপ্টেন এম.এম.কে. জালালাবাদী, ক্যাপ্টেন জহিনুল হক, ক্যাপ্টেন ওয়ালিউজ্জামান, ক্যাপ্টেন নিরঞ্জন ভট্টাচার্য ও লে. আতাউর রহমান।

হানাদার বাহিনী স্থলপথ ও আকাশপথে মারাত্মক আক্রমণ করলে মুক্তিবাহিনী সীমান্তের ওপারে গিয়ে পুনরায় সু-সংগঠিত হয়ে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মে মাসের শেষ সপ্তাহে মুক্তিবাহিনীর ঝটিকা আক্রমণে হানাদার বাহিনীর প্রচুর সেনা নিহত হয়। সাথে সাথে প্রচুর ঘাতক, দালালও আহত ও নিহত হয়। সীমান্তবর্তী এলাকায় মুক্তিবাহিনী হানাদার বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অপারেশন চলে দত্তগ্রাম, পাত্রখলা, চাতলাপুর চা-বাগানস্থ পঙ্কী ব্রিজ, লাঠিটিলা, পুনরায় লাঠিটিলা, চাতলাপুর বিওপি, আলীনগর বিওপি, ছোটলেখা চা-বাগান, পুনরায় ছোটলেখা, নিশ্চিন্তপুর, ষাটমা (হাতমা) ব্রিজ, দিলখুশা, রাজঘাট চা-বাগান, জুড়ি, ফুলতলা সড়ক, পুনরায় দিলকুশা, শাহবাজপুর, কালীঘাট চা-বাগান, রাজাপুর, ফুলতলা বাজার, ফুলতলা চা-বাগান, হরিণছড়া চা-বাগান, শমসেরনগর চা-বাগান, আলীনগর, শোনছড়া ও ডাবল ছড়া, পৃথিমপাশা, মনু, মুড়ইছড়া, আলীনগর, হাকালুকি মালাম বিল, বড়লেখা-বিয়ানিবাজার

www.pathagar.com

সড়ক, সাগরনাল, পাবই রেলসেতু ও পাইকপাড়া সেতুতে মুক্তিবাহিনী পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে জয়লাভ করে। প্রচুর হানাদার নিহত ও আহত হয়। পক্ষান্তরে মুক্তিবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল হানাদার বাহিনীর তুলনায় অনেক কম। শ্রীমঙ্গলে বিএলএফ তথা মুজিব বাহিনীর আক্রমণ ছিল খুবই মারাত্মক।

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনী পাকবাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। একদিকে পাকবাহিনী অন্যদিকে ভারতীয় সামরিক বাহিনীসহ মুক্তিবাহিনী আধিপত্য বিস্তারের জন্য মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে ত্রিশংকু অবস্থায় সিপাহি হামিদুর রহমান হানাদারবাহিনীর মেশিনগান পোস্ট ধ্বংস করার লক্ষ্যে লাইট মেশিনগানসহ গ্রেনেড নিয়ে অগ্রসর হন। রানার হামিদুর রহমান ক্রলিং করে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে মেশিনগান পোস্ট ধ্বংস করে ফেলেন। এ সময় ব্যাংকার থেকে পলায়নরত হানাদারবাহিনীর গুলিতে রানার হামিদুর রহমান মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সহযোদ্ধারা এই নির্ভীক গর্বিত সৈনিকের লাশ উদ্ধার করে ভারতের আমবাসাতে সমাহিত করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার নির্ভীক এই সৈনিককে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করেন। এই যুদ্ধে পাকবাহিনীর যেমন প্রচুর লোকবল ক্ষতি হয় তেমন মিত্রবাহিনীসহ মুক্তিবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ সৈনিকরা নিহত হন। ধামাই চা-বাগান ও মুন্সিবাজারে মারাত্মক যুদ্ধে বহু লোকের প্রাণহানি হয়।

চূড়ান্ত যুদ্ধ

অক্টোবর মাসের শেষ দিকে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। দেশ স্বাধীন হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। পাকবাহিনী সীমান্তের ওপারে বেসামরিক এলাকায় মর্টার সেল নিক্ষেপ করলে ভারতীয় বাহিনী পাল্টা জবাব দিতে থাকে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভারতের কৈলাশহর ও ধর্মনগরে ভারতীয় সেনারা যুদ্ধের চূড়ান্ত মহড়া শুরু করে। স্থানে স্থানে শক্ত বাংকার তৈরির পাশাপাশি আর্টিলারি ইউনিটগুলি সক্রিয় করে তোলা হয়। স্থানে স্থানে তৈরি হতে থাকে সামরিক ঢেঁড়া। প্রস্তুতি নিয়ে ১ ডিসেম্বর তারিখে ভারতীয় যৌথবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী শুরু করে হানাদার বাহিনীকে আক্রমণ। ২ ডিসেম্বর তারিখে পাকবাহিনী শমসেরনগর এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। ৩ ডিসেম্বর মুক্ত হয় শমসেরনগর এলাকা। ৪ ডিসেম্বর শমসেরনগরে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৫ ডিসেম্বর কুলাউড়া ও বড়লেখা হানাদারমুক্ত হয়।

বিনা যুদ্ধে হানাদারমুক্ত হয় শ্রীমঙ্গল, সেদিন ছিল ৫ ডিসেম্বর। যৌথবাহিনীর আগ্রাসী আক্রমণে হানাদার বাহিনীর ২০/২৫ জন সৈন্য নিহত হলে পাকবাহিনী পিছু হটতে শুরু করে। ৪ ডিসেম্বর দুপুর ২টায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধ ঘোষণার মিনিট কয়েক পরেই মৌলভীবাজার শহরের আকাশে ৪টি ভারতীয় যুদ্ধবিমান পাকবাহিনীর ঢেঁড়াতে আক্রমণ করে। ৫ ও ৬ ডিসেম্বর ভারতীয় বোমারু বিমান পুনরায় পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ করে। পাশাপাশি সামরিক হেলিকপ্টার থেকে যুগিডহর এলাকায় ব্রাশ ফায়ার করে ১১ জন পাকসেনাকে হত্যা করে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী।

www.pathagar.com

রাজনগর থানা থেকে হানাদার বাহিনী পলায়ন করে ৬ ডিসেম্বর। ৭ ডিসেম্বর তারিখে রাজনগরে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। কালেঙ্গার যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও সামরিক বাহিনীর মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডার মেজর জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা সরেজমিনে পরিদর্শনে চলে আসেন। তিনি যৌথবাহিনীকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেন যে, পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে মৌলভীবাজার শহর দখল করে পাকবাহিনীকে বিতাড়িত করে দিতে। এই নির্দেশ মোতাবেক যৌথবাহিনী মৌলভীবাজার শহর দখল করে নেয়। সেদিন ছিল ৮ ডিসেম্বর। পাকবাহিনী আঁচ করতে পেরেছিল পরাজয়ের, তাই ৬০টির অধিক সামরিক গাড়ির বহর মৌলভীবাজার মহকুমা ছেড়ে শেরপুর ও সাদিপুরের ফেরি পার হয়ে চলে যাচ্ছিল। লক্ষ্য ছিল সিলেট হয়ে নিরাপদে সরে যাওয়া।

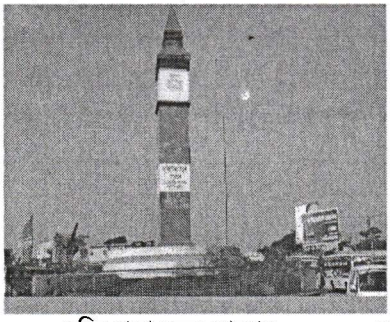

মুক্তিযোদ্ধা চত্বর শেরপুর

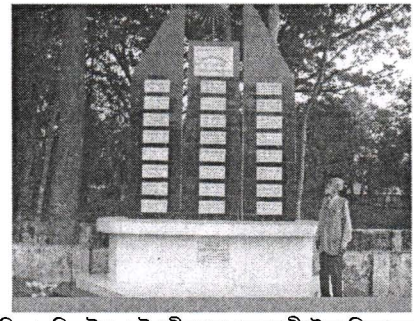

শহিদ স্মৃতিসৌধ, মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়

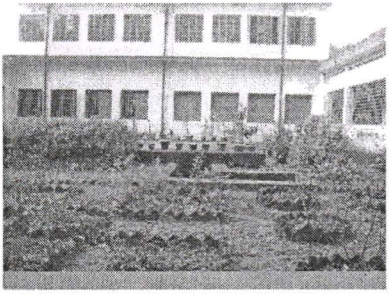

পাকবাহিনীর বাংকার, মৌলভীবাজার

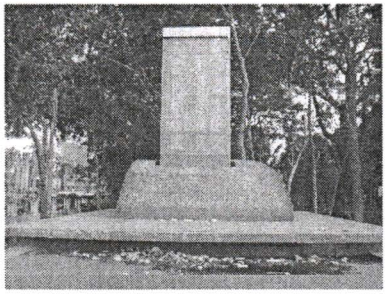

শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা

হানাদারমুক্ত মৌলভীবাজার শহরে চলছিল মুক্তির জয়গান, বিজয়ের প্রস্তুতি। পাকবাহিনী পলায়নের সময় শহরে মাইন পুঁতে রেখে যায়। এই মাইন উদ্ধারের জন্য শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছিল। পরদিন ৯ ডিসেম্বর কারফিউ উঠিয়ে নেয়া হয়। এই দিনই তৎকালীন এমপিএ আজিজুর রহমান মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন।

১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে হানাদার বাহিনীর ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণ এবং ১৭ ডিসেম্বর তারিখে সিলেটে হানাদার বাহিনীর অপর অংশের অস্ত্র সমর্পণের পর

www.pathagar.com

দেশব্যাপী প্রায় ৯ মাসের রক্তাক্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। এবার বিজয়ীর বেশে মুক্তিবাহিনীর দামাল ছেলেরা নিজ নিজ ঘরে ফেরার পালা। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ৯ মাস যুদ্ধ করে যারা দেশ স্বাধীন করেছে তারা ছিল ক্লান্ত, কিন্তু মনে ছিল প্রফুল্লতা ও আনন্দ। দেশ স্বাধীন হয়েছে নিজ নিজ ঘরে ফিরবে এই প্রতীক্ষায় স্বজনরা– কিন্তু নিজের শহরেই ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। ২০ ডিসেম্বর মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে মাইন বিস্ফোরণে ৩০ জনেরও অধিক মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন।

ঞ. লোককবি ও লোকসাহিত্য সংগ্রাহক

মৌলভীবাজার জেলায় অনেক লোককবি লোকসাহিত্য রচনা করে চলেছেন। তারা সর্বগ্রাসী প্রচার ও নগরসভ্যতার বাইরে বসে গ্রামীণ সমাজের চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনাকে কেন্দ্র করে মনের অভিব্যক্তি গ্রাম্য ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশ করছেন। তারা কখনও ভোটের গান, কখনও বাউলগান, কখনও কবিগান রচনা করেন এবং দু-এক পৃষ্ঠা ছাপিয়ে হাটে-বাজারে বিক্রি করে থাকেন। নিম্নে কয়েকজন লোকসাহিত্যিকের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

শেখ চান্দ

কবি শেখ চান্দ ১৫৬০ সালে রাজনগরের ভাঙ্গার হাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ফতেহ মোহাম্মদ। তিনি একাধারে সংসারত্যাগী সাধক ও শক্তিশালী কবি। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রসুল বিজয়, কিয়ামতনামা, শাহ দৌলা, হরগৌরী সংবাদ, তালিব নামা, গুরুশিষ্যের প্রশ্ন উত্তর উল্লেখযোগ্য। তিনি জীবনের বড় অংশ কুমিল্লায় কাটিয়েছেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

আব্দুল মুজাফ্ফর খান

কবি আব্দুল মুজাফ্ফর খান সুবিদ নারায়ণের বংশধর। ১৬২৮ সালে রাজা সুবিদ নারায়ণ ও খাজা ওসমানের যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম ইটার রাজবংশ।

মুন্সী সাদেক আলী

মুন্সী সাদেক আলী ১৭৯৮ সালে কুলাউড়া উপজেলার দৌলতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যনাম ছিল গৌর কিশোর সেন, পিতার নাম গোবিন্দ সেন। তিনি সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পেশায় তিনি কুলাউড়ার হিংগাজিয়ায় মুন্সেফ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত পুঁথি সিলেটি নাগরিতে 'হালতুন্নবী'। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী এই পুঁথিটি বৃহত্তর সিলেট ও আসাম অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পুস্তক হিসেবে পরিচিত ছিল। তাঁর রচিত অন্যান্য পুঁথিগুলো হচ্ছে– হাসর মিছিল (শেষ বিচারের দিন ও পরলোকতত্ত্ব), মহব্বত নামা (ইউসুফ-জুলেখার প্রেমকাহিনি), রদ্দে কুফুর (হিন্দু-মুসলমান ধর্মের তুলনামূলক সমালোচনা), রুদ্দুল হিন্দ ও কশফুল বেদাত উল্লেখযোগ্য।। তিনি ১৮৬২ সালে রাজনগর উপজেলার লামুয়া গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। এখানে তাঁর মাজার অবস্থিত।[১]

www.pathagar.com

ষষ্ঠীবর দত্ত

ষষ্ঠীবর দত্ত একজন লোককবি ছিলেন। রাজনগর অঞ্চলের বর্তমান রাজনগর উপজেলার গয়ঘর গ্রামের বর্ধমান দত্তের পুত্র ষষ্ঠীবর দত্ত। ষষ্ঠীবর দত্তের ভাই হৃদয়ানন্দ দত্ত, স্ত্রী চন্দ্রাবতী দত্ত ও পুত্র সন্ধিনাথ দত্ত। তাঁর পিতা ছিলেন শ্রী ভুবনানন্দ দত্ত। তিনি 'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মপুরাণ' কাব্যের অন্যতম লেখক ছিলেন। তিনি চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যতরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন,

'প্রথমে মিলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর
দ্বিতীয়ে মিলিল ডিঙ্গা বিজয়া সাগর
তৃতীয়য়ে মিলিল ডিঙ্গা গন্ধমাদন
চতুর্থে মিলিল ডিঙ্গা চন্দ্রবদন।

ষষ্ঠীবর দত্ত গুণ রাজ খাঁ উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর কাব্য খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হয়। এই গীতিকাটি রাজনগর অঞ্চলের মূল্যবান লোকজ সাহিত্য।

চন্দ্রাবতী দত্ত

চন্দ্রাবতী দত্ত রাজনগরের গয়ঘর গ্রামের ষষ্ঠীবর দত্তের স্ত্রী ছিলেন। তাঁর রচিত বারোমাসি গান উল্লেখযোগ্য। তাঁর বারোমাসি গান সংগ্রহ করেছিলেন পণ্ডিত মধুরানাথ দত্ত। তিনি পদ্মপুরাণের অনেক লাচাড়ি লিখেছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ অর্জুন

ব্রজেন্দ্রনাথ অর্জুন ১৩০৬ সনের ২৫ কার্তিক রাজনগরের নন্দীউড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন লোককবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে, প্রকাশ হয়নি। তাঁর প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছে– অগ্নিযুগের ইতিকথা, পলাশী (নাটক), জয়বাংলা কাব্যগ্রন্থ, সংগীত ও কবিতা সংকলন। মৌলভীবাজারের কাশীনাথ আলাউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ইতিহাস তিনি লিখেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ অর্জুন পেশায় একজন উকিল ছিলেন। তিনি ১৩৯৭ সনের ৫ জ্যৈষ্ঠ দেহত্যাগ করেন।

সৈয়দ শাহনূর

কবি সৈয়দ শাহনূর ১৭৩০ সালে রাজনগরের ঘড়গাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮১৯ সালে 'নূর নছিয়ত' নামক সর্ববৃহৎ পুঁথি রচনা করেন। গ্রন্থটি সুফিশাস্ত্রের গ্রন্থ। নূর নছিয়তে ৩২০টি পৃষ্ঠা আছে। গানের সংখ্যা ১০৮টি, ধাঁধার সংখ্যা ৪১টি। গানগুলির মধ্যে জিকির, লাচারী, বিলাপ, নৌকার হাইর, বারোমাসি, সারিগান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাগনূর, সাত কন্যার বাখান ইত্যাদি। সাধক কবি সৈয়দ শাহনূর ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম কদমহাটার সৈয়দ রুকনুদ্দিনের বংশধর। তিনি ১৮৫৫ সালে ইন্তেকাল করেন।

আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন

লোকসাহিত্য সংগ্রাহক আশরাফ হোসেনের জন্ম মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার রহিমপুর গ্রামে। নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণকারী আশরাফ

www.pathagar.com

হোসেনের পিতার নাম মুন্সি জওয়াদ উল্যাহ, মাতার নাম সৈয়দা সাকিরা ভানু। তিনি কওমি মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে মুন্সি হিসেবে পরিচিত লাভ করলে পিতা তাঁকে কৃষিকর্মে যুক্ত করেন। কৃষিকাজ করার মধ্য দিয়ে তিনি আরও শিক্ষালাভে উদগ্রীব ছিলেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষে স্বদেশি আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলে তাঁর মনেও স্বদেশি চেতনার স্ফুরণ ঘটে। তিনি স্থানীয় একটি স্বদেশি পাঠশালায় ভর্তি হন। অতঃপর তিনি মুন্সীবাজার স্থানীয় কালিপ্রসাদ মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন বলে জানা যায়। তখন উচ্চ শিক্ষার তীব্রতা ও সুযোগ ছিল না। তিনি ১৯১৮ সালে তাঁর নিজ গ্রামে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ১৯২১ সালে ভারতের শিলচর নর্মাল স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে ট্রেনিং লাভ করেন। তিনি নিজ গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণের পর গ্রামীণ লোকছড়া, প্রবাদ, গান ইত্যাদির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। গ্রামাঞ্চলে তখন গ্রামের মানুষ পুথিপাঠ, লোককাহিনি ইত্যাদি মুখে মুখে চর্চা করত। তিনি এসব মৌখিক কাহিনি সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি দীনেশ চন্দ্র সেন দ্বারা আকৃষ্ট হন। কমলগঞ্জ থানার কৃষকবিদ্রোহ নিয়ে রচনা করেন 'ভানু বিলের লড়াই' কবিতা। যার ইংরেজি অনুবাদ করেন দীনেশ চন্দ্র সেন। অতঃপর তিনি রচনা করেন শাহ জালালের কিচ্ছা, আলী আহমদ খাঁর গীত, ভূমিকম্পের কবিতা, দুর্ভিক্ষের কবিতা, কাছাড়ের লড়াই, কুজির লড়াই, খোয়াজ ওসমানের লড়াই, জৈইন্তার লড়াই, বউ-শাশুড়ির লড়াই, বার্মা কাহিনী, কাজল বরণ পাখি, বিজন বরণ পাখি, আশরাফ দেওয়ানা প্রভৃতি । তাঁর রচিত অনেকগুলো লেখা পাণ্ডুলিপি আকারেই থেকে গেছে।

এছাড়া তাঁর অন্যান্য প্রকাশিত গীতিকাসমূহের মধ্যে রয়েছে মধুমালা গীত, ধনাই সাধু গীত, হীরা ধর বানিয়ার গীত, গীত রূপে মনোহর, সোনাবানের গীত, বিরহিনী কন্যার গীত, পোলক জালুয়ার গীত, সৌদামণির গীত, সৈয়দ কলন্দরের গীত, কাঞ্চনমালার গীত, দুলভী কন্যার গীত, সাধু দয়াবন্দের গীত, ঘাটু সংগীত, কিষাণ সংগীত ইত্যাদি।

তাঁর প্রকাশিত বারোমাসিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দিলখুস কন্যার বারোমাসি, শান্তি কন্যার বারোমাসি, নীলাইর বারোমাসি, কোকিলা কন্যার বারোমাসি, শ্যামার বারোমাসি, খঞ্জন সুন্দরীর বারোমাসি, কাঞ্চন সুন্দরীর বারোমাসি, মনের বারোমাসি, তনের বারোমাসি, সীতার বারোমাসি, নিমাই চান্দের বারোমাসি, মাধব জালুয়ার বারোমাসি, কুলøবীর বারোমাসি, উদব বালার বারোমাসি, ফসলের বারোমাসি।

এছাড়া তাঁর অনেক সামাজিক গ্রন্থ আছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে 'সিলহটের ইতিহাস'। তিনি লোকসাহিত্য সংগ্রাহক হিসাবে তৎকালীন সময়ে 'সাহিত্যরত্ন' সম্মানে ভূষিত হন। এই একনিষ্ঠ লোকসাহিত্যিক ১৯৬৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শোক প্রকাশ করেন এই বলে যে, তাঁর মতো একনিষ্ঠ ও অধ্যবসায়ী সাহিত্যকর্মী বাংলা সাহিত্যে বিরল। লোকসাহিত্যে সংগ্রাহক ক্ষেত্রে আশরাফ হোসেন ছিলেন বিরল ব্যক্তিত্ব ও কিংবদন্তি।[২]

www.pathagar.com

চৌধুরী গোলাম আকবর সাহিত্যভূষণ

লোকসহিত্যিক আশরাফ হোসেনের হাত ধরে কমলগঞ্জ থানায় আরেকজন লোকসাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। তিনি হলেন চৌধুরী গোলাম আকবর। তিনি আশরাফ হোসেনের শিষ্যতুল্য, অনুসারী ও সহকারী হিসেবে লোকসাহিত্যের জগতে পদচারণা করেন।

এই লোকসাহিত্যিকের জন্ম কমলগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামে ১৯২১ সালের ১২ আগস্ট। তাঁর পিতার নাম গোলাম জিলানী, মাতার নাম সৈয়দা মসতরী বানু। তিনি মুন্সীবাজার কালীপ্রসাদ মিডল ইংলিশ স্কুল থেকে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩৬ সালে আশরাফ হোসেনের সহকারী হিসেবে লোকসাহিত্য সংগ্রহে নিবিষ্ট হন। ১৯৪২ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যুক্ত হন। ১৯৫২ সালে প্রাইভেট প্রার্থী হিসেবে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমির লোকসাহিত্যের সংগ্রাহক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। অতঃপর তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা থেকে ইস্তফা প্রদান করেন। চার বছর বাংলা একাডেমিতে কাজ করার পর ১৯৬৭ সালে বাংলা একাডেমির লোকসাহিত্য গবেষণা সহকারীর পদবি ত্যাগ করেন।

তাঁর প্রণীত গ্রন্থ ও সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিলেট গীতিকা, খোলাফায়ে রাশেদা বা চারি খলিফার পুঁথি, সাধক কবি ভবানন্দ, সিলেটী নাগরি পরিক্রমা, ইসলাম জ্যোতি, রাধারমন সঙ্গীত, লোকসাহিত্যে ইসলাম, লোকসাহিত্যের কথা প্রভৃতি। বিশিষ্ট লোকগবেষক প্রফেসর নন্দলাল শর্মা 'তুমি আমাদেরি লোক' গ্রন্থে চৌধুরী গোলাম আকবর সম্পর্কে নিম্নোক্ত পাণ্ডুলিপির তথ্য প্রদান করেছেন। আমাদের বুদ্ধির গল্প, আমাদের মারফতি সাহিত্য, আমার কবিতা, কাঁচ থেকে হীরা, জালালাবাদ, জালালাবাদ লোকসাহিত্য, তিন আর একে চার, দার্শনিক কবি একলিমুর রাজা, নজরুল জীবনের গতিপথে, বারমাসী সংগ্রহ, বাংলার ইতিহাস, বোস্তা (অনুবাদ), মনীষী স্মরণে, যেমন দেখেছি, রোজা ও ঈদ, লোকজ কাহিনী, লোক সাহিত্য ও ছড়া, লোক সাহিত্যে প্রবাদ, লোকসাহিত্যে বিশ্ব পরিক্রমা, শীতালং ফকির, শ্রীহট্ট গীতিকা, সিলেটে মুসলমান, সিলেটের লোক সাহিত্য, সিলেটী ছড়া, স্তবক, হাছন রাজা প্রভৃতি।

এই নিষ্ঠাবান লোকসাহিত্যিক ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'সাউথ এন্ড সাউথ ইস্ট এশিয়ান ফোকলোর স্টাডিজ'-এর ২৯তম অধিবেশনে যোগদানের গৌরব অর্জন করেন। বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধি হিসাবে ভাষণদান করেন। তিনি ১৯৬১ সালে 'গৌড় বঙ্গ সাহিত্য পরিষদ' থেকে 'সাহিত্যভূষণ' উপাধি লাভ করেন। চৌধুরী গোলাম আকবর ১৯৮৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর ফলে এতদঅঞ্চলের লোকসাহিত্যে সংগ্রহের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।[৩]

শচীন্দ্র সূত্রধর

কীর্তনিয়া হিসেবে পরিচিত শচীন্দ্র সূত্রধর। তাঁর পিতার নাম শশী মোহন সূত্রধর এবং মাতার নাম কুসুমবালা সূত্রধর। তিনি ছোটবেলা থেকেই কীর্তনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজের চেষ্টায় কীর্তন গান সংগ্রহ করেন। শচীন্দ্র সূত্রধর ১৯৭০ সালের জুলাই

www.pathagar.com

মাসে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। গ্রামের প্রতি কীর্তনে তাঁর ডাক পড়ে। তিনি সারারাত গান পরিবেশন করেন। তাছাড়া হারমোনিয়াম, বেহালা, সারিন্দা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, ঢোলক ইত্যাদি বাজনাতে পারদর্শী।[৪]

ব্রজেন্দ্র শর্মা

একজন কীর্তনিয়া হিসেবে খ্যাত। তিনি কীর্তন, ফাগুয়ার গান ইত্যাদি নিষ্ঠ সুরে পরিবেশন করেন। কুলাউড়া উপজেলার টিলাগাঁও ইউনিয়নের বিজলী গ্রামে তার জন্ম। পিতার নাম বৈকুণ্ঠ শর্মা। ছোটবেলায় পিতাকে হারিয়ে জীবনসংগ্রামে জড়িয়ে কৃষিকাজ আরম্ভ করেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে গানের আসরে বসে নিজের চেষ্টায় গান শেখেন। বর্তমানে অনেক কীর্তন আসরে তাঁর ডাক পড়ে।[৫]

চৌধুরী গোলাম আকবর

মুন্সী মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন

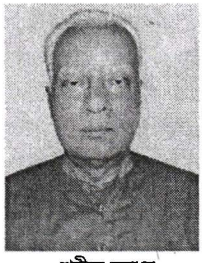

শচীন্দ্র সূত্রধর

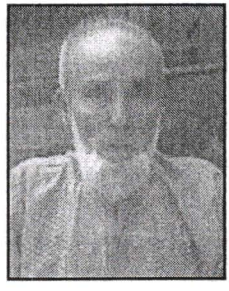

আব্দুল কাদির

শাহ সুন্দর আলী

বাউল শিল্পী শাহ সুন্দর আলী ছোটবেলা থেকে বাউল, পির-ফকিরদের গান বেশি গেয়ে থাকেন। তাঁর একটি ভোটের গান নিম্নরূপ–

কে বা সুজন কে বা কুজন
সুজন দেখিয়া ভোট দিও।
যারা থাকে না বাড়িঘরে

www.pathagar.com

ভোটের সময় আইলে ভোট ভোট করে
এই কুজন আর কুমন্ত্রণা কানে নাই লইও।

সুন্দর আলীর আরও অনেক জনপ্রিয় গান মুখে মুখে মানুষের মুখে ছড়িয়ে আছে। যেমন তাঁর একটা গান মানুষ এখনও উচ্চারণ করে 'আইলারে লন্ডনের গাড়ি, টিকেট কর তাড়াতাড়ি'।

তাঁর পুত্র শাহ দরবেশ আলী পিতার দেখাদেখি ছোটকাল থেকেই গান করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি এ পথেই আছেন। নিজস্ব একটি দল তৈরি করেছেন।[৬]

আব্দুল কাদির

পল্লিগায়ক আব্দুল কাদির স্কুলজীবন থেকেই গান করেন। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার আন্দোলন থেকে তিনি গানের শিল্পী হয়ে ওঠেন। তাঁর পিতা মৃত আলী আহমদ, মাতা মৃত জয়দর বিবি, গ্রাম নছরতপুর (দর্জিমহল), আলীনগর ইউনিয়ন, বয়স ৬৫ বৎসর।

কমলগঞ্জের বিখ্যাত মরহুম জননেতা মোহাম্মদ ইলিয়াসের নজরে তিনি আসেন। তিনি তাঁকে গানে টেনে নেন। ভোটের গান রাজনীতির প্রথম গান, ৬ দফার গান গাইতেন।

যেমন–

৬ দফা, ১১ দফা আমরা সবে কই।
৬ দফা না মানলে তোমরার সঙ্গে নই।

তিনি জারি, সারি, ভাটিয়ালি গান, পল্লিগান, বারোমাসি গান গেয়ে থাকেন।

তথ্যনির্দেশ

১. জয়নাল আবেদীন শিবু, গ্রাম : মশাজান, উপজেলা : রাজনগর, মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ১ মে ২০১১
২. রসময় মোহান্ত, গ্রাম : ঘোষপুর, ইউনিয়ন : শমসেরনগর, উপজেলা : কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ২০ জানুয়ারি ২০১১
৩. নন্দলাল শর্মা, গ্রাম : সিদ্ধেশ্বরপুর, ইউনিয়ন : মুন্সিবাজার, উপজেলা : কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১
৪. রামকৃষ্ণ সরকার, শ্রীমঙ্গল, সংগ্রহের তারিখ : ৪ নভেম্বর ২০১১
৫. দীপক শর্মা, গ্রাম : গুতগুতি, উপজেলা : কুলাউড়া, মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ১২ ডিসেম্বর ২০১১
৬. শাহ দরবেশ আলী, গ্রাম : সিরাজনগর, ডাকঘর : নারায়ণছড়া, উপজেলা : শ্রীমঙ্গল, সংগ্রহের তারিখ : ৮ নভেম্বর ২০১১

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

গ্রামীণ সাধারণ মানুষ তার জীবনযাপন এবং আশেপাশের ঘটনা থেকে এমন কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করে যা আদি রসাত্মক এবং অনেকটা রূপকল্পের মতো মনে হয়। এসব ঘটনা মূলত গল্পাকারে পরম্পরাগতভাবে চলে আসছে। এই লোকগল্পগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্নভাবে প্রচলিত।

ক. লোকগল্প/কিস্‌সা/কাহিনি/রূপকথা/উপকথা

এক

এক দেশে এক বাদশা ছিলেন। বাদশার ছিল এক কন্যা। একদিন বাদশার এই কন্যাকে বিরাট এক অজগর ধরে সাগরে নিয়ে যায়। অজগর সাগরের মধ্যখানে গিয়ে বাদশার কন্যাকে মাথায় তুলে রাখে। বাদশা অস্থির হয়ে পড়েন। সারা রাজ্যে তার কন্যা উদ্ধারের জন্য ঢোল পিটাতে থাকেন। তিনি এই ঢোল দ্বারা জানিয়ে দিলেন যে, এই কন্যাকে সাগর হতে যে উদ্ধার করে দিতে পারবে তাকে রাজ্যের অর্ধেক ও তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবেন। এই খবর শুনে এক এলাকার এক পরিবারের চার ভাই কন্যাকে উদ্ধারে প্রস্তুত হয়। তারা ১ নম্বর ভাই-মিস্ত্রি, ২ নম্বর ভাই-নাইয়া, যে নৌকা চালায়, ৩ নম্বর ভাই-শিকারি, ৪ নম্বর ভাই-ডাকাত। এই চার ভাই বাদশার ঢোলে ধরে বাদশাকে তাদের কথা জানাতে বলল। বাদশা তাদের ডেকে আনেন। বাদশার দেওয়া শর্তমতো তারা কন্যা উদ্ধারে সাগরে নামে। মিস্ত্রি নৌকা তৈরি করল, নাইয়া নৌকা বাইতে গেল, ডাকাত বাদশার কন্যাকে সাপের মাথা থেকে নিয়ে আসে এবং শিকারি সাপটি মেরে ফেলল। চার ভ্রাতা যার যার বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে অজগরের মাথা থেকে বাদশার কন্যাকে নিয়া এসেছে। এবার সকলেই যার যার যোগ্যতায় বাদশার কন্যা ও সম্পত্তির অর্ধেক দাবিদার। তা হলে কে পেতে পারে বাদশার কন্যা? বাদশার কন্যাকে যেহেতু ডাকাত প্রথম ছুঁয়েছে, ধরে নিয়ে এনেছে, তার কাছেই বিবাহ দিলেন এবং তাকে বিষয়-সম্পত্তির অর্ধেক দিয়ে দিলেন। কন্যা উদ্ধারে ডাকাত হলো দাবিদার। বাকিরা হলো সহায়ক শক্তি। এভাবেই মীমাংসা হলো। বাকি তিন ভাই তা বুঝে মেনে নিল। ডাকাত ভাই বিবাহ করে রাজকন্যার দাবিদার হলো।[১]

দুই

রাজা সুবিদ নারায়ণের বংশধর দেওয়ান কটু মিয়া। খাজা ওছমান খাঁর সাথে যুদ্ধে সুবিদ নারায়ণ ও তাঁর বড় ছেলে পরাজিত হয়ে প্রাণ হারালে সুবিদ নারায়ণের বাকি পুত্রগণ মুসলমান হয়ে বসবাস করতে থাকেন। রাজা সুবিদ নারায়ণের চতুর্থ পুত্র ইসা খাঁর পুত্রের পরবর্তী পুরুষ দেওয়ান কটু মিয়া। বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে দেওয়ান

www.pathagar.com

কটু মিয়ার কাহিনি রচনা করা হয়েছে। দেওয়ান কটু মিয়া নিজের স্ত্রী কর্তৃক নিহত হওয়ার ঘটনা এই কাহিনিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ঘটনাটি এইরকম, দেওয়ান কটু মিয়া লংলা পরগনার কানাই টিকর গ্রামের নজসর আলী চৌধুরীর কন্যা করিমুন্নেছাকে বিয়ে করেছিলেন। করিমুন্নেছার সহিত জনৈক কানু রাম দাসের গভীর প্রণয় ছিল। করিমুন্নেছা পিত্রালয় থেকে লোক মারফত বিষ দিয়ে দেওয়ান কটু মিয়াকে মারতে চেষ্টা করেন। ইহাতে কটু মিয়া প্রাণে রক্ষা পেয়ে যান। পরবর্তীকালে প্রেমিকযুগল (কানু রাম দাস ও করিমুন্নেছা) মিলে দেওয়ান কটু মিয়াকে গলায় লাঠি দিয়ে চেপে হত্যা করে। হত্যার পর কটু মিয়া যে ঘোড়ায় চড়ে লংলায় গিয়েছিলেন সেই ঘোড়ার পিঠে করে কটু মিয়ার মৃতদেহ রাজনগরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রবাদ রয়েছে যে, যদি চাও মরতায়, বিয়া করো লংলায়। অথবা কটু মিয়ার লাকান মরার সাধ থাকলে লংলাত যাও।

এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে তৎকালীন সময়ে সিলেট অঞ্চলসহ আসাম-ত্রিপুরাতে আলোচনার ঝড় উঠেছিল। এরপর থেকে দেওয়ান কটু মিয়াকে নিয়ে অনেক কিচ্ছা-কাহিনি রচিত হয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে কটু মিয়ার কিচ্ছা-কাহিনির পালা হয়েছে। নিজের স্ত্রী কর্তৃক দেওয়ান কটু মিয়া নির্মম ভাবে নিহত হওয়াতে কটু মিয়ার মায়ের আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়েছিল। এলাকার জনগণ ছিলেন শোকাহত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কটু মিয়ার গান রচনা হয়েছিল।

তিন

ছেত পনর খাইতে তিন

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া। স্ত্রী পিঠা তৈরি করছেন, যতবার স্ত্রী তাওয়ার মধ্যে পিঠা দিচ্ছেন ততবার একটা ছেত করে আওয়াজ হচ্ছে। স্বামী এই আওয়াজ গুনে দেখলেন পনেরোবার আওয়াজ হয়েছে। স্ত্রী স্বামীকে তিনটি পিঠা দিলেন। স্বামী তিনটা পিঠা দেখে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলছে, ছেত পনর খাইতে তিন।

ছেত পনর খাইতে তিন, বিন্না গাছে ছাগির চিন

স্ত্রী মনে মনে ভাবছে রান্নাঘরে আমি পিঠা করলাম, স্বামী পনেরোটি পিঠার হিসাব কিভাবে জানলো। তাহলে আমার স্বামী নিশ্চয় গণক হয়েছে। স্ত্রী বিষয়টি পাড়ার সবাইকে জানিয়ে দিলো যে, তার স্বামী গণক। কারও কিছু হারিয়ে গেলে খুঁজে বের করে দিতে পারবে। পাড়াতে এক মহিলার ছাগল হারিয়েছে। কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না দেখে বাড়িতে গিয়ে রাগ করে স্বামীকে বলছে, বাপু! আপনি তো গুণতে জানেন আপনার বৌ বলছে। দেখেন তো আমার ছাগলটি হারিয়েছে। ছাগলটি খুঁজে পাচ্ছি না। একটু গুনে দেখেন না আমার ছাগল কোথায় আছে? রাগ করা স্বামী মনে মনে ভাবছে ইহা তার স্ত্রীর উপদ্রব। লোকটি মহিলাকে বিকালে আসার কথা বলল। লোকটি মহিলাকে বিদায় করে ছাগলের খোঁজে বাড়ি থেকে বের হলো। অনেক খোঁজার পর ছাগলটিকে একটি বিন্না গাছের কাছে দেখতে পেল। লোকটি বাড়িতে এসে বসে

www.pathagar.com

থাকল। বিকালে মহিলা আসতেই লোকটি বলল, ছেত পনর খাইতে তিন, বিন্না গাছে ছাগির চিন (চিহ্ন)। মহিলা লোকটির কথামতো বিন্না গাছের কাছে কালো ছাগলটি পেয়ে গেল। এরপর থেকে এই লোকটিকে গণক ঠাকুর বলা হতো।

চার

স্বামী ও স্ত্রী ঝগড়া করছেন। একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছেন না। হঠাৎ স্বামীর ধুতির মধ্যে আগুন লেগেছে। স্ত্রী স্বামীর সাথে রাগের কারণে কথা বলছেন না। স্বামীর ধুতির মধ্যে আগুন লেগেছে দেখে স্বামীকে সতর্ক করার জন্য বলছেন– আমি কেউরির ভালাতও মাতি না, বরাতও মাতি না, কেউড়ির লেংটি পুড়া গেলেও মাতি না।

পাঁচ

স্বামী ও স্ত্রী ঝগড়া করে কেউ কারও সাথে দু'দিন যাবৎ কথা বলছেন না। বাড়ির পাশ দিয়ে অনেক লোক পলো নিয়ে হাওরে যাচেছ মাছ ধরতে। স্ত্রী এই দৃশ্য দেখে মনে মনে স্বামীকে দিয়ে মাছ ধরানোর কথা চিন্তা করেছে। কিন্তু ঝগড়া থাকায় কথাও বলতে পারছে না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন–

স্ত্রী : হক্কল যারা পল বাওয়া, আমার যাইত কে?
স্বামী : খাইছি না লইছি না, কেমনে যাইতাম তে?
স্ত্রী : ছিকিত আছে ভাত-তরকারি, খাইলাও নানি তে।
স্বামী : কেউনি লম্বা কেউনি বাট্টি, কেমনে খাইতাম তে?
স্ত্রী : গালির উপরে গাইল তুলি খাইলাও নানি তে।[২]

খ. কিংবদন্তি

রাজনগর, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া ও জুড়ী উপজেলার মধ্যে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। সমতল, নদী, পাহাড়, হাওর সবই রয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। সম্ভবত পাহাড়-হাওরের জন্য এখানকার জনজীবনে অশরীরী দেও, দেওলা, মাল, উপরি ইত্যাদির বিশ্বাস রয়েছে। বাণ-তুফান, ঝড়ো হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জুড়ীর কোনো কোনো গ্রামে 'বাণ রাজার' দোহাই দেওয়া হয়। অর্থাৎ এই রাজা কল্পিত কিন্তু ঝড়-তুফানের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগকে রক্ষা করার মতো তার শক্তি রয়েছে। পির-ফকিরের কেরামতির কিংবদন্তি লোকবিশ্বাসে রয়েছে। রাখাল শাহ মারা যাওয়ার পরও নাকি বাঘে চড়ে হাকালুকি হাওর পাড়ি দিতেন এবং অনেক লোক এই দৃশ্য দেখেছেন। রেফাত শাহ দা দিয়ে কোপ দিলে রোগী ভালো হয়ে যেতেন। প্রাচীন সব পির সাহেবরা বাঘে চড়ে বেড়াতেন। অনুমান করা যায়, বনাঞ্চল ঘেরা এই অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব ছিল। গাজি সাহেব এসে তাদের শান্ত করিয়েছিলেন। এ অঞ্চলে বন কেটে বহু চা-বাগান হয়েছে। তখন চা-শ্রমিকরা বন কাটার পূর্বে 'বাঘাহুত' পূজা দিতেন ফলে বনদেবতার উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। গ্রাম পুনর্গঠনে এবং বন কেটে চা-বাগান তৈরির সময় এ অঞ্চলে 'বনদুর্গার' পূজা হতো। এই পূজা প্রথা এখন আর নেই। মনু

www.pathagar.com

নদী এই কুলাউড়া উপজেলার মধ্যে অতি প্রাচীন। মহর্ষি মনু দ্বারা নাকি এই নদীর সৃষ্টি। ঘন ঘন ভূমিকম্পন প্রবণ এই অঞ্চলের হাওর-বাওর এবং ছোট ছোট নদী সৃষ্টি হয়েছে ভূমিকম্পের ফলে। মনু নদীতে নাকি দেওলা বা দেও থাকে। জলের দেও মাঝে মধ্যে মানুষকে নিয়ে গেছে। মনু নদীতে 'বাইরকা মাছের' ঝাঁকের সাথে একটি সোনার মাছ নাকি থাকে, না হয় দেওলা থাকে।

বিখ্যাত হাকালুকি হাওর সম্পর্কে বলা হয়, কুকি সর্দার হাকা বা হাঙ্কা এখানে লুকি দিয়েছিলেন বলে হাওর গভীর হয়েছে। এই সর্দার রাতে ঘুমিয়ে ছিলেন, পরের দিন দেখা যায় তিনি সপরিবারে জলে তলিয়ে গেছেন। এই হাওরে দেওলা রয়েছে। মাঝে মাঝে নৌকা ডুবিয়ে ফেলে।

অত্যাচারী দেওয়ান মামন্দ মনসুর সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি কিংবদন্তি রয়েছে। তার নাম অনুসারে মনসুরনগর হয়েছে। তার দিঘিতে বহু লোককে তিনি নাকি হত্যা করেছিলেন। কথিত আছে এক লোক পাটি নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন, সেই পাটি লম্বায় কম হওয়ায় তিনি সে লোকের পা দুটো কেটে দিয়েছিলেন। তিনি বহু হত্যার নায়ক। পৃথিমপাশা ইউনিয়নের করিমুন্নেছার বাড়িতে দেওয়ান কটু মিয়াকে মারা হয়েছিল। সেই থেকে এই দিঘির পানি লাল হয়ে যায়। কিছুদিন আগে নানা সংস্কারের মাধ্যমে পানি এখন বর্তমান রং পেয়েছে। মুকুন্দপুর গ্রামের শেখ আব্দুল বারী চুরির মাল উদ্ধারের জন্য তাবিজ নদীর জলে ফেলতেন এবং তা নদীর উজান দিকে চলত। চুরির মাল উদ্ধারের জন্য বাটি চালান ও নখ তর্পণ করলে চোর দেখা যায় ও ধরা পড়ে।

কবিরাজি সম্পর্কিত কিংবদন্তি ছিল। এক পির সাহেব মামন্দ মনসুরের বাড়ির সরিষা গাছ জড়সহ উঠিয়ে ছিলেন। ফলে তাদের বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কবিরাজির গ্রামের প্রাচীন দিঘিতে রাত্রে পানপাতা দেওয়ার ফলে সকালে পিতলের জিনিস উঠত; কিন্তু একজন লোক লোভ করে একটি থালা রেখে দিলে ঐ দিঘি থেকে আর থালা-বাসন ইত্যাদি ওঠেনি। পির জীবনজ্যোতিকে কুকিরা কেটে খেয়ে ফেললে পেটের মধ্যে গিয়ে তিনি শব্দ করে পুনরায় বেরিয়ে যান। জুড়ী উপজেলার কয়েকটি মাজারে গয়বি পাথর রয়েছে। কয়েকজন এলাকাবাসী তাদের বিশ্বাসের কথা জানান যে, পির সাহেবরা ধ্যান করতে করতে পাথরে পরিণত হয়েছিলেন। জয়পাশার শা মাকালের মাজারে প্রতি সোম ও বুধবার বাঘ আসত। পির সাহেব বাঘ চড়তেন। এই মাজারের গাছ কাটলে রক্ত বের হতো। মামুপির তাঁর লিঙ্গের রাস্তা দিয়ে পাথর প্রবেশ করিয়ে ছিলেন।

রথর দিঘির 'মাল' যাবার সময় ফখরুদ্দীন সাহেবকে 'চিহ্ন' দেখিয়েছিল এবং তুফান সৃষ্টি করে চলে যায়। এই 'মাল' কবিরাজি গ্রামের দুজনকে মেরেছিল। দহবিলে ছ'কুড়ি মানুষকে জলদৈত্য মেরেছিল নৌকা ডুবিয়ে। ফানাই গাঙের ওপর সেতু দেওয়ার সময় দৈত্য বা দেওকে 'নরবলি' দিয়ে মুণ্ড দিতে হয়েছে। মনু রেলস্টেশনের পলকির পুলে 'খুঁত' ছিল, তাকেও মানুষ দিতে হয়েছে।

টিলাগাঁও ইউনিয়নের বাঘের টেকির মাজারে বাঘরা এসে বিশ্রাম নিত। শরিফপুর ইউনিয়নের হাজীখার মাজারের দিঘিতে ১০১টি ঘাট ছিল। একদিন এক বৃদ্ধার গাভী

www.pathagar.com

এই দিঘিতে পড়ে যায়। মহিলা পির সাহেবকে স্মরণ করলে তিনি দিঘির মধ্য থেকে এক হাত উপরে দিয়ে ঐ গাভী তুলে ধরেছিলেন। এই অঞ্চলে পির-ফকিরদের সংখ্যা বেশি থাকায় তাঁদেরই কিংবদন্তি বেশি। হযরত শাহ গরীব খাকি জায়নামাজ বিছায়ে বর্ষায় সময় হাকালুকির বিস্তীর্ণ পানি পাড়ি দিয়েছিলেন। শাহ হেলাল উদ্দিন কুরেশী নিয়ে বহু কথা রয়েছে। তাঁর নিত্য সহচর ছিল বড় বাঘ।

কর্মদার সন্নিকটে যুগীটিলায় যোগীরা বাতাসে ভর করে আসতেন। তাঁরা সাধনার বলে মানুষের কাটা মাথা জোড়া লাগাতে পারতেন। চড়কের বঁড়শি যাদের শরীরে প্রবেশ করানো হয় তাদের শরীর নাকি 'থামা' থাকে, এজন্য রক্ত বের হয় না। প্রত্যেকের বাড়িতে এজন্য রাখাল সাপ থাকত। সে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করত।

রাজনগরের কমলা রানির দিঘি

মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলায় কমলা রানির দিঘি নয়ে বহু কিংবদন্তি রয়েছে। রাজা সুবিদ নারায়ণ প্রায় পাঁচশত বছর পূর্বে স্বপ্নদৃষ্ট হয়ে ১২ হাল ১২ কেয়ার জায়গার উপর এই বিশাল দিঘি নির্মাণ করেছেন। কথিত আছে যে, এই কাজ করার সময় শ্রমিকরা প্রতিদিন কোদাল ধোয়ার জন্য এক কোদাল পরিমাণ মাটি সরিয়ে নিলে ঐ জায়গায়ও একটা দিঘির রূপ ধারণ করে যা আজও কোদালী দিঘি নামে পরিচিত। কিংবদন্তি আছে, রাজা দিঘি খনন করার পর দিঘিতে কোনো পানি না উঠায় রাজা পুনর্বার স্বপ্ন দেখেন তার স্ত্রী অর্থাৎ রানি কমলা যদি এই দিঘিতে নেমে গঙ্গাপূজা করেন তাহলে পানি উঠবে। নির্ধারিত দিন রানি বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে তার তিন মাসের শিশুকন্যাকে দুধ খাইয়ে দিঘিতে এসে নামেন। রানি দিঘির মধ্যে দিয়ে গঙ্গা দেবীর উদ্দেশ্যে ফুল, দূর্বা প্রভৃতি উপাচার দ্বারা আবাহন করলে নিচ থেকে পানি হু হু করে উঠতে থাকে এবং রানিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। রাজা ও উপস্থিত দর্শকরা তখন হায় হায় করেন। কথিত আছে, রানি দিঘিতে নামার আগে তিনি যে আর ফিরে আসবেন না, সে কথা অনেকের কাছে কান্নাকাটি করে বলেছিলেন। এদিকে রানির জন্য চতুর্দিকে হাহাকার পড়ে গেলে গঙ্গা দেবী একবার তাকে দিঘির মধ্যে তুলে ধরেছিলেন।

রাজা পুনর্বার স্বপ্ন দেখেন, শিশুকন্যাকে দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন হলে ভোরবেলা দিঘির পাড়ে নির্দিষ্ট ঘর তৈরি করে সেখানে শিশুকে নিয়ে যেতে হবে। শর্ত থাকে যে, তিনি কোনো অবস্থায় রানিকে স্পর্শ করতে পারবেন না। স্বপ্ন দেখার পর থেকে প্রতিদিন ভোরে রাজা সেই ঘরে শিশুকে নিয়ে গেলে পানি থেকে উঠে কমলা দেবী শিশুকে দুধ খাইয়ে চলে যেতেন। একদিন রাজার ইচ্ছা হলো রানিকে ধরে নিয়ে আসার। তিনি রানির কাপড়ের আঁচল ধরা মাত্র রানি এই বলে সতর্ক করলেন যে, তুমি তোমার শর্ত ভঙ্গ করেছ, আমি আর কখনও আসব না। এই বলে রানি কমলা দিঘিতে ডুব দেন। জনশ্রুতি আছে, দিঘির উত্তর পাড় ভেঙে কোনো এক বর্ষাকালে গঙ্গা দেবী রানিকে নিয়ে কাউয়া দিঘিতে (হাওর) চলে যান। আজও দিঘির উত্তর পাড় কিছুটা ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে। কমলা রানির দিঘিকে কেউ কেউ সাগর দিঘি বলে আখ্যায়িত করেন। আজও এই দিঘি দেখার জন্য শত শত লোক ছুটে যান।[৩]

www.pathagar.com

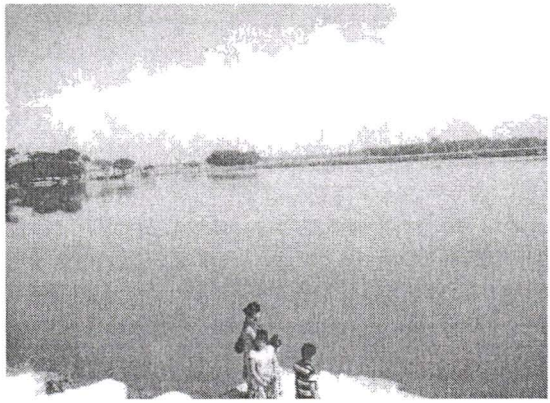

কমলা রানির দিঘি

কমলগঞ্জের ছয়ছিরির দিঘি

কমলগঞ্জ উপজেলার রহিমপুর ইউনিয়নের ছয়ছিরি মৌজায় ছয়ছিরির দিঘি নিয়েও নানা কিংবদন্তি রয়েছে। এই দিঘিটি খুবই বিশাল। দিঘিটি কখন খনন করা হয় তা জানা যায়নি। ধারণা করা হয়, রাজা সুবিদ নারায়ণের উত্তরপুরুষরা এই দিঘি খনন করেছিলেন। কথিত আছে, এই দিঘিতে 'দেও' ও 'গয়বি মাল' রয়েছে। মাঝে মাঝে সোনার নৌকা ও সোনার মাছ অনেকেই নাকি দেখেছেন। গয়বি থালা-বাসন এই দিঘিতে থাকত। পূজোর আগের দিন পান-সুপারি দিয়ে আবাহন করলে দৈবভাবে থালা-বাসন পাড়ের নিকটে চলে আসত। কিন্তু একবার কেউ একটা বাসন চুরি করলে আর থালা-বাসন উঠে আসেনি। এক সময় ছয়ছিরি দিঘির চার কোনায় চড়ক পূজা হতো এবং তান্ত্রিকরা তাদের যোগবলে নানারূপ কসরত দেখাত। এক পাড়ের চড়ক গাছের বঁড়শিযুক্ত সাধককে শূন্যে অন্য পাড়ের চড়ক গাছে নিয়ে লাগানো হতো। এবং এই চড়ক গাছগুলো দিঘির মধ্যেই রাখা হতো। চড়ক পূজার আগে পান-সুপারি দিয়ে পুনর্বার তুলে নেওয়া হতো। কিন্তু এক প্রান্তিক সাধকের ভ্রমাত্মক তন্ত্রের কারণে শূন্যে ভাসা বঁড়শিযুক্ত সাধক মাটিতে পড়ে গেলে তিন কোনার চড়ক পূজা বন্ধ হয়ে যায় ও তিনটি চড়ক গাছ আর কখনও পানি থেকে উঠে আসেনি। কেবলমাত্র বায়ুকোণের চড়ক গাছটি উঠে আসায় অদ্যাবধি ৩০ চৈত্র ছয়ছিরি দিঘির পাড়ে চড়ক পূজা হয়। এই চড়ক পূজা দেখতে হাজার হাজার লোক ছুটে আসেন এবং কয়েকদিন ব্যাপী মেলা বসে। স্থানীয় শব্দকর সমাজের লোকজন ও মালাকার সম্প্রদায়ের লোকেরা চড়ক পূজায় নিজের শরীরে বঁড়শি যুক্ত করে চড়ক গাছের উপরে উঠে গিয়ে চক্কর দেয়।[৪]

গ. ভাটকবিতা বা ভাটগান

রাজনগর উপজেলার পশ্চিম দিকে কয়েক ঘর ভাটকবি বংশানুক্রমে বসবাস করে আসছেন। গ্রামটির নাম অলহা। ভাটকবিরা কখন কীভাবে এখানে এসেছিলেন তা কেউ বলতে পারেন না। ভাটকবিদের উপাধি ভট্। এক সময় তারা মুখে মুখে গান রচনা

www.pathagar.com

করে মানুষকে আনন্দ দিতেন এবং ভিক্ষা করতেন। লোকজন গান শুনে তাদেরকে ধান-চাউল-টাকা-পয়সা ইত্যাদি সম্মানী হিসেবে প্রদান করতেন। যে কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা তাৎক্ষণিক গান বা কবিতায় রূপ দিয়ে অনর্গল সুর তুলে আওড়াতেন। বিশেষত কোনো বাড়িতে বিয়ে বা শ্রাদ্ধ হলে ভাটকবিরা সেখানে গিয়ে আসর ও বিষয় উপযোগী কবিতা পাঠ করতেন এবং তাদের জন্য দক্ষিণা নির্ধারিত থাকত। এ রেওয়াজ ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ক্রমেই বেতার-পত্রিকা বাড়ার কারণে ভাটকবিতার কাম্যতা শেষ হয়ে যায়। ভাটকবিরা তাদের কবিতা বা গান লিখে রাখতেন না। ভাটকবিরা অক্ষরজ্ঞানহীন ছিলেন। গ্রামীণ জীবন-যন্ত্রণা বাড়ার সাথে সাথে ভাটকবিদের কবিতা শুনে কেউ আর আগের মতো সম্মানী প্রদান না করায় তারা এই বৃত্তি থেকে সরে আসেন। বর্তমানে ভাটকবিরা গান গাওয়া ছেড়ে কৃষিকাজে নিয়োজিত আছেন এবং পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষরা যে কবি ছিলেন তাও যেন তারা ভুলে গেছেন। নিম্নে সংগৃহীত একটি ভাটকবিতা দেওয়া হলো।

ব্রহ্ম নিরূপণ

গুণজ্ঞানীগণ করহ শ্রবণ
ব্রহ্মনিরূপণ কথা ॥
এক ব্রহ্ম বিনে এ তিন ভুবনে
দ্বিতীয় নাহিক সর্বথা ॥
ব্রহ্ম সারাংসার ব্রহ্ম নিরাকার
নির্বিকার নিরঞ্জন ॥
সে পরমেশ্বর ব্রহ্ম পরাৎপর
ব্রহ্ম জ্ঞানী জ্ঞানাঞ্জন ॥
ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত নাহি তার অন্ত
ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রভৃতি।
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতি অণ্ডে অণ্ডে
এক ব্রহ্মের বিভূতি ॥
দুগ্ধে ছাপা ননী আছয়ে যেমনি
কেহ তা না দেখতে পায়।
শুন বলি মর্ম ব্রহ্মাণ্ডেতে ব্রহ্ম
ছাপা আছেন তেমনি প্রায়॥
সে ব্রহ্ম নিষ্কল সূক্ষ্ম সুনির্মল
স্তুতি নিন্দা বিবর্জিত।
নিত্য জ্যোতির্ময় স্থানে বিরাজয়
তমাদি ত্রিগুণাতীত ॥
এক ব্রহ্ম সত্য সকলি অনিত্য
চাহিয়া দেখ তত্ত্বজ্ঞানে।
ব্রহ্ম সত্য হয় জগৎ মিথ্যাময়
ভট্ট গৌরচন্দ্রে ভণে ॥[৫]

www.pathagar.com

ঘ. লোকছড়া

মৌলভীবাজার জেলায় প্রচুর লোকছড়া রয়েছে। বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহু ছড়া রচিত হয়েছে। এ জেলায় শিশুর প্রতিশব্দ হচ্ছে মনা, কটন, হুরুরতা, ছাওয়াল ইত্যাদি। জামাই, বিয়েকে কেন্দ্র করে অসংখ্য ছড়া পাওয়া যায়, কিন্তু অনুসন্ধানের সময় সবাই বলেছে ছোটবেলায় তারা ছড়াগুলো শুনেছেন এবং নিজেরাও একসময় ছড়া কেটেছেন কিন্তু আধুনিক কালে সব নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। মৌলভীবাজার জেলায় প্রচলিত লোকছড়ার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হলো–

শিশুতোষ ছড়া

১ বাড়ই বাড়ই হড়ই কই? – বাজারে।
কিতার লাগি? – খৈ-কলার লাগি।
কার বিয়ে? – মনার[১] বিয়ে।
কলাগাছ কাটি কাটি ধপাৎ।

২ ঘুমপাড়ানি মাই গো আমার বাড়ি আইও
খাট নাই, পিড়ি নাই, মনার চকুত[২] বইও।
মনারে ঘুম পাড়াইয়া তেলীর বাড়ি যাইও।
তেলীয়ে দিব তেল গো, মালিয়ে দিব ফুল
মনার বিয়ার সময় ব্যাঙে বাজায় ঢোল।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. শিশু, ২. চোখে।

সংসারবিষয়ক ছড়া

১ আমের তলে ঝুমুর ঝুমুর
কলার তলে বিয়া
আইলা রে নোয়া জামাই মুটুক মাথায় দিয়া।[৩]

২ গাইনী রে গাইনী
খাটটা দিবে বইতাম
দুঃখের কথা কইতাম।
বাপে করছে বিয়া
কী পোড়া পোড়ল রে
কাঠের আগুন দিয়া।
কী পোড়া পুড়াইল রে
বাঁশের আগুন দিয়া।

৩ আম গাইচ্ছা ভোলা রে
চড়ার[১] ডাক ডাকিছ না
শ্যামের গলা ভাঙ্গিছ না।
কিনিয়া আনল চাম্পা ফুল
চাম্পা ফুলের গন্ধে
জামাই আইছে আনন্দে।

www.pathagar.com

কী গো জামাই বেটার পানা
ছাতির উপর বেভোলা
নাচি আইছে কম্পোলা
কম্পোলারে সাজাইয়া
টাকা আনব বাজাইয়া।[৭]

৪ বউ-এ রান্ধন ভাজা বড়া
হড়িয়ে দিলা তোড়া-তোড়া।
কেনে গো বউ লেজ দিলায় না
লেজ নিছে বিলাই-এ
কেনে দোষ আমারে।
দুষ্ট বিলাই ধরতে পারি না
কাট-বাট, রান্দও, বাড়ও,
ইচ্ছামত ভোজন কর
আর তো আমি পাকে যাইতাম না।

৫ হড়ি মারি বউ গেলা রাগে
হকল গোষ্ঠী কান্দিয়া মরইন
বউয়ে খাইতা আগে।

৬ ভালা রান্ধি বোরা[২] রান্ধি
পতিয়ে[৩] যদি খায়,
আরিপরির কথায় আমার
কি আসে যায়।

৭ নিজের হাতে গড়ে তোলে
পরের হাতে দিতে হয়
মেয়ের বড় শক্ত জীবন
পরকে আপন করতে হয়।

৮ চেং ও উজাই, বেং ও উজাই
তাই না দেখে পুটিও উজাই।

৯ জামাইর মারে পালাইয়া যায়
উরাল বৈঠা বাইয়া যায়
ঘরে গিয়া দেখাবায় নে
কার মাই আছে, কার মাই নাই।

১০ বড় বউ বড়ের ঝি
বাপ তুলিলে করমু কি
মেজ বউ টেটিয়া
কথা কয় ফাটিয়া
ছোট বউ বাট্টার পান
ঘর গোষ্ঠীর প্রাণ খায়।[৮]

www.pathagar.com

১১ ঝেঙ্গার ফুল ফুটিয়াছে
দামান্দ আইয়া উঠিছে
কন্যার মা-নি ঘর গো
মুরগির ঠেঙ্গো ধরো গো।
মুরগির ঠেং নরম
কন্যার মা গরম।

১২ হরম গাঙ্গের ঢেউ
ফালদি উঠে রউ[৪]
ঠাকুর দাদায় বিয়া করলা
গাট্টা[৫] মারা বউ।

১৩ তন্নীর[৬] দাদিয়ে কাইন্দন গো
তন্নী কোলে লইয়া
এমন মায়ার তন্নী আমায়
কেমনে দিতাম বিয়া?

১৪ যখন আছিল দুই পাও
যথা ইচ্ছা তথা যাও।
যখন হইল চাইর পাও
ঘরের বাহিরে কই যাও।
যখন হইল ছয় পাও
ভাত-কাপড় দিয়া যাও।

১৫ এক বেটিয়ে হাটা-নাটা
দুই বেটিয়ে পেচি আটা
তিন বেটিয়ে বাজার।

১৬ চিড়া বল মুড়ি বল
ভাতের সমান নয়
পিসি বল মাসি বল
মায়ের সমান নয়।

১৭ দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা
ঘন ঘন হাসে
কথা দিয়া কথা নেয়
প্রাণে মারে শেষে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. চড়ুই, ২. মন্দ বা খারাপ, ৩. স্বামী, ৪. রুই মাছ, ৫. মোটা, ৬. শিশু।

বুদ্ধির ছড়া

গ্রামে বিয়ের সময় জামাই বা নৌশাকে ঘিরে কিছু পৈ বলা হয়- জামাই-কনের পক্ষ থেকে বুদ্ধিমান লোকেরা এসব কথার উত্তর কৌশলে ছড়ার মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। পৈ ভাঙ্গানিতে বুদ্ধির খেলার পরীক্ষা করা হয়।

www.pathagar.com

১. আচ্ছালামু আলাইকুম ভাই এমএ,
নৌশা আইলা কন্না[১] নিতে, আপনারা আইছইন[২] কেনে?
উত্তর : আলিকুম ছালাম ভাই উবা
নৌশা আইছন কইন্না নিতে, আমরা আইছি শুভা।
২. আছমান ফাটা ফাটা জমিন খাই, শরবত রাখবার জায়গা চাই।
উত্তর : আছমান তুলা তুলা জমিন পাশে, শরবত তউকা[৩] নৌশার কাছে।
৩. ডেকার[৪] অইছে না মছলমানি, ডেকির[৫] অইছে না বিয়া,
শরবত দিলাম আমরা পুংগা[৬] দুধ দিয়া।
উত্তর : ডেকার অইছে মছলমানি, ডেকির অইছে বিয়া,
শরবত খাইমু আমরা শুদ্ধ দুধ দিয়া।[৯]

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বিয়ের কনে, ২. এসেছেন, ৩. রাখেন, ৪. ষাঁড় তৈরির পূর্বের দামা গরুকে বলা হয়, ৫. গাভী, ৬. গালি বিশেষ, যে সন্তানের পিতৃপরিচয় নেই।

বৃষ্টি কামনার জন্য রাখাল ছেলেদের চাউল মাগার ছড়া

মে-গো, মা-গো খালুনি রে ভাই
এক ফুটা পানি দিলে নুন ভিজাইয়া খাই।
আলর পাজইন[১] চাল থইয়া গিরছ[২] মরে কান্দিয়া
মে-গো, মা-গো খালুনি রে ভাই
এক ফুটা পানি দিলে নুন ভিজাইয়া খাই।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. গরু মারার কঞ্চি, ২. কৃষক।

শব্দকর সমাজে প্রচলিত ছড়া

কইলে কহন-অ না যায়
না কইলে গগনও শুকায়।
কইলে মা-বাপ হারা
না কইলে স্বামীহারা।
যদি স্বামী সৎ হয়
এক দিন না আইলে কি হয়।

ভাবার্থ: জামাই শ্বশুরবাড়িতে গেলে, শ্বশুরবাড়ির নিকটজন খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়ে দিয়েছে। স্ত্রী তা বুঝতে পারলেও খোলাখুলি বলতে পারছে না। পিতা-মাতা আত্মীয়জনের মুখ চেয়ে। প্রিয় স্বামীর এমন ক্ষতিও সে মেনে নিতে পারছে না। এজন্য প্রতীকী আদলে ছড়া কেটে বিষয়টি স্বামীকে বুঝিয়ে দিয়েছে। এর ফলে স্বামী বিষ মাখানো খাদ্য না খেয়ে রক্ষা পায়।

২. আয় রে আয় বনের ভাই
বন কুলেতে আজ্ঞা জ্বলে
আজ্ঞা রে ভাই– গুয়াপান খাই।
গুয়াপান খাইতে লাগিল চুন
আমার রাখালের বড় গুণ।

www.pathagar.com

বড় গুণে অইল বেঠা
বউত অয় আইয়ার ঘরে
আইল বেটা আইল লাড়ু
দুই হাত ভরা সুবইন খাড়ু[১]।
সোনার লাঙ্গল রূপার ঈশ[২]
যিবায়[৩] যায়, অবায় শিস।
ডেকা দিছ ডেকি দিছ
চুর আইলে হজাগ[৪] থাকিছ
গিরছ আইলে[৫] ফালদি[৬] উঠিছ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. স্বর্ণের চুড়ি, ২. লাঙলের ফলা, ৩. যে দিকে, ৪. রাতের বেলায় জেগে থাকা, ৫. এলে, ৬. লাফ দিয়ে।

এই লোকছড়াটি শব্দকর সমাজে মন্ত্রের মতো পড়া হয়। গরু তাদের কাছে দেবতা তুল্য। গাভীর দুধ দোহনের আগে এই মন্ত্রবৎ ছড়াটি পাঠ করে একটা আচার-অনুষ্ঠান করতে হয়। সবাই মিলে এই আচার-অনুষ্ঠানে মিলিত হয়ে প্রসাদ গ্রহণ করে। এই আচার বা খাদ্য চাউলের গুঁড়ো ও দুধ মিশিয়ে ছাতুর মতো করা হয়। সবাই মুখে আমান্য নিবে এবং মুখ থেকে দুধ মিশ্রিত প্রসাদ গড়িয়ে পড়বে।[১০]

৩. চুত মারাউনি[১]
হেটামারাউনি[২]
করই বাজি দে
আমি যাইতাম ধরমপুর
তরে নিত কে?

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. মহিলাদের যৌন অঙ্গ নির্দেশক, ২. মহিলাদের যৌন অঙ্গ নির্দেশক।

এই ছড়ায় স্ত্রীঅঙ্গের অশ্লীল উচ্চারণ করে স্বামী স্ত্রীকে আঞ্চলিক গালি দিচ্ছেন। স্ত্রীর ব্যস্ততা– অন্য কোথাও যাবার কথা থাকলেও স্বামীর ব্যস্ততা তিনি ধরমপুর নামক স্থানে যাবেন। ভাত খাবার না থাকলে 'করই' ভেজে দিতে স্ত্রীকে বলেছেন। 'করই' হচ্ছে চাউল ভাজা করে তৈরি খাবার।[১১]

৪. কি কইতাম গো বধূর কথা
লোকের কাছে অই দোষী
নয়া বধূ রান্দাত গেলে
লুটায় ডাকে ঘটঘটি
ওগো আমার সুখপাখি।

সংসারে বউ অমনযোগী হলে পরিবারে যে অশান্তি দেখা দিতে পারে, লোকছড়ায় তারই ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। বধূ গৃহকর্মে অমনোযোগী। এখানে লুটা অর্থে পাত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১২]

৫. বড় বউ বরুয়ার ঝি
কথা কইলে করবায় কি?

www.pathagar.com

মাইঝম বউ আটিয়া
কথা যায়গি কাটিয়া।
ছোট বউর চরণখানি
ঘর গোষ্ঠীর পরানখানি।

ছড়াটিতে বড় বউ, মেজ বউ ও ছোট বউ-এর চরিত্র অল্প কথায় উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩]

৬. পানি ভাতে মরিছ গোড়া
গরম ভাতে ঘি
বন্ধুর সাথে কথাবার্তা
লজ্জা শরম কি?

৭. কালো কালো সিং মাছ
আমরা দুজন খাই না
আমরা দুজন রাজি থাকলে
অন্য কাউকে চাই না।

৮. শিব আইলা সিনান করি
গৌরি দিলা সিদ্ধি ভরি,
ওমাই ওমাই ওমাই গো
ঔনি গৌরির জামাই গো।
ল্যামটা বেটা, মাথায় ঝটা।

৯. ওর গৌরি প্রাণনাথ
মাথার উপরে জগন্নাথ
এইবার উদ্ধার কর হে শিব
বম বম বম মহাদেব।

১০. শিব যাইতা শ্বশুরবাড়ি
গাঙে আটু পানি
ঘারু ব্যাঙে লাগাল পাইয়া
করে টানাটানি।[১৪]

লোকছড়ায় কথার ভেজাল

একজন প্রচণ্ড গরমে এপাশ ওপাশ করছে
এর মাঝে মশা দিচ্ছে কামড়
প্রচণ্ড গরমে লাইড়ে দিয়েছে থাবা।
থাবা মেরে বলছে– 'গরম নায়রে
বাবা চাম্পা কলা'।
ছেলে এ কথা শুনে বলে–
'বাবা, চাম্পা কলা কই'?
বাবা 'বলে, দূর বেটা হালা'।
ঘর থেকে স্ত্রী বের হয়ে বলে–
'আমার ভাই কই'

www.pathagar.com

তখন লোকটি বলে–
'মাতিছ না[১] গো মাই
চইত[২] মাইয়া রইদে
আমার ছুদুবুদু[৩] নাই'।
এরপর একজন লোক রস করে বলছে–
'লংলার ঘরে ঘরে
বেটিন কামলা বেটাইন ঝুমলা'।
পাল্টা উত্তরে লংলার লোক বলছে–
'তরপের মাঝে দিয়া
খোয়ই খেরেঙ্গি গাং
এগু বেটির লগে
চৌদ্দগু[৪] লাং[৫]'।[১৫]

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. কথা বন্ধ রাখা, ২. চৈত্র মাস, ৩. অবসর নেই, অর্থাৎ সবসময় কাজে থাকা, ৪. চৌদ্দজন, ৫. উপপতি।

খেলার ছড়া

১. এচকি মেচকি চাবুক দারা
ওবু গেছে পাইক পাড়া
পাইক পাড়া থনে আইল সূয়া
মাটুর মুটুর ভাংগে গুয়া।
চাউল কাড়াইন্না মামি গো
মামা আইলা গামাইয়া
ছাত্তি ধর লামাইয়া
ছাত্তির উপওে কুড়া
ডাল ডাল মুড়া
রাজায় কইছে চুরির হাত কাটিয়া পালা।

২. ইটি মিটি চাম চিটি
ধোপার ঘর সিন্নি বাটি
চাউলের মাঝে কাকুড়া
বেল পালাইছে পুকুরা
এলো পেক বেল পেক
রাজায় কইছে চুরির হাত
শ্যাম সিন্দুর টেংগাত।

৩. ইছইন বিছইন দাইরকা বিছইন
ছুয়া পরে মুইট পরে, রাজার বেইট্টে চাউল কাড়ে
চাউল কাড়ান্না মাই গো, আমার দোষ নাই গো
চাউলের মাঝে উকরা বেল, পালাইছে থুকুরা এল পাত বেল
রাজায় কইছে চুরির হাত কাইট্টা পালা।

www.pathagar.com

৪. আমি একখান কথা জানি।
কি কথা? - বেঙের মাথা
কি বেঙ? - কুনি বেঙ
কি কুনি? - বাবন কুনি
কি বাবন? - ভট বাবন
কি ভট? - ছাও ভট
কি ছাও? - গু খাও।

৫. ইটি মিটি চাম চিটি চামের আগা মজুমদার
কে এল দামুদর, দামুদরের হাড়িকুড়ি
দুয়ারে বলে চাল কুরি
চাল কাড়তে হল বেলা
ভাত খাইছে দুপুরবেলা।
ভাতে পড়ল মাছি, কুদাল দিয়ে চাছি
কুদাল হইল বুতা, খাক শিয়ালের মাতা।[১৬]

প্রবাদ বিষয়ক ছড়া

১. হাসমুখী জমিদার
ঘুমটা দেওরা নারী
ফেনার তলের শীতল জল
তিন মন্দকারী।

২. বরমচালের মাটি
ফুটে না লাটি
পিছলে না পাও
চকেরচালী[১] হিকতে[২]
বরমচালে যাও।

৩. গাউর আগে রান্ধে বেটিয়ে
হাইর[৩] আগে খায়
ভরণ কলসের জল
তরাসে[৪] শুকায়।

৪. মানিকোণা কদুপুর
কন্যা মিলে জোড় জোড়
থুড়া যদি হয় দূর
এমনি মিলে তিন জোড়।

৫. আক্কলে সক্কল বন্দি
জালে বন্দি মাছ
তিরিয়ে[৫] পুরুষ বন্দি
বাকলে বন্দি গাছ।

www.pathagar.com

৬. বাপ ভালা যার বেটা ভালা
মা ভালা তার ঝি
গাই ভালা যার বাছুর ভালা
দুধ ভালা তার ঘি।
৭. অভাবে স্বভাব নষ্ট
মুখ নষ্ট বরণে
ঝড়ায় ক্ষেত নষ্ট
বউ নষ্ট মারণে।
৮. ভালা মানসে লাথ খায়
গাল হাতাইয়া ঘরে যায়
কমিনে লাথ খায়
পথে পথে কইয়া যায়।
৯. ভাটেরা বরমচাল
মাঝে মাঝে ছড়া
বেটিন ফরফরা
বেটাইন মরা।
১০. আঘতে আঘতে পুটকি হইল খর
আগে আঘতা কলার তলে
এখন আঘইন ঘর।
১১. এমন কথা কইমু, কেউ না কইব জুট
এমন বওয়া বইমু, কেউ না কইব উঠ।
১২. নরম নরম তিন নরম
ভালা মাইনসের বেটি নরম
বোয়াল মাছের পেটি নরম
ভদ্র মাইয়া মাটি নরম
কমিনের বউ গরম।
১৩. বৈতল বৈতল তিন বৈতল[৬]
মামুর বাড়ির ভাগ্না বৈতল
হউরবাড়ির[৭] জামাই বৈতল
বইনের[৮] বাড়ি ভাই বৈতল।
১৪. ধান ধন বড় ধন
আর ধন গাই[৯]
সোনা রূপা কিছু কিছু
আর সব ছাই।[১৭]
১৫. বেটা বলতে মান মনসুর
আর সব পোয়া[১০]
হাওর বলতে হাকালুকি
আর সব কুয়া।

www.pathagar.com

১৬. আলী আমজাদের ঘড়ি
চান্নি ঘাটের সিঁড়ি
চাপঘাটের বাড়ি
বিপিন বাবুর দাঁড়ি।

১৭. উচ কপালী চিরল দাঁতি
পিঙ্গল মাথার কেশ
সেই কইন্যা বিয়া করলে
ভরমে[১১] নানান দেশ।

১৮. লংলা গাইয়া বেটি গো
উঁচাত বান্ধে খোঁপা
দেওরের সঙ্গে নাটাগোটা[১২]
হড়ির[১৩] সঙ্গে চোপা[১৪]।

১৯. খাইতে ভালা ভাজা করই[১৫]
দেখতে ভালা মুড়ি
রসিক ভালা এক পুতের মা
দেখতে ভালা চুড়ি।

২০. তুমি থাইক্যা তুই ভালা
যদি থাকে ভাব
আনা থাইক্যা পাই ভালা
যদি হয় লাভ।[১৮]

২১. নাও নষ্ট গুদারা ঘাটে
তিরি নষ্ট চাটে
হারি[১৬] ঘরের বউ নষ্ট
আরিপরির[১৭] পাঠে।

২২. নিম তিতা নিসিন্দা তিতা
তিতা মাকাল ফল
তার চাইতে অধিক তিতা
তিন সতীনের ঘর।

২৩. নারী ভালা পেদলী
ফল ভালা কদলী
জল ভালা ভাসা
মানুষ ভালা চাষা।

২৪. বাইন্যা দরজি সুতারের ভাইল[১৮]
নিত্য কইব আইজ না খাইল।

২৫. জ্ঞান ছাড়া বুদ্ধি ছাড়া
তার বাড়ি ঘিলা ছড়া।[১৯]

www.pathagar.com

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. কূটনীতি, ২. শেখার প্রয়োজন হলে, ৩. স্বামীর, ৪. তাড়াতাড়ি, ৫. স্ত্রী, ৬. অলস ব্যক্তি, যিনি অন্যের উপর খাওয়া-দাওয়া করেন, ৭. শ্বশুরবাড়ি, ৮. বোনের, ৯. গাভী, ১০. ছেলে, ১১. ভ্রমণ, ১২. প্রণয়ভাব, ১৩. শাশুড়ি, ১৪. চুপ থাকে, ১৫. চালভাজি, ১৬. নিকট প্রতিবেশী, ১৭. পাড়া-পড়শি, ১৮. ভালো ব্যবহার দেখানো।

২৬.

শ্রী রাকেশ চন্দ্র সরকার প্রবাদ, উপদেশ বাণীসমূহ যেমন জ্ঞানী-গুণী মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন, তেমনি এগুলোকে নিজের ভাষায় ছন্দে, কবিতার মিলে তুলে ধরেছেন। গুণকীর্তন এবং আকর্ষণীয় করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এসব লোককথা, উপদেশ এর কিয়দাংশ চানক্য সংস্কৃত শ্লোক থেকে ভাষার ছন্দের ভাষায় ভাষারূপ দিয়েছেন। নিজের তৈরি কিছু প্রবাদও তিনি অভিজ্ঞতা থেকে এনেছেন। যা আমাদের সমাজ জীবনের বাস্তবজ্ঞানকে চিহ্নিত করে।

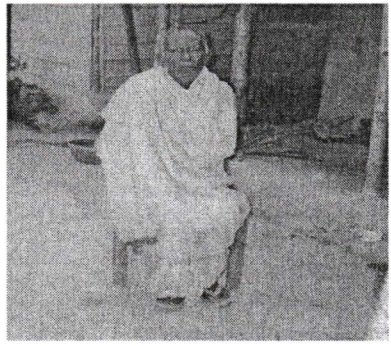

রাকেশ চন্দ্র সরকার

তিনি এগুলো 'নীতিমালার ঝুড়ি ও প্রবাদ' হিসাবে একখানা পুস্তিকায় ১৯৯৩ সালে প্রকাশও করেন। তার নীতিমালার ঝুড়ি থেকে এগুলো এখানে সংগ্রহ করা হয়েছে।

নির্জন কাননে সেও হয় বিহিত
তথাপি না কর বাস বেঈমানের সহিত।
উত্তম বিনা দ্বিধায় বলে অধমের সাথে
অসুবিধা দেখা দেয় কিন্তু মাধ্যমের সহিতে।
মুখ গোধা ভিতর বোধে চশম ছাড়া নারী
পানার নীচে ঠাণ্ডা জল সবার মন্দ চাষি।
গর্ব ও সত্ত্বতা হয় পতনের মূল কারণ
ইহকালে পাবে না ত্রাণ, শাস্ত্রে আছে বিবরণ।
ঝোঁকের মাথায় কোনো কাজ করা ভাল নয়
পরিণামে ফল অনেক পেতেই খারাপ হয়।
সবার চেয়ে বড় প্রতারক যে নিজেকে ঠকায়

www.pathagar.com

সংশোধনের সময় হলে উত্তীর্ণ কবে হায় হায়।

মায়ের চরণতলে যেভাবে স্বর্গের সমান
সেই ছেলে কানে শুনে হয় মহীয়ান।
সুখ আসে নীরবে
ছেলে যায় সত্তর
দুঃখ আসে সবচেয়ে
বিদায় করা দুষ্কর।

কু গল্প বর্জন কর
সৎপথে পাড়ি ধর
রবে না কলঙ্কের ভয়
হবে মন্দিল, হবে জয়।
অতিথ বিমুখ হলে
ধর্ম যাবে রসাতলে
অতিথেতা ধর্মের সংগ
শাস্ত্রে আছে বিশেষ প্রসঙ্গ।

অপাত্র করিলে যাচঞা
পূরণ হয় না প্রার্থনা
মনে আসে অনুশোচনা
আসে অশান্তি যাতনা।
পরিশ্রমে আসে ধন
ধনে আনে সুখ-শান্তি
আলস্য আনবে কবে হীন
জীবনে আসে অশান্তি ॥

নীরব থাকাই ভালো সাজে
নতুবা প্রমাণ হতে ভাষাতে

খেয়ে ওঠে ঘরে গমন
তার পাছে ধায় তার গমন।

খাওয়ার পর কিন্তু বিশ্রাম
সাহায্য করে স্বাস্থ্য হজমে।

ক্ষুধাকালীন খেলে জল
তাতে হয় ভারি কুফল।
খাদ্য খাইলে পিপাসায়
রোগ হয় যকৃত ও পক্ষীহায়।

www.pathagar.com

যে কথায় বা আচরণে
ব্যথা লাগে অন্যের প্রাণে
কদাপি সে কথা বা আচরণে
দুঃখ দিত না আপনজনে।
ভালো কাজে আসেই জল
কুকর্মের ফল হয় কুৎসিত।

বিধির বিধান আর কি বলো
যার যাহা পাবে সমোচিন।

মানুষ হয় অভ্যাসের দাস
শুনা যায় অনেক ইতিহাস।
ভালো কে কবে মন্দ করে কাবু
অভ্যাস গুণে চোর হয় এভু।
দুষ্টজনের মিষ্টি কথায়
বাড়ায় মিথ্যা আত্মীয়তা
সুযোগ পেলেই কপটতায়
প্রকাশ পায় দীনতা।
যদি কারো স্ত্রী হয় উগ্রপন্থী
তার জীবনে পাবে না শান্তি।
স্ত্রী মনোরঞ্জনে সে থাকে ব্যস্ত
প্রসাদ ভেবে সদা থাকে সে ত্রস্ত।
তপ, জপ, ধ্যানে ও কর্মে
যদি না আসে সমতা
এরূপ নীচক ভণ্ডামি ধর্মে
প্রকাশ পায় মুর্খতা।

সহস্র গাভী যদি থাকে একত্র
বাছুর পায় তার মাকে, না হয় ব্যর্থ।
সে জন্য পাপ খুঁজে তার বাবাকে
যেখানেই থাকুক সে পাপ পাপীকে।

ভয় বা বিপদকে করিও না ভয়
যতক্ষণ না সম্মুখে উপস্থিত হয়
যখন উপস্থিত হতে সম্মুখে
করিতে হয় সাহস করিয়া বুকে।
অন্যায় করো না, করে সমর্থন
ক্ষমতা আছে, করে না বারণ
সেও সমান পাপী, শাস্ত্রের নীতি

www.pathagar.com

তাহাকে ক্ষমা করবে না নিয়তি।

পেটের অর্ধেক পূরণ কর ভাবে
তার অর্ধেক কর পূরণ পানিতে
এক ভাগ রাখ বায়ু চলার নিমিত্তে
এভাবে খেলে হবে অসুখ পেটেতে।

কাকের ন্যায় হওয়া চাই সচেষ্ট
বকের ন্যায় হওয়া চাই ধ্যানী
কুকুরের ন্যায় অল্পহার ও নিদ্রায় তুষ্ট
যে করে পালন জীবনে লাঘব যে কষ্ট।
সুযোগ আসে যদি জীবনে কখন
যথার্থ মূল্যে তাকে করো সম্ভাবনা
অবহেলা আসলে যদি যে যায়
জীবনে সে তো আর হবে না।
বিদ্যা মানুষ করে বিনয় দান
বিনয় মানুষ করে মহান।

মহান হলে মানুষও দিতে আসে ভক্তি
ভক্তিতেই আসে শান্তি, আসে মুক্তি।

নিরপেক্ষ বিচারে মনে আসে শান্তি
যদিও দোষী ব্যক্তি বিচারে পায় শান্তি
শুধু শান্তি নহে আসে স্রষ্টার আশীর্বাদ
ইহকাল ও পরকালে থাকে না ঝঞ্ঝা ও প্রমাদ।

সদুতী, সুকেশী আর সুভাসিনী
দেহের আকৃতিতে অসতা শ্যামাকিনী
কুলজ মুখাকৃতি আর যে সুনতনী
সে নারী হয়, মুসলমান সম্প্রদায়ের বাণী।
মাতা, মাতৃভূমি শ্রদ্ধার যোগ্য যেমন
মাতৃভাষাও শ্রদ্ধার যোগ তেমন
সাহিত্যবিদ ও শহীদুল্লাহ মতে
তিনিই শ্রদ্ধার্ঘ, ব্যতিক্রম একই এতে।

কাছে থাকা ভজন নহে কামিনী পাঙ্কনে
অসুবিধা হয় কিন্তু সাধন ভজনে।
সংসারীরও যেমন নারীর প্রয়োজনে
তেমনি কাঙ্গালের কাছে বিশেষ প্রয়োজন।
সত্যের পরীক্ষা কর চিন্তা কর্মকার

www.pathagar.com

মিত্রের পরীক্ষা কর বিপদে তোমার।
বন্ধুকে পরীক্ষা কর দুঃখের সময়
স্ত্রীকে পরীক্ষা কর হলে সময়।

পিতার পরিচয়ে, পুত্রের পরিচয়
পুত্রের জন্য কভু, তাহা সহজ নয়।

পুত্র যদি তবে তাতে হয় মান্যগণ্য
পিতা-পুত্র তখনই হয়ে ওঠে ধন্য।

প্রতিবেশী চোর আর অযোগ্য গৃহিণী
অবাধ্য পুত্র আর ঘরের হীন ছাউনি
এরূপ পরিবেশে যাদের হয় বাস
অশান্তির অনলে পুড়ে হয় জীবন নাশ।
সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে
গুণবান স্বামী হলে মিলে তার সনে
নারী গুণবতী হলেই আসে না সফলতা
যদি না থাকে স্বামীর একনিষ্ঠ সহায়তা।

আমি যাহা করি অপর কেহ বুঝে না
এই যাদের ধারণা
কুপঙ্ক সে, দেখে শুধু কুপের সীমানা
সমুদ্র হে কত বড় সে জানে না।
ভীত সে বিপ্র, শীতল আবহাওয়ায়
যে রাত্রির ভয় পায় রণ ধামামায়।
যে নারী ভয় পায় যাইতে পাকশালায়
উপেক্ষার পাত্র তারা স্বধর্ম হীনতায়।

অতি ক্রোধে থাকে যার বিশেষ ধৈর্যতা
কোনো কাজকর্মে থাকে না যার ব্যবস্থতা
দুঃসময়ে থাকে যারা পরচিন্তের স্থিরতা
যে কোনো বিষয়ে বা কর্মে আসে সফলতা।

মানুষ মরণশীল, সবাই আছে জ্ঞাত
সুযশ মানুষকে করে চির জীবিত।
রীতি জীবনের বাইরে যারা ধারা
সুযশ ও সুখ্যাতির অধিকারী যারা।
কাজের সময় কাজে মন কর আকৃষ্ট
খেলার সময় থাকে নিবিষ্ট।

www.pathagar.com

ইহাই সফলতার সর্বোৎকৃষ্ট নীতি
যাহার ফলে জীবনে আসে সুখ ও শান্তি।
যাহা প্রতিকার করার না থাকে গলায়
ধৈর্য সহকারে সহ্য করা জ্ঞানী হয়ে গায়।
তবু প্রতিকারের তবে করিলে উপাল
ধনে জনে সর্ব বিষয়ে হইবে বিফল।
বিজ্ঞজনের চালচলন হয় অতি বিচক্ষণ
দাঁড়ায়ে পদক্ষেপের স্থান করেন নিরীক্ষণ।
বিবেচনার পর পদক্ষেপ করে স্থাপন
ইহাতেই অনেকে করে পলায়ন।

খালি পেটে টক খাওয়া যেমন অনুচিত
তেমনি ভরা পেটে বেল খাওয়া কিন্তু গর্হিত
উভয় ফল মানবদেহের করে উপকার
খালি পেটে বেল, ভরা পেটে টক কর আহার।

শুধু সৎ চিন্তা, সৎ কর্তব্য সাধনে অলসতা
সেটাও নহে বিত্ততা
সৎ চিন্তার সাথে থাকা চাই কাজের দৃঢ়তা
নতুবা আসে না সফলতা।

সবে জ্ঞাত কাজ অতি চালাক ও ধূর্ত পাখি
বোকামি করে ফেলে দেখাতে গিয়ে চালাকি
মোদি আখি বাপে আহার ভাবধরা অন্ধকার
সেরূপ অবাধীনে দু'দিন করেন ব্যবহার।
উচ্চ বংশে জন্ম নিলেই বড় না মহামানব
নীচ কুলন্ত হয়েও যদি হয় সহ্যপ্রাণ
আবরণে যদি হয় কাজে মহত্তের উদ্ভব
সবার কাছে আসে মহৎ প্রাণ সম্মতি।

মাতা-পিতার সঙ্গে যে দেখা করবে আচরণ
সেইরূপ ব্যবহার করবে তব পুত্র-কন্যাগণ
ভালো কাজের ফল ভালো, মন্দ কাজের ফল মন্দ
ইহাই দুনিয়ার নীতি, কাজের সনে রহে সম্বন্ধ।
অজ্ঞ মিত্র হলে শত্রুও ভালো যদি হয় জ্ঞানী
এরূপ শত্রু হলে মারাত্মক হবে না হানী
কিন্তু অজ্ঞের অজ্ঞতা ও অনিচ্ছায় যা ঘটবে
জীবনে হয়তো কোনোদিন তা পূরণ না হবে।[২০]

www.pathagar.com

অন্যান্য লোকছড়া

১

গনকটা, গনকটা
মই বড় গনকটা
আধের চাউলে ভাত খাই
পথে পথে ছেরি যাই।

২

আগে আগতাম কলার তলে
এখন আগি ছালের তলে
আগা আগা বউত জাত
খাউরা আগা কড়ক নাথ।
কেউ কয় দাস্ত
কেউ কয় বুনি আগা
আগারে লইয়া যদি
কেউ ডাক্তার বাড়ি পস্ত
ডাক্তার সাব নাড়ি ধরি রোগ বুঝত।

৩

নিমাই চান চান রে
মালা দিল তোর মায়
তিলক দিল কে?
গেছিলাম গেছিলাম গোয়ালের পাড়ায়
সুন্দর দেখিয়া তিলক দিল গায়।

৪

হাতে লইয়া সর লনী
ডাকে তোর মাওয়ে
বাচাধন ঘরে আয় রে,
হাতে লাঠি নন্দরানি দিল রে দৌড়াইয়া
ফাল দিয়া উঠে বাছা কদমডাল বাইয়া রে
বাচাধন ঘরে আও আও রে।[২১]

৫

চৈত না বৈশাখ মাসে
আলির পেট করি গোয়ালে লড়াছড়ি।
তারে দেখিয়া গিরতাইন বেটিয়ে
নিল কাপড়ের তল কাটি।
বসাইয়া চিনাইয়া করল সারা
ঘর গোষ্ঠী হাবি গোষ্ঠী

www.pathagar.com

অইলা এক পারা।
পুয়ার পুন্দে
পুড়ির পুন্দে।
পুড়ির পুন্দের তল দিয়া
গোয়াল মাছ আয় আর যায়।
চৈত মাসের দিন কোন শালার
গোয়াল মাছ খায়[৪]।

এই লোকছড়ার মধ্যে বাঙালির চরিত্রের লোকায়ত জীবনপ্রণালীর একটা আলোকপাত করা হচ্ছে। এর বর্ণনায় আমাদের কৃষিভিত্তিক সমাজের আহার-বিহার ও বাসস্থানের একটা চিত্র ফুটে উঠে। মাছে ভাতে বাঙালি– লোকছড়ায় এ তথ্য জানা যায়।[২২]

৬

হটায় মারল হটিরে
হটি গেলগি[১] পিছে
হকল যারা মাছ মারা
কেউ নি[২] যাইতায় তে।
খাইছি না লইছি না
কেমনে যাইতাম তে
ছিকায়[৩] আছে ভাত ছালন
লইয়া খাইলাও তে।
কে বাট্টি[৪] কেউ লম্বা
কেমনে লইতাম তে।
গালির উপর গাইল[৫] লাগাইয়া
লইয়া খাউলাউ তে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. চলে গেল, ২. কেউ কি, ৩. পাটের দ্বারা তৈরি দড়ির ঝুলন্ত জিনিস, ৪. খাটো, ৫. চাউল পেষার যন্ত্র বিশেষ।

এই লোকছড়াটি কৃষিভিত্তিক জীবনকে নির্দেশ করছে। হটা স্বামী, হটি স্ত্রী। দু'জনে অভিমানে কথা বলছেন না। এমন সময় গ্রামের লোকজন মাছ ধরতে রওনা দিয়েছেন। তখন স্ত্রী নাম উচ্চারণ না করে ছড়ার মাধ্যমে বিষয়টি স্বামীকে জানিয়েছেন। স্বামী ইঙ্গিতে তা বুঝে নিয়েছেন।

৭

কৈ রইল বাইশ
দুই কৈ দি রাখি লাইছি
পুয়া-পুড়ির বাইশ।
কৈ রইল বিশ
দুই কৈ দি রাখি লাইছি
লাঙল আর ইশ।

www.pathagar.com

কৈ রইল আঠারো
দুই কৈ দিলাইছি
পরের ঘরের খাটাল।
কৈ রইল ষোলো
দুই কৈ দিলাইছি
নালি পাতার ঝুল।
কৈ রইল চৌদ্দ
চইত মাইয়া রইদ।
কৈ রইল বারো
দুই কৈ দিলাইছি
তর বইন সার।
কৈ রইল দশ
দুই কৈ দি রাখি লাইছি
কুইয়ার রস।
কৈ রইল আট
দুই কৈ দি রাখি লাইছি
বইবার খাট।
কৈ রইল ছয়
দুই কৈ দি লাইছি
তর বইন জয়।
কৈ রইল চাইর
দুই কৈ দি পালাই দিছি
ঘরের হাইর বাইর[৬]।
কৈ রইল দুই
দুই কৈ দি রাখি লাইছি
গুড়া আর বুই।

এই ছড়াটিতে স্ত্রী বিশটি কৈ মাছ রেঁধে লোভ করে নিজেই খেয়ে ফেলেন। এখন স্বামীর কাছে কৈ মাছের হিসাব দিতে গিয়ে এই ছড়ায় যুক্তি দিয়ে অন্য কোনো বিষয়ের অবতারণা করেছেন।[২৩]

মণিপুরী মৈতৈ সম্প্রদায়ের শিশুতোষ ছড়া

হা ইমা, ইমা-ও...
ঐসূ লাক্কে ইমা ও!
নোং চুই লাক্কনু।
য়েম্পাক তুপ্তুনা মরাক্কে।
লম্বী নালি লাক্কনু।
চয়শু শুদুনা মরাক্কে।

www.pathagar.com

এখানে সন্তান ও মায়ের কথোপকথনের আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক চির পরিচিত চিত্র। বর্ষণমুখর দিনে মা বেরোচ্ছেন কাজে। শিশুসন্তান মায়ের সঙ্গী হতে ইচ্ছুক। সন্তান বলছে– মা-মা, আমিও তোমার সাথে আসবো। মা বলছেন– 'বৃষ্টি পড়ছে, এসো না'। শিশুর জবাব, 'ছাতা মাথায় আসবো'। 'পথ পিচ্ছিল এসো না'- মায়ের প্রতিউত্তর। কিন্তু নাছোড়বান্দা সন্তান তবু বলছে, 'লাটি ভর দিয়ে আসবো মা'।

ঘুমপাড়ানি গান

থা থা থাবুংতোন
নচা মোরাম্বী পোবিগে,
পোবী শনম নম্বীগে
থৈবোং অমতং থাদরকউ।

ছড়াটি অনেকটা আয় আয় চাঁদ মামার মতো। শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে মা বলছেন, চাঁদ চাঁদ– হে পূর্ণ চাঁদ, তোমার সন্তানকে আমি কোলে পিঠে বড় করবো– আমার জন্য একটি কাঁঠাল ফেলে দাও।[২৪]

তথ্যনির্দেশ

১. খন্দকার আব্দুল মতিন, শ্রীনাথপুর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ৮ নভেম্বর ২০১১
২. প্রণয় দাস, দক্ষিণ বাড়ন্তি, মৌলভীবাজার সদর, সংগ্রহের তারিখ : ২২ নভেম্বর ২০১১
৩. জয়নাল আবেদীন শিবু, গ্রাম : মশাজান, উপজেলা : রাজনগর, মৌলভীবাজার, জন্ম : ১৯৮২, পেশা : শিক্ষক ও লোকসাহিত্য সংগ্রাহক, সংগ্রহের তারিখ : ৮ আগস্ট ২০১১
৪. ইউছুব আলী, শমসেরনগর, কমলগঞ্জ; ব্রজেন্দ্র শর্মা, বিজলী, কুলাউড়া; রুমা বেগম, ভুকশিমুইল, কুলাউড়া; জাহানারা বেগম, খুমিয়া, কুলাউড়া; কালিপদ দেবনাথ, সিদ্ধেশ্বরপুর, মুন্সিবাজার, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ১২ ডিসেম্বর ২০১১
৫. কৃপেশ রঞ্জন শর্মা, গ্রাম : অলহা, কাউয়াদিঘির পাড়, রাজনগর, মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ৮ মার্চ ২০১২
৬. ক. মো. শফিকুর রহমান, গ্রাম : আমতৈল, ডাকঘর : কাদিপুর, উপজেলা : কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ২৫ নভেম্বর ২০১১; খ. মো. ফয়েজ খান, গ্রাম : দক্ষিণপাড়া, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ২৬ নভেম্বর ২০১১; গ. জুয়েলী সূত্রধর, গ্রাম : হরিরামপুর, জুড়ী, সংগ্রহের তারিখ : ২৬ নভেম্বর ২০১১; ঘ. লাকী চক্রবর্তী, উত্তর কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ২৭ নভেম্বর ২০১১; জাহানারা, খুমিয়া, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ১৩ ডিসেম্বর ২০১১
৭. জহিরুল ইসলাম, সোনারূপা চা-বাগান, জুড়ী, সংগ্রহের তারিখ : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২
৮. ক্ষিতিষ চন্দ্র সরকার, সবুজবাগ, শ্রীমঙ্গল, সংগ্রহের তারিখ : ২৮ এপ্রিল ২০১২
৯. জুয়েলী সূত্রধর, জুড়ী, সংগ্রহের তারিখ : ২ নভেম্বর ২০১১
১০. রবাই শব্দকর, আলীনগর ইউনিয়ন, বালিটেকী, সংগ্রহের তারিখ : ২৪ জুন ২০১১
১১. ব্রজেন্দ্র শব্দকর, সোনাপুর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২৪ জুন ২০১১
১২. সতীশ শব্দকর, মইডাইল, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২৮ জুন ২০১১
১৩. জিতেন্দ্র মোহন অধিকারী, সবুজবাগ, শ্রীমঙ্গল, সংগ্রহের তারিখ : ৩০ জুন ২০১১

www.pathagar.com

১৪. শুভই শব্দকর, বাদে সোনাপুর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২৮ জুন ২০১১
১৫. ইউসুফ আলী, শমসেরনগর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২৮ আগস্ট ২০১১
১৬. লিবা, রুবিনা, রুশনা, অনি, গ্রাম : আমতৈল, মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ২৪ নভেম্বর ২০১১
১৭. আব্দুল মালেক, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ৪ নভেম্বর ২০১১
১৮. জয়নাল আবেদীন শিবু, রাজনগর, সংগ্রহের তারিখ : ৫ মার্চ ২০১২
১৯. জুয়েলী সূত্রধর, জুড়ী
২০. রাকেশ চন্দ্র সরকার, শ্রীমঙ্গল
২১. মানিক লাল দাশ, পিতা : মৃত দিগেন্দ্র কুমার দাশ, সাকিন : সারিয়া, ডাকঘর : কনকপুর উপজেলা ও জেলা : মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ৮ অক্টোবর ২০১১
২২. রমজান বয়াতী, শ্রীনাথপুর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২২ জুন ২০১১
২৩. ইস্তু মিয়া, শ্রীনাথপুর
২৪. প্রতাপচন্দ্র সিংহ, (অব. শিক্ষক) বয়স : ৬২ বছর, ভাণ্ডারী গ্রাম, কর্মদা ইউপি, কুলাউড়া উপজেলা, সংগ্রহের তারিখ : ২৬ ও ২৭ মার্চ ২০১২

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রচুর বাঁশ-বেত পাওয়া যায়। বর্ষার সময় লোকজনকে ঘরে বসে থাকতে হয়। এ সময় কৃষকরা ঘরে বসে তাদের দৈনন্দিন কাজের ব্যবহারের জন্য বাঁশ-বেতের জিনিস তৈরি করে নিতেন এবং এখনো করেন। নদীপথে যোগাযোগ ভালো থাকায় মাটির হাঁড়ি-পাতিল কলস অন্যান্য জেলা থেকে এখানে চলে আসে। সামান্য কিছু মৃৎশিল্পের উৎপাদন হলেও এখন সবই প্রায় বিলুপ্ত। জেলার কুলাউড়ায় হাঁড়ি-পাতিল তৈরির কাজ এখনো কিছু টিকে আছে। বর্তমানে সামান্য টিকে আছে পাটিশিল্প ও বাঁশ-বেত শিল্প। একসময় সূত্রধররা কাঠের সিন্দুক, দরজায় নকশা করতেন। চেয়ার, টেবিল ও চৌকির পায়াকে সুন্দর করতে তাদের জুড়ি ছিল না। এখন আর এই পেশায় তারা কেউ নেই।

১.মৃৎশিল্প

মৌলভীবাজারের সৈয়ারপুরের শ্রী শিবু চন্দ্র পাল ও শম্ভু চন্দ্র পাল প্রায় ২০ বছর যাবত দেব-দেবীর মূর্তি গড়ার কাজ করে আসছেন। তাদের পিতা সুনীল চন্দ্র পাল। মৌলভীবাজারের বারহাল অলহা গ্রামের রুমনা শব্দকর এঁটেল মাটি দিয়ে সিকর তৈরি করেন। মৃৎশিল্পে শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জের নামডাক রয়েছে। এখানকার মৃৎশিল্পীরা নিত্যব্যবহার্য হাঁড়ি, কলসি, সরা, পুতুল, খেলনা, টব প্রভৃতি তৈরি করে থাকেন।

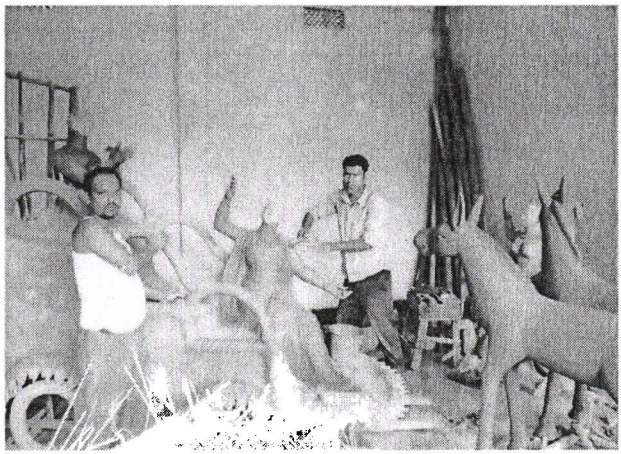

মূর্তি তৈরির ছবি

www.pathagar.com

২.শীতলপাটি

কুলাউড়া উপজেলার জায়ফর নগর ইউনিয়নের শাহপুর ও কাদিপুর ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে পাটিশিল্প এখনও বেঁচে আছে। পাটিশিল্পের প্রধান উপকরণ মুত্রাবেত। সাধারণ জলাশয়ে 'মুত্রা' নামে এক জাতীয় তিন-সাড়ে তিন হাত লম্বা উদ্ভিদ জন্মে। ব্যাস প্রায় দেড় ইঞ্চি থেকে তিন-চার ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। মুত্রার বয়স ২/৩ বছর হলে সেগুলো কেটে বেত বের করা হয়। তখন সেগুলোতে রং দেয়া হয় এবং রোদে শুকানো হয়। বাকিগুলো দীর্ঘ সময় পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। পাটিকে পিচ্ছিল করার জন্য পোক্ত মুত্রার দরকার, এজন্য তেলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখতে হয়। বেতগুলো খুবই চিকন করে তৈরি করতে হয়। একটা পাটি তৈরি করতে ১০/১৫ দিন সময় লাগে। গরিব পরিবারের সকল সদস্য পর্যায়ক্রমে পাটি বুনে থাকেন। রাজনগর উপজেলায় এক সময় শীতলপাটি তৈরি হতো। বর্তমানে অনেকেই এই পেশা ছেড়ে দিয়েছে।[১]

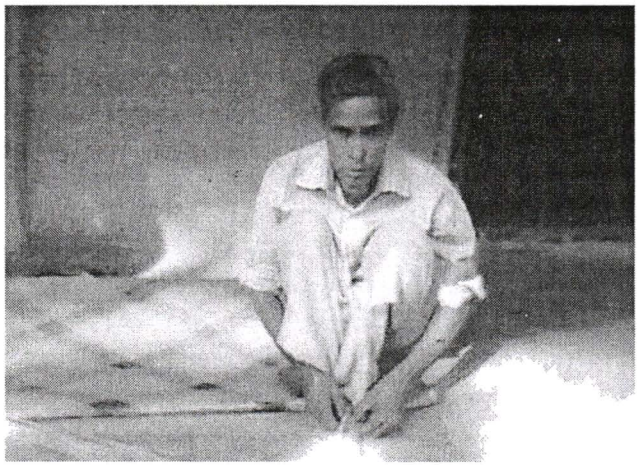

পাটি তৈরির ছবি

শীতলপাটি

www.pathagar.com

৩. মণিপুরী তাঁত শিল্প

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া ও জুড়ী অঞ্চলে কিছু মণিপুরী সম্প্রদায় বসবাস করেন। তারা নিজেদের পোশাক নিজেরাই বোনেন। পোশাকে প্রয়োজনমতো বিভিন্ন নকশাও তোলেন। প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই নিজস্ব তাঁত রয়েছে। চরকা ও তাঁতের সাহায্যে তারা দৈনন্দিন ব্যবহারের পোশাক ছাড়াও উৎসবের পোশাক, চাদর, কম্বল প্রভৃতি তৈরি করে থাকেন। মণিপুরী শাড়ি ও চাদর খুবই বিখ্যাত।

৪. কারুশিল্প (বাঁশ-বেতের কাজ)

বৃষ্টিবহুল কুলাউড়া-জুড়ী অঞ্চলে বর্ষাকালে কৃষকরা ঘরে বসে বাঁশ-বেতের কাজ করতেন। গৃহকর্মের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের নামও ছিল রকমারি। মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজলার কাদিপুর ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে বাণিজ্যিক ভাবে বাঁশ-বেত শিল্প এখনো কিছুটা বেঁচে আছে। বিশেষত টুকরি, তরিতরকারি রাখা বা ধোয়ার জন্য খলই, চাউল ধোয়ার ধুচইন, কৃষকের মাথার ছাতা, বই রাখার রেক (পূর্বে নাম ছিল টাক), মাছ ধরার উকা, ডরি, পলো, এছু, পারইন (বাঁশ-বেত দ্বারা নির্মিত স্থানীয় মাছ ধরার ফাঁদ), ধান পরিমাপের জন্য পুরা, ধান-চাউল পরিমাপের জন্য হের, জিনিসপত্র রাখার জন্য ডালা, কুলা, চাইন বা চালনি, ফেচা ইত্যাদি তৈরি করেন। জালিবেত দিয়ে আসবাবপত্র এবং শৌখিন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস যেমন-চেয়ার, টেবিল, দরজা, সোফাসেট, দোলনা প্রভৃতি তৈরি করা হয়ে থাকে। বুধপাশা ও ধামুলী গ্রামে চাচ (চাটাই) বা ডাম তৈরি হয়। নন্দির গ্রামে মাটি কাটার টুকরি তৈরি ও বাজারজাত হয়ে থাকে। রাজনগর উপজেলার চাটুরা গ্রাম একসময় বাঁশ-বেত ও পাটি তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল। এছাড়া কমলগঞ্জের আদমপুর ও ইসলামপুর ইউনিয়নের বাঁশ-বেতের তৈরি সামগ্রীর কদর রয়েছে।[২]

কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের বাঁশ-বেতের কারিগরবৃন্দ

www.pathagar.com

বাঁশ-বেতের কাজ

৫. আগর শিল্প ও আতর শিল্প

বড়লেখা উপজেলা প্রাকৃতিক কারণে পাহাড়-টিলায় ঘেরা। সেখানে আজিমগঞ্জ নামক স্থানে গড়ে উঠেছে অতি মূল্যবান আগর ও আতর শিল্প। বড়লেখা অঞ্চলে প্রচুর আগরের গাছ জন্মে যা মৌলভীবাজার জেলার অন্যত্র পরিলক্ষিত হয় না। আগরশিল্পীরা আগরের গাছে লোহা জাতীয় পেরেক ঢুকিয়ে রাখে। অনেক দিন পর সেখানে আগরের মূল উপাদান জমা হয়। শিল্পীরা গাছ কেটে বড় বড় হাঁড়ির মধ্যে তা জ্বাল দিয়ে আতর তৈরি করেন। এই আতর দিল্লি, বোম্বে ও মধ্যপ্রাচ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রপ্তানি করা হয়।

আগর গাছ পাহাড়-পর্বত ও সমতল ভূমিতে জন্মে এবং চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ হয়। এ গাছের ডালপালা বাঁকা ও কোঁকড়ানো। আগর গাছের পাতা তিন থেকে চার ইঞ্চি লম্বা, এক থেকে সোয়া ইঞ্চি চওড়া এবং গাছের বাকলের উপরিভাগের রঙ অনেকটা হলদে সাদাটে ও মসৃণ। আগর গাছের বয়স ও আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে কাণ্ড, বড়ো ও মাঝারি আকারের ডালপালার সংযোগ স্থানের যে অংশ গাঢ় কালো, হালকা কালো, তামাটে বা ঈষৎ তামাটে রঙ ধারণ করে সে অংশে গাছের সমস্ত আগর সুরভি সঞ্চিত হয়। অবশিষ্ট অংশগুলো নরম ও ঈষৎ হলদে তামাটে। এবং ওজনেও হালকা।

সিলেটে আগর-আতর প্রস্তুত প্রণালি নিম্নরূপ।

কাঠের দেড় ফুট লম্বা হাতলযুক্ত আধা ইঞ্চি মাপের অর্ধ গোলাকার এক প্রকার কাটারির সাহায্যে প্রথমে শুকনো আগর কাঠ থেকে অত্যন্ত পাতলা করে চেছে চেছে চূর্ণ বের করা হয়। তারপর একটি বিশেষ ধরনের সঞ্চিত বাষ্প নিরোধক ঢাকনিযুক্ত পাত্রে

www.pathagar.com

আগরচূর্ণগুলো একটি নির্দিষ্ট সময় পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। অতঃপর যথা সময়ে ঐ পাত্রটির সাথে একটি বকযন্ত্রের নলের এক প্রান্ত সংযুক্ত করে দিয়ে পাত্রটি আগুনে সিদ্ধ করা হয়। পাত্রের আগরচূর্ণ সিদ্ধ বাষ্প বকযন্ত্রের নল দিয়ে নির্গত হওয়ার কালে ঠাণ্ডা পানির প্রভাবে ফোঁটা ফোঁটা আতর হয়ে নলের অপর প্রান্তে রক্ষিত বোতলে জমা হয়। আতর বের হওয়া শেষ হলে পাত্রের আগরচূর্ণগুলো রোদে শুকিয়ে নেয়া হয়। তখন চূর্ণগুলো আগর নামে খ্যাত হয় এবং তা সুগন্ধির জন্য গৃহে জ্বালানোর উপযোগী হয়। তা দিয়ে ধূপকাঠিও প্রস্তুত করা হয়।[৩]

তথ্যনির্দেশ

১. আব্দুল মালেক, পৃথিমপাশা, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ১৫ আগস্ট ২০১১
২. হাম্মুম তনু বাবু, কমলগঞ্জ
৩. জয়ন্ত পাল, কাঠালতলী, বড়লেখা, মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ২০ জানুয়ারি ২০১২

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

গ্রামীণ স্থাপত্য পরিকল্পনা, নির্মাণ উপকরণ ও অবস্থানের দিক থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এলাকার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণের সম্ভাব্যতার আলোকে অভিজ্ঞতা দিয়ে স্থানীয় নির্মাণকর্মীরা বাড়ির লোক ও প্রতিবেশীদের সহায়তায় বাড়িঘর নির্মাণ করতেন। নাগরিক স্থাপত্যের মতোই গ্রামীণ স্থাপত্যও সদা পরিবর্তনশীল, তবে অনেক এলাকার মানুষ এখনও তার ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। গ্রামাঞ্চলের বসতবাড়ি নির্মাণে মূলত বাঁশ, বেত, ছন, নাড়ার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

ঝড়-তুফান ও অতিবৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণের কৌশল ছিল চৌচালা ঘর। সাধারণ কৃষকদের এক বা একাধিক ঘর থাকত। সম্পন্ন পরিবারের বহির্বাড়িতে টং ঘর ছিল, জমিদারের ছিল কাছারি ঘর। বড় কৃষকের বাইরের ঘরের পাশে ঢেঁকি বসানো থাকত। বড় বা মাঝারি কৃষকের ঘরের মধ্যে ধান রাখার জন্য বাঁশ দিয়ে ভাড়াল তৈরি করা হয় যাকে বলে উগার। পূর্ব দিকের ঘরে গরু রাখার জায়গা অর্থাৎ গোয়ালঘর। সাধারণ কৃষকের এক ঘরে থাকত গরু ও তার পাশে ঢেঁকি। ধানের বিচি রাখার জন্য ধানের খড়কে বিশেষভাবে বেত দ্বারা বেঁধে মচা তৈরি করে রাখা হতো। উগারে ধান তোলা সমাপ্ত হলে সাত দিন সেখান থেকে ধান নামানো যাবে না। সাধারণ কৃষকের ঘর ছিল নাড়ার ছাউনি ও বাঁশের তর্জার বেড়া। ধনী কৃষকের ঘরের ছানি ছিল ছনের ও বেড়া থাকত ইকড়ের। অতি দরিদ্রদের ঘর ছিল দু'চালিয়া।

পাহাড়ি এলাকায় কখনো নীচু হাওর অঞ্চলে লম্বা খুঁটির উপর উঁচু করে বাড়িঘর নির্মিত হয়। অনেক বড় বাড়িতে পিছনের দিকে একটি পুকুর থাকে। বাড়িগুলির চারদিকে গাছপালা রোপণ করা হয়। ছায়াদানের সঙ্গে এগুলি ফল ও কাঠের চাহিদা পূরণ করে।

মণিপুরীদের ঘর বেশির ভাগ আই প্যাটার্নের। ঘরের সামনের দু'হাত জায়গা সম্পূর্ণ খালি থাকত, ঘরের মধ্যে একটি দরজা। কৃষক পরিবারের রান্নাঘরের পেছনের অংশকে বলা হতো আছিয়াল। এর পেছনে মহিলাদের প্রস্রাব-পায়খানার জায়গা থাকত। পুরুষের পায়খানা থাকত অপেক্ষাকৃত দূরে, বিশেষত বাঁশঝাড়ের ভিতরে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা কোনো ঘর তৈরি করলে দু'অংশের মধ্যে প্রায় দুই-দেড় হাত জায়গা ফাঁকা রাখা হয়। সেটাকে বুকদণ্ড বলা হয়। ধারণা ছিল এই জায়গা দিয়ে সকালে সূর্যদেবতা পূর্ব দিকে যাতায়াত করেন। সন্ধ্যেবেলা এই জায়গায় কেউ দাঁড়াতে পারবেন না। বেশির ভাগ বাড়ির ঘরের সম্মুখ ভাগ পূর্বমুখী থাকে। পুকুর থাকে পূর্ব দিকে। চারাবাড়িও পূর্ব দিকে অবস্থিত। বাড়ির ভিটে বা পাশের জায়গাকে বরণ্ডি বলে।

www.pathagar.com

প্রত্যেকের মূল বাড়ির চারদিকে একটা খাল কেটে সীমানা করা হতো, যার নাম ছিল কুটের খাল।

খাসিয়ারা কাঠ বা বাঁশের মঞ্চের উপর বারান্দাসহ কুঁড়েঘর তৈরি করে। বারান্দা বৈঠকঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বসতঘরের সাথে রান্নাঘর এবং কাছেই থাকে শূকরের খোঁয়াড়। তারা বাঙালিদের মতো করেও গৃহ নির্মাণ করে থাকে।

গারোদের ঘর মাচার উপরে নির্মিত। বহু কোঠা বিশিষ্ট ঘরগুলি মহিষ ও হরিণের শিং দ্বারা সুসজ্জিত। তাদের গোয়ালঘর ও গোলাঘর আলাদা থাকে। গ্রামের কেন্দ্রস্থলে নাকপান্থে নামক বাড়িতে যুবকরা বাস করে। এই বাড়িতে আমোদ-প্রমোদের জন্য তারা একটি কারুকার্যময় ঘর তৈরি করে, যেখানে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ।

বর্তমানে ঘরের ছাউনি হিসেবে টিন ব্যবহৃত হচ্ছে। বিত্তবানদের বাড়িঘর পাকা। ল্যাট্রিন সেনিটেশন ব্যবস্থা বসতবাড়িতে এখন আগের চেয়ে বাড়ছে। পুকুরের পানি খাবার পানি হিসেবে ব্যবহার হয় না বললেই চলে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজনের বাড়িঘর প্রাচীন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত থাকলেও এগুলোতেও আধুনিকতার ছাপ রয়েছে। মণিপুরী বাড়িঘরের প্রাচীন ঢং বদলে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে পাকা বিল্ডিং গড়ে উঠছে।

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ ও লোকঅলংকার

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই এ জেলার লোকজন একই ধরনের পোশাক ব্যবহার করে আসছে। মেয়েরা সালোয়ার-কামিজ বা শাড়ি, পুরুষেরা বেশির ভাগই শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি পরিধান করেন। পূর্বে বয়োবৃদ্ধ হিন্দুরা ধুতি বা ছ-হাতি (ছ'হাত লম্বা গামছা বিশেষ) গামছা পরতেন। বিশের-ত্রিশের দশকে পুরুষ মাত্রেই ধুতি পরতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের ধুতি ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট, অনেকে তাকে কাটিয়ারা ধুতি বলত। মহিলারা বা কৃষাণীরা সাধারণত ছায়া-ব্লাউজ ছাড়াই শাড়ি-কাপড় পরতেন। সেই শাড়ি লম্বায় ছিল কম। কোথাও যাতায়াতের সময় মহিলারা অপেক্ষাকৃত ভালো শাড়ি পরতেন। অনেক পরিবারের মেয়েরা ঘাগরা বা সেমিজ পরতেন। নারী-পুরুষের মধ্যে জুতা পরার প্রচলন ছিল খুব কম।

মৌলভীবাজার জেলায় বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর বাস রয়েছে যারা পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধরে রেখেছে। তারা নিজেদের বস্ত্র মূলত নিজেরাই তৈরি করে। এজন্য প্রায় প্রতি পরিবারেই নিজস্ব তাঁত রয়েছে।

মণিপুরীদের পোশাক

মণিপুরীরা পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে অনেকটা রক্ষণশীল, নিজের ঐতিহ্য ধরে রাখতে চাইলেও তাদের ছেলে-মেয়েরা নিজস্ব গণ্ডির বাইরে গিয়ে কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনকি দেশের বাইরে গিয়ে পড়ছে। বাইরের জগতের সংস্কৃতি বা কালচার তাদের প্রভাবিত করছে। আধুনিক পোশাক-আশাক দ্বারা তারা আকৃষ্ট হচ্ছে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী তরুণীদের চলাফেরায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ছে পুরাতন ধ্যান-ধারণা। পোশাক-পরিচ্ছদ নিজেদের ভিতরেই পড়ে আছে। বর্তমানে শিক্ষিত যুবকরা আধুনিক শার্ট ও প্যান্ট ব্যবহার করছে। বাড়িতে বাঙালিদের মতো অনেকে লুঙ্গি ব্যবহার করে। বাঙালি নারীর মতো মণিপুরী তরুণীরা শাড়ি পরে। এভাবে গ্রহণ-বর্জনের ভিতর দিয়ে মণিপুরী সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে।

নিম্নে মণিপুরীদের ঐতিহ্যবাহী কয়েকটি পোশাকের বর্ণনা দেওয়া হলো।

চাকচাকি : এটি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক। এটি কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত থাকে। এই পোশাক বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে পরা হয়।

রাহিং : এই পোশাক সাধারণত বাড়িতে পরা হয়ে থাকে। সন্তান জন্মদানের পর মাকে এই পোশাক বুকে জড়িয়ে নিয়ে পড়তে হয়।

হানাপি : ওড়না জাতীয় পোশাক।

ফেইজং : পুরুষদের ব্যবহৃত ধুতি যা সাধারণত হাট-বাজার ও উৎসব-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়।

সালহাতি : পুরুষদের পরিধেয় লম্বা একটা কাপড়।

www.pathagar.com

গামছা : মণিপুরী গামছা বলে গামছার আলাদা খ্যাতি আছে। বাড়িতে সবাই গামছা পরে।

পাগড়ি : কীর্তন, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে ধর্মীয় পুরুষেরা গীত বা কীর্তনের সময় মাথায় পাগড়ি পরে থাকে। গান-নৃত্যে এ পাগড়ি ব্যবহার হয়।[১]

ধর্মগত কারণে পাঙ্গন মণিপুরীরা আনুষ্ঠানিক দিক থেকে আলাদা এবং প্রাচীন নীতির পোশাক-আশাকে মিল রয়েছে।

কোমিন : বিবাহ অনুষ্ঠানে বিবাহের কন্যা কোমিন পরে। কোমিন গোলাকার, কোমর থেকে পা পর্যন্ত পরে।

লাইথেং : মাথার পাগড়ি।

বয়স্ক মহিলারা সেলাই ছাড়া পাঁচটি কাপড় পরে।

ফানেক : নিচের অংশের পোশাক, যা লুঙ্গির মতো প্যাঁচ দিয়ে পরতে হয়। সাধারণত ঘরে বা বাজারে যাওয়ার সময় ফানেক ব্যবহার করা হয়। এ পোশাকে তেমন নকশা থাকে না।

ফুরিত : সাধারণ ব্লাউজের মতো, তবে একটু লম্বা হয় যাতে ফানেকের নীচে গুঁজে রাখা যায়।

কোয়ায়পি : কোমরের উপরে চার হাত পরিমাণ কাপড়।

খুদাই : তাঁতে বোনা চেক কাপড়ের চওড়া গামছা।

ছায়া : কাপড়ের নিচে পরা হয়।

উল্লিখিত পাঁচখানা কাপড় তারা এক সাথে গায়ে পরিয়ে রাখেন। সেলাই ছাড়া এই কাপড় পরার ক্ষেত্রে একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি কাজ করে। যা তাদের মৃত্যুচিন্তাকে স্পর্শ করে। মানুষ মৃত্যুবরণ করলে মুসলমানদের সেলাই ছাড়া কাপড় দেওয়া হয়।[২]

গারোদের পোশাক

অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর মতো গারোদের জীবন-যাত্রায় ঐতিহ্য বিদ্যমান। তারা নিম্নাংশে লুঙ্গির মতো ঘাগরা জাতীয় পোশাক পরে। উপরের অংশে ব্লাউজ বা চাদর ব্যবহার করে। পুরুষ ও নারী উভয়ে পাগড়ি ব্যবহার করে।[৩]

গারো টিলায় নিজস্ব পোশাকে গারো নারী

www.pathagar.com

অন্যান্য

সাঁওতালদের পোশাক-পরিচ্ছদ সাদাসিধা ধরনের। মেয়েরা খাটো-মোটা রং-বেরঙের শাড়ি পরে, পুরুষরা পরে ধুতি বা গামছা। স্বচ্ছল শিক্ষিতদের আধুনিক পোশাক পরতে দেখা যায়। খাসিয়াদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হলো শিরে চূড় বাঁধা পাগড়ি পরিধান করা।

খাসিয়া পরিবার

লোকঅলংকার

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে নানাবিধ কারণে অলংকার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নান্দনিকতা ছাড়াও সঞ্চয়, মর্যাদা বা বৈবাহিক অবস্থার চিহ্ন হিসেবে মহিলা-পুরুষ উভয়েই অলংকার ব্যবহার করে থাকে। সাধারণত সোনা, রূপা, তামা, পিতল, দামি পাথর প্রভৃতি দ্বারা অলংকার তৈরি করা হয়। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে পোড়ামাটি, কাঠ, পলা, শঙ্খ, হাড়, হাতির দাঁত, বিচি, লোহা, প্লাস্টিক, ইমিটেশন ইত্যাদি দ্বারা তৈরি অলংকার বর্তমানে প্রচলিত। অতীতের চেয়ে তুলনামূলক কম হলেও মহিলাদের মধ্যে গলার হার বা নেকলেস, লকেট, কবচ, দুল, কানপাশা, ঝুমকামারী, নোলক, ব্রোচ, বাজুবন্ধ, বালা, কঙ্কন, চুড়ি, বাওটি, আংটি, বিছা, ছড়, মল, চুলের কাঁটা, সিঁথিপাটি ইত্যাদি পরার প্রবণতা এখনও রয়েছে। তবে সামর্থ্য অনুযায়ী সোনার পরিবর্তে কাঁচের চুড়ি, রূপার গহনাই অধিক ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে সোনার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং নিরাপত্তাহীনতার কারণে ইমিটেশনের তৈরি অলংকার বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে।

আদিবাসীদের অলংকারে বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য। ঐতিহ্যবাহী ওজনদার অলংকার এবং কবচ বা মাদুলি ও তাবিজ আধুনিক রূপ নিয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। আদিবাসীরা সাধারণত রূপা, ধাতু, হাড়, বিচি বা লোহার তৈরি হার, বালা, তাগা, কবচ, হাঁসুলি, মাকড়ি, মল, খাড়ু প্রভৃতি অলংকার ব্যবহার করে থাকে। গারো রমণীরা পাখির পালক

www.pathagar.com

খচিত মুকুট ব্যবহার করে। সাঁওতাল নারীরা চুলে ফুল গোঁজে এবং বিচিত্র অলংকারে নিজেদের সাজিয়ে তোলে।

খাসিয়া কিশোরীবৃন্দ

তথ্যনির্দেশ

১. সঞ্জু সিংহ, ঘোড়ামারা, আদমপুর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ৭ জুলাই ২০১১
২. সম্ভব আলী, সিতারা বেগম ও নাসরিন বেগম, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ৭ জুলাই ২০১১
৩. রণিজিৎ মান্দ্রব, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ১৫ আগস্ট ২০১১

www.pathagar.com

লোকসংগীত ও গাথা

ক. লোকসংগীত

গ্রামীণ সাধারণ মানুষের মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত লোকসংগীতে জীবনের আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সরল চিত্র ফুটে ওঠে। এর কোমল সুর হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

১. বারোমাসি

বারোমাসি মূলত নারীমনের ঋতু বা মাসভেদে চাওয়া-পাওয়া ও আকাঙ্ক্ষার মনোজাগতিক প্রতিফলন। বিশেষত না পাওয়ার মনোবেদনারই অভিব্যক্তি। কুলাউড়া অঞ্চলে গ্রামীণ বয়স্ক মহিলারা এখনো মাঝে মধ্যে বারোমাসি বলে যান। অনেকের ধারণা বারোমাসি বললে মেঘ হয়। সন্ধ্যেবেলা কয়েকজন মহিলা বসে অবসর সময়ে বারোমাসি বলে থাকেন। অনেকটা পুথির সুরে বা পাঁচালির সুরে বারোমাসি গান করা হয়। সেখানে কোনো বাদ্যযন্ত্র লাগে না বা দরাজ গলায় গান গাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বারোমাসি গায়ক একাই বলে থাকেন। শ্রোতা না থাকলে গায়িকা নিজেই পরিবেশন করেন। গানের মধ্যে হাতে তালিরও প্রয়োজন পড়ে না। শ্রোতারা দুঃখের-কষ্টের কথা তন্ময় হয়ে শুনে থাকেন।[১]

রাধার বারোমাসি

কান্দে রাধা চন্দ্রমুখী দিবস রজনি
শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া গেলা রাধা অভাগিনী।
বৈশাখ মাসেতে রাধা একাকিনী হইয়া
দিবানিশি বুকে আংকি [১] শ্রীকৃষ্ণের লাগিয়া।
জ্যৈষ্ঠ না মাসেত রাধায় বিরহিনী হইয়া
শীতল চন্দন রাধা অঙ্গেতে মাখিয়া।
আষাঢ়ও মাসেতে রাধার মনে বড় আশা
মনে লয় আসিবা কৃষ্ণ রথযাত্রী হইয়া।
শ্রাবণও মাসেতে উদয় আইলা দেশে
মধুর ও সুরেতে রাধায় উধবেরে [২] জিজ্ঞাসে।
কও কও উদবরে মধুরসবাসি
কুশলে নি আছইন আমার কৃষ্ণ গুণমণি।
ভাদ্র না মাসেতে কৃষ্ণ গোয়ালের বাখানে[৩]
ভাণ্ড ভাঙ্গি লনী[৪] খাইলা যশোদা নন্দনে।
আশ্বিনও মাসেত কৃষ্ণে মধু করে পান

www.pathagar.com

সধবা থাকিতে রাধা বিধবার সমান।
অগ্রহায়ণ গহিয়া যায় পৌষের তিন দিন
অন্তরে জানিলা রাধার না আসিবার চিন[৫]।
মাঘ না মাসেতে রাধা নিদ্রায়ও আসিবে
রাধা ছাড়ি ঠাকুর কৃষ্ণ রইলা কোন দেশ।
ফাল্গুনও মাসেতে আইল শিব চতুর্দশী
গঙ্গাস্নান করিতে যাইন কাশি বারাণসী।
চৈত্র না মাসেতে আইল ডোল পূর্ণমাসী
আসুকা রাধার মাধব ছিটাইমু আবির।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ব্যথা অনুভব, ২. সম্ভবত, ৩. গরু রাখার জায়গা, ৪. ননী, ৫. চিহ্ন।

লীলাইর বারোমাসি

প্রথম যুবতী লীলাই অগ্রহায়ণ মাস
ভাটি দিলা লিলাইর সাধুয়ে দুরইর[১] পরবাস।
ধনেরও কাঙালি সাধু ধনে দিছইন মন
যুবতী লিলাইর ঘরে থইয়া বিদেশে গমন।
আইলো তো পৌষ না মাসের দিনে পুষ্প অন্ধকার
তোমারে খাউকা[২] লিলাই শুকুন ও শৃগাল।
খাউকা খাউকা ওরে সাধু হৃদয়ে বসিয়া
তবুত না যাইমু ছাড়ি অন্য পুরুষ লইয়া।
আইলো তো মাঘ না মাস শীতের বড় ডর[৩]
বিছানা বিছায় গো লিলাই হিংগুল মন্দির ঘর।
বিছানা বিছাইয়া লিলাই জুড়িল কান্দন
কোন দেবে[৪] হরিয়া নিল বিছানা সুন্দর।
সোনার চরা[৫] হিলায় লিলাইর সর্বগাও
আইলো তো চইত[৬] না মাস কিরানে[৭] সিচে বীজ।
আনবো কটরা ভরি খাই গরল বিষ
গরল বিষও খাইয়া লিলাই ডাকে বাপ ও ভাই
আর নি দিতায় বিয়া ভিনপুরুষের টাইন[৮]।
আইলো তো বৈশাখ মাসও ভূমিতে নালিতা
সব সখি খায় নালিতা লিলাইর পক্ষে তিতা।
নালিতা শাখও রান্দিয়া লিলাই সম্বুরিল থালি
আপন সাধু বাড়িত আইলে পরশিমু আমি।
আইলো তো জ্যৈষ্ঠ না মাসও গাছে পাকনা[৯] আম
তোমারে মারিমু লিলাই কাসেশ্বরি বাণ।
মারিবায় মারিবায় সাধু ভাসাইবায় সাগরে

www.pathagar.com

আপন সাধুয়ে পাইলে মোরে তুলিয়া লইবা কুলে।
আইলো আষাঢ় মাসেতে গাঙ্গে নয়া পানি
তুমি আমি চল লিলাই খেলমু বাইছালি[১০]।
তোমার নায়ে তুমি রে সাধু আমার নায়ে আমি
আমার সাধু বাড়িতে আইলে খেলিমু বাইছালি।
আইলো তো শ্রাবণও মাসে আউস ধানের পারা[১১]
ভাদুয়া কুড়ার[১২] ডাকে শরীর কইরলো কালা।
শরীর কইরলো কালা রে সাধু পাঞ্জর কইরলো শেষ
মনোলয় কুড়ার ডাকে ছাড়িয়া যাইতাম দেশ।
আইলে ভাদ্র না মাস গাছে পাকনা তাল
নারী হইয়া লাখের যৌবন রাখতাম কত কাল।
কেউ চায় রে আইতে যাইতে কেউ চায় রে বইয়া
আর কত কাল রাখবো যৌবন লোকের বৈরী হইয়া।
আইলো তো আশ্বিন মাস নব দুর্গা পূজা
কেউই দেয় মৎস্যমেড়া কেউ দেয় কুমড়া।
জলও ভূজস্তি কন্যা মাগিয়া ল তর বর
তরও সাধু বাড়িত আইলে দিবে লক্ষ ছাগল।
আইলো তো কার্তিকও মাস গাছে গুয়া[১৩] লালি
চাইয়া দেখো সাধু আরা[১৪] কাধে দিয়া ছাতি।
আইসো আইসো ওরে সাধু বইস রে চাপাইয়া
ঘরে আছইন বৃদ্ধা মা-বাপ জিজ্ঞাস কর গিয়া।
কি কর গো বৃদ্ধা মা-বাপ কি কর বসিয়া
কার টানিরও[১৫] পানও লইয়া কার টাইন দিছলায় বিয়া।
এক হস্তে পানের ঝারি আরেক হস্তে চুন
আলিয়া ঢলিয়া লিলাই জামাই চিন্তে গেল।
চিনিলাম চিনিলাম লিলাই এই জামাই তর
মাথার কেশও দুভাগ করে নমস্কারও কর।
বারো মাসের তেরো ফল লও রে গণিয়া
সেই গীত রচিয়া গেছইন শ্রীধরও বাণিয়া।
শ্রীধরও বাণিয়া নায়রে ধরম তার বাপ
সেবা শুনে যে বা গায় খণ্ডে তারও পাপ।[২]

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. দূরের, ২. খাবে, ৩. ভয়, ৪. দেবতা, ৫. গলার হার, ৬. চৈত্র, ৭. কৃষক, ৮. পুরুষের কাছে, ৯. পাকা, ১০. জলক্রীড়া, ১১. ধান কাটার পর ধানের মুঠো একত্রে রাখার পর যখন পাহাড়-সদৃশ দেখায়, ১২. কুড়া পাখি, ১৩. গাছের কচি সুপারি, ১৪. আসতেছেন, ১৫. কার কাছ থেকে।

www.pathagar.com

মনের বারোমাসি

এসো বন্ধু এসো তাড়াতাড়ি
ইতিমধ্যে না আসিলে গলায় দিব দড়ি।
বৈশাখ মাসেতে বন্ধু রে ফুটে নানান ফুল
ভ্রমরা খায় মধু গুণগুণ সুরে।
প্রাণবন্ধু আইলা রে দেশে
আমারও ফুলের মধু শুকাইয়া যায়
আগুন লাগইছ না আমার গায়।
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে মিষ্টি ফল গাছে পাকনা আম
আম পাকে, কাঁঠাল পাকে আর পাকে জাম
দেশের বন্ধু নাইরে দেশে কারে খাওয়াইতাম।
আমারও ওই ফুলের মধু ফুলে শুকাইয়া যায়
আগুন জ্বালাইছ না আমার গায়।
আষাঢ়ও মাসেতে বৃষ্টি ঘন ঘন
ঘোর অন্ধকার হয় বিজলী গর্জন
বিজলী গর্জন যখন হয়, কখন হয় মরণ
বন্ধু আমার কাছে থাকলে মরণরে কি করতাম ভয়।
শ্রাবণ মাসেতে পানি বাড়ে সাগরেতে
খাল বিল নদীনালা ভরে জোয়ারেতে
কত মাঝি ভাসায় ডিঙ্গা নয়া পানিতে
আমারও ঘাটের ডিঙ্গা ঘাটেতে রয়
আগুন জ্বালাইছ না আমার গায়।
ভাদ্র মাসেতে গাছে পাকা তাল
বন্ধু নাই মোর দেশেতে কারে খাওয়াইতাম
তালের পিঠা বানাইয়া মরি আমি হায় রে হায়
আগুন জ্বালাইছ না আমার গায়।
আশ্বিন-কার্তিক দুই মাসেতে বর্ষা যায় চলিয়া
অগ্রহায়ণ মাসেতে খেতে উল্লাস পাইয়া
মাঠে ধান কাটে চাষি কাচি হাতে লইয়া
নয়া ধানে নবারণ্য খায় সাথে লইয়া
আমার খেতের ধান টিয়ায় কাটিয়া লইয়া যায়
আগুন জ্বালাইছ না আমার গায়।
পৌষ-মাঘ দুই মাস শীতের বড় জ্বালা
আয় রে বন্ধু বিদেশ থাকিয়া ঘটাইলে যন্ত্রণা
কারে কইতাম মনের কথা কলিজা ফাটিয়া যায়
আগুন জ্বালাইছ না আমার গায়।
ফাল্গুন মাসেতে কোকিল ডাকে ডালে

www.pathagar.com

যে নারীর সোয়ামি নাই সদাই কপাল পুড়ে
একে একে সব মাস গেল চৈত্র মাসের খবর নাই
তুই বন্ধু নিষ্ঠুর অইয়া রহিলে বিদেশ, আমি কাছে নাই
দেশে আসিয়া একবার আমায় নিয়া যাও
আগুন জ্বালাইছ না আমার গায়।[৩]

ষষ্ঠীবর দত্তের স্ত্রী চন্দ্রাবতী রচিত দুর্গার বারোমাসি গান

উমা বলে মেনকারে হিমালয় পাটে
দুঃখের কথা কি কহিমু, কৈতে বুক ফাটে।
বৈশাখ মাসেতে মাগো দেওয়ার ডাকে জোরে
কার্তিক গণাই কোলে আমার, দেহা কাঁপে ডরে।
জ্যৈষ্ঠ না মাসেতে মাগো ঝড় তুফান ভারি
লতাপাতার হাওয়া ঘওে, রইতে নাহি পারি।
আষাঢ় মাসেতে ঘরে পড়ে বৃষ্টির পানি
দুই ছাওয়ালের মাতা, আমার অধৈর্য পরানি।
শ্রাবণ মাসেতে মাগো ভরে চারিধার
কোন পুত্র কোথায় পড়ে, নাই ঠিকানা তার।
ভদ্র না মাসেতে মাও ভরা নদীতে যাইয়া
জল আনিতে কেমনে যাই মা, শিশু কোলে লইয়া।
আশ্বিন মাসেতে মাও হরষিত দেশ
তোমার কোলে আমি, আমার দুঃখের হয় না শেষ।
কার্তিক মাসেতে মাও রোগের পরতাপ
দুইটি শিশু লইয়া আমার, প্রাণটি কাঁপে ডরে।
অগ্রহায়ণ মাসেতে মাও সকল ঘরে ধান
মোর ঘরে মা নাই যে কিছু রাখিবারে প্রাণ।
পৌষ মাসেতে মাও প্রতি ঘরে পিঠা চিড়া
সব ছাওয়াল আনন্দে নাচে, আমার কপাল পুড়া।
মাঘ না মাসেতে মাও শীতের অধৈর্য সকল
সর্ব লোকের আছে বস্ত্র, আমার যে বাকল।
ফাল্গুন মাসেতে মাও কোকিলের সাড়া
তোমার জামাই পইড়া থাকে কুচুনির পাড়া।
চৈত্র না মাসেতে মাগো নিদারুণ খরা
দুঃখের উপরে দুঃখ না যায় পাশরা।
কহে কবি চন্দ্রাবতী ষষ্ঠীবর পতি
ত্রিজগতের মাতা তুমি, তোমার কি দুর্গতি।
এই আশীর্বাদ কর মাগো যুড়ি দুই হাত
সুখেতে রাখিও মোর পুত্র সন্ধিনাথ।

www.pathagar.com

২. সারিগান/সাইর গান/হাইর গান

মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় মূলত কৃষকেরা হালচাষের সময় এবং জমিতে ধানের চারা রোপণের সময় সারিগান বা হাইর গান বা সাইর গান গেয়ে থাকেন। আউসের পর আমনের জন্য জমি তৈরির সময় কৃষকের বেশি পরিশ্রম হয়। তখন দু'একজন কৃষক সারিগান বলেন। কিন্তু জমিতে ধানের চারা রোপণের সময় অধিক লোকের প্রয়োজন হয়। সে সময় সারিগান খুব জমে ওঠে। সারিগানের ছন্দে ও সুরে-সুরে কৃষকরা মাঠে ধানের চারা রোপণ করেন। বড় বড় কৃষকরা তাদের অধিক জমিতে চারা রোপণের সময় ঘটা করে সারিগানের আয়োজন করতেন; তখন ঢোল-করতাল বাজানোর রেওয়াজ ছিল। ঢোলের তালে ও গানে কৃষকেরা ছন্দময় হয়ে ওঠেন। কিছুক্ষণ পর পর তারা তালে তালে 'ভালা হৈ- হৈ- হৈয়া' বলে ধানের চারা রোপণ করেন। এই দৃশ্য খুবই সুন্দর ও উপভোগ্য। গানের পদগুলো ছোট ও হাস্যরসে ভরা। কখনো রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বা মামি-ভাগ্নের প্রেম নিয়ে আদি রসাত্মক গান হয়। এ গানের শ্রোতার সংখ্যা কম, নিজের কাজে শক্তি যোগানোর উদ্দেশ্যেই এই গান গাওয়া। আনন্দের মাধ্যমে কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে। বর্তমানে নৌকা দৌড়ানোর সময় মাঝিরা সারিগান করে থাকেন।[৪] কয়েকটি সারিগানের নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো।

১

বালি জইবনের[১] ভরে
আধা বয়স কাটাইল বালি মাই বাপের ঘরে
বালা হৈ-হৈ-হৈয়া।
মাথায় টিকা' ফইরাই[২] বালি আয়নার বানে চায়
তবতো না দিলা বিয়া দারুণ বাপ-মায়
বালা হৈ-হৈ-হৈয়া।

২

ও বালা ফুল গাঁথ চাই তুলি
ভালা করি গাঁথিও ফুল, তছর দিমু আমি
বাকু আলীর বাগানেতে যাও রে চলিয়া
বালা বেশ -বেশ- বেশ।
ভালা ভালা গেন্দা ফুল[৩] আন রে তুলিয়া।

৩

ছাবাল ভাগিনা রে ভোমর হইয়া লাগ মামির গায়
ওরে কদুর তেলের খুশবই[৪] করে সুন্দর মামির গায়
এরে দেখি ছাবাল ভাগিনায় আত[৫] বাড়াইতো চায়
বালা বেশ -বেশ- বেশ।[৫]

৪

ও নাতিন বারই[৬] জওয়াফ দে[৭]
এত রাইত তো মন্দিরে ঢুলক বাজায় কে?

www.pathagar.com

ঢুলক বাজায় কে গো নাতিন বংশী বাজায় কে?
আরে হৈ - হৈ - হৈয়া।
আমার নন্দন চিকনকালা ঘরে আসিয়াছে।
বালা বেশ -বেশ- বেশ।

৫

সোনা দাদার বৌ গো
বরই পাড়িয়া দেও মোরে।
এগু বরই দিবায় মোরে
পিনবার[৮] শাড়ি দিমু তরে
তোমার লাল বরই[৯] এ ঝলমল করে।[৬]

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. যৌবন, ২. পরিধান করে, ৩. গাঁদা ফুল, ৪. সুঘ্রাণ, ৫. হাত, ৬. বাহির হয়ে, ৭. উত্তর দাও, ৮. পরিধানের, ৯. স্তনের বোঁটা অর্থে।

শব্দকর সমাজে প্রচলিত সাইর গান

বালিটেরী শব্দকরপাড়া থেকে রবাই শব্দকর-এর মুখ থেকে জানা একটি সাইর গান:

আরে ঝুমকা লাল সই
আদমপুরী বেপারী কন্যা
পাইল কই।
ধরমপুরী বেপারী জানে বড় সন্ধি
রাস্তাঘাটে ফান পাতাইয়া
পুরুষ করছে বন্দি
বালা বেশ বেশ বেশ।
পুরুষেরও তলে তলে
খাইলে বাটার পান।
রাস্তাঘাটে কইলা খালি
সোনা বন্ধু পাগল করল
নয়নেরই বাণ মারিল
আমার মন চুরি করিল।
মাইয়ায় কি গুণ জানে
লাগাইয়া প্রেমের ছুরি
আগলা থাকি দেখে
ও মাইয়া কি গুণ জানে
বালা বেশ বেশ বেশ।[৭]

সতীশ শব্দকরের কাছ থেকে একটি গান সংগ্রহ করা হয়। গ্রামে উঠোনে বসে অনেক নারী-পুরুষের উপস্থিতে এই গান তিনি বলেন। এই গান কৃষিজীবী মানুষ মাঠের ক্ষেতের ধান রোপণ যথাসময়ে শেষ করার জন্য মাঠে বেশি সংখ্যক লোকের সাহায্য কামনা করে নিয়ে আসে। তখন গানে গানে দল বেঁধে দ্রুত ধান রোপণের কাজ শেষ হয়। এ সময়ে একজন ঢোলবাদকও থাকেন। প্রচণ্ড গতির ভেতর দিয়ে বিপুল পরিমাণ

www.pathagar.com

মাঠে জমি রোপণ হয়ে যায়। এই কাজে মহিলা-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। কমলগঞ্জে শব্দকর সমাজের নারীরা সাইর গানে অংশগ্রহণ করেন। পুরুষও থাকেন। গানগুলো রসাত্মক থাকে। গান কিভাবে রচিত হয় সেটা তারা জানে না। মুখে মুখে স্থানিক পরিবেশে গান বদল হয়েছে।

ও সুন্দর ভাগিনা রে–
তোর মামা বাড়িত নায়
গাই কিরাইয়া দে।
গাই তো কিরাইতাম গো মামি
আমার দিবায় কি?
গরম ভাতে ডালিয়া দিমু
ফাল্গুন মাইয়া ঘি।
সুন্দর ভাগিনা রে–
তোর মামা বাড়িত নায়
গাই কিরাইয়া দে।
গাই যে কিরাইতাম গো মামি
তোমার গলায় কি?
তোমার মামায় সুন্দর দেখতা
নেকলেছ লাগাইছি।
সুন্দর ভাগিনা রে–
গাই যে কিরাইতাম গো মামি
তোমার বুকের মাঝে কি?
তোমার মামায় খেইড় খালাইতা
লাটম লাগাইছি।
ও সুন্দর ভাগিনা রে–
তোর মামা বাড়িত নায়
গাই কিরাইয়া দে।
গাই যে কিরাইতাম গো মামি
তোমার বগলের তলে কি?
তোমার মামায় চাল ছাইতা
ছন ফলাইছি।

এই গানে যৌন ইঙ্গিত রয়েছে কিন্তু গ্রামীণ নিরক্ষর মানুষের ছড়ায় যে প্রতীক ব্যঞ্জনা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে ছড়াটি হয়ে ওঠেছে আকর্ষণীয়। এখানে লাটম, ছন, ঘি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের ভেতর দিয়ে অশ্লীলতায় ছাউনি দেওয়া হয়েছে।

বড়াই সারি গান

১

ও নাতিন বারইয়া[১] জোয়াপ[২] দে
এ রাইতে তোর মন্দিরে ঢোলক বাজায় কে

www.pathagar.com

ঢোলক যে বাজায় গো নাতিন
তবলা বাজায় কে
মুন্সিবাড়ির ডাক্তারবাবু ঘরে হামাইছে।
বড়াই বলে ওগো নাতিন
বড়াই বলে ওগো নাতিন
ধর্মে কেউকা
কালার সঙ্গে পিরিত করি
কেমনে সুখে আছো।
যেমনই আছ গো নাতিন
তেমনি তুমি পাইছো
এরূপ যৌবন দিয়া
শ্যাম সোহাগী অইছ।
কানাকানি, গোনাগুণি
যত কথা শুনি
সকল কথার শেষে কেবল
রাধা কলংকিনী।
করছি ভালা সুখের পিরিত
কেউ নি কইতে পারে
পাওে না যে না কান্দিও
এই সে ভাব মানে।
পান খায় স্বাদে স্বাদে
কথা কয় গো রসে।

২

এদেশের মাইনষে[৩] কেবল
দাও[৪] বান্দিয়া মাতে[৫]।
আরশি পরশি যত ছিল
তারা থাকে চাইয়া।
আর তাদের মুখে পান সুপারি
আমার কথা কইবা।
তুমি জানি গো দাদাই
আমি ইতা[৬] জানি।
আর একটা কথার ছিদ্র পাইলে
আরিপরি[৭] ডাকে।
ঘরের লাগি পরে আমি
খাইছি কত গালি।
শাশুড়ি ননদী দেখছি
দুই চোখের বালি।

www.pathagar.com

করতাল বাজাইয়া বুড়ি
ফিরে ঘরে ঘরে।
আর জমে নেয় না
কটনা বুড়ি[৮]।
নইয়া নইয়া যায় গো বুড়ি
লাটি ভর দিয়া।
তেড়া কমর সোজা কর
দুই ছাইর বাড়ি দিয়া।
তুমি জান গো দাদাই
আমি ইহা জানি।
আর একই কথার ছিদ্র পাইলে
আর বুড়ি ডাকে।
ছিকা বুড়ি, কাটিয়া বুড়ি
দুয়ারে দিল বলি।
আর বুড়ির কান্দ পাড়া
যায়গি কানা-কানি।
ছোট বধূ বড় বধূ মাইজম বধূ থইয়া
বছর বিয়ানী[৯] বধূ আমার চেয়ে নিছি বাছিয়া।
ডাবা নিল, ডিবি নিল, ভাতের নিল ঢউর[১০]
নগদ নিল চৌদ্দ টেকা আর নিল বউ।
আমার বউয়ে খানছা[১১] শরীর কান কিতা খাইয়া
আরি পরি মরডা যেন আংরা কছালিয়া[১২]।
বাড়ির গিরছ ধারিত তইয়া
গিয়াছিলাম জলে
মনের মতো রসিক পাইলে বিদায় করি কলে।
পিরিতেরও বন্ধ যখন গেছে আমার বাড়ি
আমার লাগি কত নিছে লুচি আর পুরি[১৩]
অবশেষে খাওয়াই গেছে পানের এই যে ।
এতে খনে পড়ে পুরান কালির কথা
শ্যাম কিশোর ঘোষ এ বহল...
এক পুরে শ্যাম নগরে বাকি রাখছে কারে
পাইতাম যদি শ্যাম চান্দারে দিতাম দুইটি বাড়ি।[৮]

৩

পারিয়া[১৪] বান্দা গো বালি
উল্টাইয়া পাল্টাইয়া
ওরে তমাল গাছ কাটিয়া রে
চুলায় দিলাম জ্বাল।

www.pathagar.com

ঝরা উদলাইয়া[১৫] দেখ
পারিয়ায় লইছে ফাল[১৬]।
পারিয়া বান্ধ গো বালি
উল্টাইয়া পাল্টাইয়া।

৪

বালি[১৭] কি চাও কি চাও
আমি তোমার বন্ধু নায় গো
ফিরিয়া ঘরে যাও।
বালা বেশ বেশ---
লাল শাড়ি পিন্দিয়া বালিয়ে
আয়নার বানে চায়
তবে কিনা দিলা বিয়া
দারুণ মাই বাপে।
বালি কি চাও কি চাও
বালা বেশ বেশ।[৯]

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বের হয়ে, ২.জবাব, ৩. মানুষে, ৪. সুবিধাজনক অবস্থান থেকে, ৫. কথা বলে, ৬. ইহা, ৭. প্রতিবেশী, ৮. অতি বৃদ্ধা মহিলা, যিনি এ ঘরের কথা ও ঘরে গিয়ে বলেন, ৯. বছরে বছরে যে মহিলা সন্তান প্রসব করে, ১০. ভাতের বউল, ১১. কাঁচা বয়সী, ১২. আস্তে আস্তে, ১৩. পুলি পিঠা, ১৪. তেলাল দেশি গাছ, ১৫. বাসনের সরা সরিয়ে দেখা, ১৬. লাফ, ১৭. যৌবনে উন্মুক্ত বালিকা।

৩ . হুরি বা ফাগুয়া বা দোল-এর গান বা বসন্তের গান

হিন্দু সমাজে দোল-এর গান খুবই জনপ্রিয়। মূলত এগুলো প্রেমের গান। রাধা কৃষ্ণের প্রেমের সূত্র ধরে মানবিক প্রেমের কাছে বাঁধা পড়েন গায়করা। মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসন্তের প্রথম দিন থেকে এসব গাওয়া হয়। দোল পূর্ণিমার দিন পারস্পরিক আবির দেওয়া ও রং ছিটানোর প্রথা রয়েছে। তবে রং ও আবির ছিটানোর রেওয়াজ এখন চা-বাগানে অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। এই গানের পদগুলো ছোট থাকে। বসন্তের প্রকৃতির নানা রূপ-রস-গানে ফুটে ওঠে। গায়করা কখনো বসে কখনো নেচে গান ধরেন। গানে মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শ্রোতা আনন্দে নেচে ওঠেন। গোলাকার হয়ে গায়করা গানের তালে তালে পা ফেলেন এবং দেহকে প্রক্ষেপণ মাধ্যমে গতি সঞ্চার করেন। মূল গায়ক সাধারণত ধূতি পরেন। দোল পূর্ণিমার দিন আবির ছিটানো হয়। এই হুলি গান খুবই আনন্দঘন পরিবেশে গাওয়া হয়। বিগত ১০ ফাল্গুন কুলাউড়া উপজেলার বেগমানপুর গ্রামে হুলি গান দেখতে যাই। প্রান্তিক সমাজের কয়েকজন লোক আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। হুলি বা বসন্তের গান গেয়ে তারা যেন সত্যই বসন্তকে অনুভব করেছিলেন। গ্রামীণ সমাজে বসন্ত বরণে কোনো কৃত্রিমতা দেখতে পাইনি। নারী-পুরুষ একত্রে মিলে গানে সুর মিলিয়েছে এবং

www.pathagar.com

আবির ছিটিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে। সেই জায়গা থেকে কিছু গান সংগ্রহ করেছি। নিম্নে গানের নমুনা দেওয়া গেল।

১

শুন শুন এগো সখি তমাল ফুটিল।
এ বসন্তে প্রাণকান্ত কোথায় রহিল ॥
ওরে ওরে ভ্রমরা ফুলের মধু চোরা।
শুকাইল[১] ফুলের মধু লোকাইল ভ্রমরা ॥

২

এল রে কাল বসন্ত দুরন্ত মদন।
বিরহিনী এ রমণীর প্রাণ করে উচাটন ॥
অভাগিনীর কর্মদোষে, বন্ধু রইলা দূর দেশে।
রইলাম তার আসার আশে, আইজ বুঝি হইবে মরণ ॥
কোকিলার কুহু রবে ধৈর্য নাই মনে প্রাণে।
দোইল[২] মদন বাণে বিরহিনীর এ জীবন ॥[১০]

৩

দোহাই বসন্ত রাজা, দোহাই তোমার কোকিলার।
কোকিল তরে বারণ করি ডাকিও নারে বারে বার ॥
শোন শোন ও কোকিলা আমি যে অবলা বালা।
পিরিত করিয়া ছাড়িয়া গেল নন্দের চিকন কালা ॥

৪

শোন রসরাজ বন্ধু করি নিবেদন
বলিবায় রসের কথা এই আমার আকিঞ্চন ॥
কোন রসেতে আলাপন কোন রসেতে উদ্দীপন।
কোন রসেতে এ বসন্তে রঙ্গ হুরি সমাপন ॥[১১]

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. রোদে শুকিয়ে যাওয়া, ২. দহন করা।

৪. জারিগান

মৌলভীবাজার জেলায় শিয়া মুসলিম সমাজের সবচেয়ে বড় উৎসব ১০ মহরম। ঈদের মতোই শ্রদ্ধার সাথে তা পালন করেন। শিয়া সম্প্রদায় পৃথিমপাশা সাহেব বাড়ি থেকে তাজিয়া মিছিল বের করেন। হাজার-হাজার লোক এই মিছিল দেখতে ছুটে আসেন। শিয়ারা নিজের শরীরে চাবুক মেরে রক্ত ঝরান। এই সময় তারা 'হায় হাসান' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করেন। মহিলারা ঘরের মধ্যে মাতম করেন। পুরুষরা রাতে হারিকেন জ্বালিয়ে দশ-বারোজন গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়ে মহরমের জারি করেন। একজন গায়ক শোকগাঁথাটি সুর ধরে বলতে থাকেন, অন্যরা দোহার দেন এবং নিজেদের হাত কলিজায় বা বুকে নিয়ে লাগান। সারা মহরম মাস কুলাউড়ার রবিরবাজার অঞ্চলে মহরমের 'জারি কোটা' হয়। মহরমের মাতম গান স্থানীয় কয়েক

www.pathagar.com

জারিগায়ক লিখেছেন। মহিলারা ছোট ছোট গান করে থাকেন। দুটো গান উল্লেখ করা হলো:

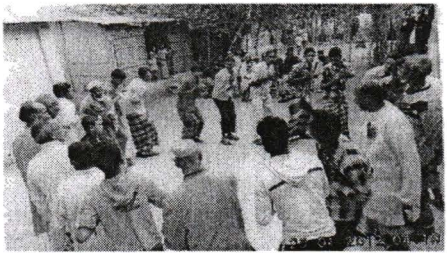

১০ মহরম উপলক্ষ্যে বুক চাপড়িয়ে জারিগানের মাতম করছেন শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা

১০ মহররম উপলক্ষ্যে কুলাউড়ার রবিরবাজারের শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা পিঠে চাবুক দিয়ে রক্ত ঝরাচ্ছেন

১

আল্লা পানি দেও রে
বেদুরুদ কাফির
কলিজা শুকাইয়া যায়
সুবে নবীর দিন।
পানি পানি করিয়া যবে
খুদাইলা ইন্দারা[১]
দারুণও ইন্দিরার পানি
এজিদে শুকায়।
আল্লা পানি দেও রে
বেদুরুদ কাফির
কলিজা শুকাইয়া যায়
সুবে নবীর দিন।
পানি পানি করি যবে
রুয়াইলা[২] কুইয়ার[৩]
দারুণও কুইয়ার পানি
এজিদে শুকায়।

২

হায় কাছিম, হায় কাছিম রণে যাইও না
রণে মাতম করইন বিবি সখিনা।
সখিনার মাথার টিকা বামে ঝলমল করে
হায় সখিনা রণে যাইতে ঝরিয়া পড়ে[৪]।[১২]

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. পানির কুয়া, ২. রোপণ করলেন, ৩. আখ, ৪. মুর্ছা যাওয়া।

www.pathagar.com

মাউগা মুরিদা কবিতার জারি

ও হে দয়াল স্মরণ করি
পয়লা তোমার নাম
নবিজির চরণে তেজি হাজার ছালাম।
ও হে মাতা পিতা জন্মদাতা ওস্তাদও সহিতে
মা বিনে কেউ নাই আপন এ জগতে।
কত শীতে-ভাতে দিনে রাইতে দুঃখ কষ্ট পাইয়া
সিয়ানা করিয়াছেন মায়ে পালিয়া পুশিয়া।
মায়ের দুধের ধার সুজিবার সাধ আছে কার
সংসার অরণ্য হয় মা নাই যে যার।
আমি কবি বলি ভাই, সকলে থাকিও হুঁশিয়ার
চরণসেবা করিও পিতা ও মাতার।
দেশ ঘুরিয়া দেশি চাইয়া যুগের এমনি ধারা
আপন মাথায় কুড়াল মারইল বহু যুবকেরা।
চলেন স্ত্রীর কথায় দুঃখ দেইন পিতা-মাতার মনে
না বুঝিয়া পরিবারে দুঃখ টানিয়া আনে।
বলি এক ঘটনা বন্ধুগণ শুনেন খেয়াল করে
সিলেটে তার বসতবাড়ি কল্পনা নগরে।
ছিল মায়া মমতা যাই বলিয়া যার জন্য এই জারি
হঠাৎ খবর পাইয়া আমি করে দিলাম সাইরী।
যখন গর্ভে ছিলো পিতা, মইল ফৌজদারি গিয়া
দায় টেকিল ময়নার মা, ময়নারে গর্ভে লইয়া।
দশ মাস দশ দিন পরে ভব সংসারে ময়না জন্ম নিল
বাছার মুখ দেখিয়া মায়ে সব দুঃখ ভুলিল।
ছেলে কুলে তুলি বাড়ি বাড়ি কাজ করিয়া খায়
এইভাবে দুঃখে কষ্টে দুঃখিনীর দিন যায়।
ময়না সিয়ানা আইল, গায়ে আইল নতুন যৌবন
চৌদিকে ছড়াইল মায়ে বিয়ারও আলাপন।
অতি আপসোস করি ময়না মিয়াকে মায় করাইলা বিয়া
আনন্দিত অইলা মায়ে ছেলের বউ দেখিয়া।
পুত্রবধূ জানে যাদু শাশুড়িকে মারতে
মায়ের দুশমন ময়নাকে বানায় আস্তে আস্তে।
হায় দুঃখিনী মার দুঃখ তবু গেল না
পুত্র আইলো ঘরে বাড়াইল যন্ত্রণা।
বধূর নাম খয়রুন, মুখে আগুন আতসিনী জাত
কেমনে মারতে শাশুড়িকে ভাবছে দিন রাত।
খায়রুন দুষ্টা নারী প্রকাশ করি সদাই হিংসা করে

www.pathagar.com

খাইতে বইতে কত কষ্ট দেয় শাশুড়িকে।
বধূর ছলচাতুরি সহ্য করি বুড়া বেটি বয়
ভবিষ্যত ভাবিয়া ছেলেরে না কিছু কয়।
বধূ কালসাপিনী মায়াবিনী ময়নারে বুঝায়
আমাদের সব ধ্বংস করবা কেবল তোমার মায়।
বেটি বালা নায়, সর্বদা ঝগড়াঝাটি করে
বেটির মনে তোমার থাকি ছড়াইতে আমারে।
তোমার মারও দায় পারতাম তোমারও ঘরে
ইতা লইয়া হিতার দরবার করইন দিনরাইত।
তোমার মারে লইয়া আগলা তুমি থাক ভাই
আমারে তালাক দেও, আমার বাপর বাড়ি যাই।
স্ত্রীর কথায় ময়না মিয়া মারল তাও
আমার স্ত্রী সাথে না করিও রাও।
নইলে বিপদ অইবে নিরাই অইয়া থাকিও বধূর সঙ্গে
জিতা দেয় অতা ইতা দিয়া মনে অইলে খাইও।
শুনিয়া পুত্রের বাণী, মায় জননী পড়িলা চিন্তায়
ছেলে তো পড়িয়াছে আমার বধূর ছলনায়।
মাকে তা বুঝায়া নিরাই অইয়া বইছন বধূর কাছে
বালা বুরা দেখলে মুখে কোনো কিছু না পুছে।
বধূ ইচ্ছা করে যাহা ময়না মিয়ারে লইয়া
দুষ্ট নারীর মিষ্টিতে ময়না মারে গেল ভুলিয়া।
দুষ্ট কালনাগিনী, কালসাপিনী থাকে গাল ফুলাইয়া
ময়না মিয়ার কাছে বলে কান্দিয়া কান্দিয়া।
তোমার মার দায় থাকতে পারতাম না তোমার ঘরে
তোমার মারে আগলা কর নইলে ছাড় মোরে।
স্ত্রীর কথা শুনিয়া এখনই ময়না মিয়ার মন
গলিয়া পড়িতে লাগল মমেরও মতন।
মারে আগলা করি পুকুরপারে ঘর বানাইয়া দিল
ভিক্ষা করি দুঃখিনী মায়ে খাইতে লাগিল।
দুঃখের সীমা নাই, ভাই রে ভাই, ময়না মিয়ার মার
পুকুরপারে মায়ে একদিন খাইলা আছাড়।
পাও মছকে গেল, ডাকতে লাগল, ময়না ময়না বলি
আয় রে বাবা ময়না, আমার সঙ্গে নেরে তুলি।
মায়ের ডাক শুনিয়া ময়না গেল আনিতে
স্ত্রীরে তার হুকুম দিল পুকুরপারে যাইতে।
খয়রুন বলে তখন, চিরজীবন যাইত না এ যন্ত্রণা
ধাক্কায় নেওয়া মালিয়া বুড়ি মরিয়াও মরে না।

www.pathagar.com

হায়রে মাই জননী চিৎকার করছইন ভূমিতে পড়িয়া
তুমি কি ছিলায় নারে ময়না অভাগীর উদরে।
বলছে কবিকারে বুঝালায় নারে ওরে ময়না ধন
সংসারে তোর মা বিনে কে আছে আপন।
শুনেন গানের সুরে–
এই সন্তান জন্ম লইতে মায়ে এত দুঃখ পায়
এক জানে ভক্তের আল্লাহ আর জানে মায়।
সন্তানের জন্ম দেখিয়া আনন্দিত মায়ের মন
ভুলিয়া যায় মাই জননী পূর্বে যত জ্বালাতন।
যদি থাকে ছেলের উপর পিতামাতার অভিশাপ
সবে বাইত সবে কদরে পাপ অইবে তার মাফ।
সারা বাতি করলে জিগির দোয়া কবুল অইবে না
মাতাপিতার চরণ সেবি খুশি রাখ বিধাতা
আব্দুর কাদির বলে মানবজীবন দিও না বে অযতা।
কিঞ্চিত মাত্র দুঃখ পাইলে সবার আগে ডাকি মাই
মায়ের মতো আপন কেও নাই।
গান শেষ অইল বলতে অইল ময়নারও কাহিনি
খবর লয় না কি সুখেতে আছে তার মাই জননী।
একদিন ময়না মিয়া রাত্র নিশায় দেখিল স্বপন
কে যে তারে মারতে আইছে জল্লাদের মতন।
ময়না বলে, কি খাতিরে আমারে মারতে চাও
জল্লাদে কয়, মারে তইয়া আগলা কেন খাও।
ময়না ভয় পাইল, কান্দিয়া কইল, আমার মারে নিয়া
এ জীবন রাখিব আমি মাথাতে তুলিয়া।
জল্লাদ চলিয়া গেলে ভাঙ্গিয়া গেল ময়নারই স্বপন
সারা রাত্রি কান্দে বসিয়া পাগলের মতন।
হায় রে মারে নিয়া রাখিয়াছি পুকুরপারে
এই অপরাধে জল্লাদ দিয়া আল্লাতালা মারে।
রাত্রি প্রভাতও অইল, ময়না গেল মায়েই হুজুরে
পায়ে ধরিয়া মায়ে নিয়া আনিল নিজের ঘরে।
বধূ ভাবে মনে মনে শাশুড়ির দায়
এই ঘরেতে বুড়ি থাকিলে আর থাকা দায়।
হায় রে যেমনে পারি বুড়িতে মারিতে হইবে
ধরা দিল তার মায়ের তরে।
একদিন খয়রুনের মা ময়নার বাড়িতে বেড়াইতে আসিল
মুরুতা জবাই করি তার মায়ে খাওয়াইল।
তারা মায়ে-ঝি যুক্তি করি রইছন দুইজন বইয়া

www.pathagar.com

আইজ রাইতে ময়নার মারে গারাইতাম মারিয়া।
এইসব বিষয় ময়না মিয়া জানা মোটেই নাই
দিন গিয়া রাত্রি আসিল শুন সবে ভাই।
এদিকে ময়নার মা শুইতে যায় খয়রুনের মাকে লইয়া
মাই শাশুড়ির বিছানা করিয়া রাখিয়াছে সাজাইয়া।
কিন্তু ময়নার মার অন্তরে কি যে আসিল
বেয়াইনকে লইয়া শুইবার জায়গায় রদবদল করিল।
রাত দুইটা অই খয়রুন গেল হাতে রশি লইয়া
অন্ধকারে তার নিজের মারে গলায় বান্দিয়া রাখে
মজবুত করি রশি।
একবারে বন্ধ অইল শ্বাস, না বুঝিয়া খয়রুন কয় পুরছে মনের আশ
আল্লাহ হকের কাজী হকের খেলা খেলে
কার মা আছে, কার মা নাই দেখিবে পরে।
ওহে বন্ধুগণ দিয়া মন হিন্দু মুসলমান
দুষ্টা নারীর কু আচরণ থাকিও সাবধান।
পূর্বের মুরব্বিরা কইছে, ময়না আহম্মক হয়
যেই পুরুষেরা স্ত্রীর কাছে মর্মকথা কয়।
নারী কালসাপিনী অর্ধাঙ্গিনী অইয়া
কত কালীর জান বিনাশ করিয়াছে কুলাউড়া।
শুনেন ভাই চলেন যাই ময়না মিয়ার বাড়ি
দেখি তার মা বিনা হড়ি।
রাত প্রভাত অইল খয়রুন গেল ঘরের ভিতর
দেখল যখন নিজের মা মারিয়া আছে কান্দিল তখন।
চিৎকার করিয়া আরিপরি দৌড়িয়া আসিল
খয়রুন কয়, ময়না মিয়া আমার মারে মরিল।
ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আইলেন ঘটনাস্থলে
গ্রামপুলিশ দিয়া তখন থানায় জানাইল।
দারোগা দ্রুত আইলে জয়নের তরে
সত্য বলিত তোমার মাগো মরছেন কি করে।
তখন দুষ্টা নারী কান্দন করি বলিছে ওসি সাহেব
আইজ কয়দিন ধরি না ভালা নায় আমার স্বামীর ভাব।
আমার মারে পেট করে কি খাওবে কিছুই বুঝি না
ঘরের দরবার শুনিয়া আইছেন আমার মা।
তারা হড়ি দামান্দ আর দিন ঝগড়া ফসাদ করে
বৈকালে ময়না মিয়া কইল আমারে।
তর মার তরে আইজ রাইত গলায় রশি দিয়া
সুরমা নদী ভাসাই দিমু শোন মন দিয়া।

www.pathagar.com

খয়রুনের এই কথায় কেইছ লিখিয়া নিল
ময়না মিয়া এরেস্ট করি কোর্টে পাঠাইল।
ময়না কান্দিল উচ্চ সুরে মা মা বলিয়া
মায়ে বলে হকে আলা আনবে বাঁচাইয়া।
গ্রামের লোক যত ছিলো আশ্চর্য অইল
কেমন করিয়া ময়না শাশুড়িরে মারিল।
কবি কাদির বলে, কি করিবে ওগো দুষ্ট নারী
যার চরণে বেহেস্ত পাইবে তারে জেলে ভরি।
কি লাভ হইবে ছাড়তে হইবে সংসার ভবন
পতীর সেবা সতী নারীর সাফল্য জীবন।
এখন ময়নার খবর ভাই– মামলা অইয়া গেল
তারিখে পর তারিখ পড়িতে লাগিল।
ময়নার মাই জননী খবর শুনি পুত্রশোকি হইয়া
হঠাৎ একদিন মারা গেল হার্টফেল করিয়া।
ময়নার পূর্বর পাপ ছিল এতদিনও পরে
ছমাস রইলা ময়না হাজতের ভিতরে।
ময়নার সাক্ষী নাই, উকিলেরা সুযোগ না পাইল
হড়ি মারা ময়না মিয়ার ফাঁসির তারিখ আইল।
এদিকে খয়রুন থানায় ঘরে তবারককে লইয়া
ময়নার ঘরে ঘুমাইতেছে আমোদে মজিয়া।
হায় রে খোদার খেলা, আজব লীলা বুজন না যায়
তিন মাসের খয়রুন ভাবে বুঝা যায়।
ময়নার ফাঁসির তারিখ অইল ঠিক সামনের মঙ্গলবার
ফাঁসি দেখতে লোকজন হইল হাজার হাজার।
ময়না কাঠগড়ায় খাড়া রয় হাকিমের সামনে
হুকুম দিলে সাহেব ভাবছে মনে মনে।
ঠিক এই সময়ে দৌড় মারি একজন আইল
খয়রুনের দুষ্টামি সব হাকিমকে কইল।
দরবেশ ছদ্মবেশী বলে মূল বিষয়
বর্তমানে খয়রুনের তিন মাসের গর্ভ হয়।
ময়নার দোষ নাই, খয়রুন অইল দোষী
শাশুড়িকে মারতে গিয়ে মায়ের গলায় রশি।
লাগায় গণ্ডগোল হুলমূল হৈচৈ পড়িল
এই কথা বলিয়া কোথায় চলিয়া গেল।
দুষ্ট খয়রুন ছিলো এজলাসের সামনে
পুলিশ দিয়া মেডিকেল পাঠাইন তখনই।
ডাক্তারের রিপোর্ট ছিল জানা গেল গর্ভ তিন মাসের

www.pathagar.com

তখন দেখা যাবে কি যে হয় ময়নার বিচারে।
হাকিম চিন্তা করি জিজ্ঞাসে খয়রুনেরে
তিন মাসের গর্ভ তুই পাইলে কেমন করে?
তখন দুষ্টা নারী কালনাগী জোয়াব নাহি করে
গোস্বাই অইয়া হঠাৎ হাকিম তখন জেলে দিল ভরে।
ময়নারে খাল্লাস দিল, খয়রুন রইল জেলের ভিতর
দশ মাস দশ দিন পর তার জানাবার খবর।
তখন কে হয় পাপের তায়ী
দুষ্ট নারীর ফাঁসি হাকিম রাখেন স্থায়ী।
তবারককে ধরি রাখেন বেটিরও সাথে
খবর লইমু আগামী দ্বিতীয় বিচারে।
ময়না ব্যথিত অইয়া হাফিজ খতম পড়াইল
মায়ের রূহের উপর মাগফেরাত চাইল।
ওহে যুবক ভাই, অনুরোধ আমার
মাতাপিতার চরণ সেবা না অইলে অসার সংসার।[১৩]

পল্লিগায়ক আবদুল কাদির সিলেটি আঞ্চলিক ভাষায় এই জারিটি রচনা করেন।

৫. বাউলগান

মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকৃত বাউলগান খুবই কম হয়। এ অঞ্চলে 'বাউল' না বলে 'বাউলা গান' কেন বলা হয় তা গবেষণা সাপেক্ষ। মুর্শিদ ভজন, দেহতত্ত্ব মূলক গান, রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহের রূপ, সৃষ্টির সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষাই গানের প্রতিপাদ্য বিষয়। অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক জীবনবোধের বাউলা গানের মাধ্যমে আশেকানরা মাসুকের কাছে পদানত হয়ে যান। এ জনপদের বাউলা গানের ইতিহাস প্রাচীন। বহু পির-ফকির-সাধু-সন্ত-বৈষ্ণব এ মাটিতে জন্মেছেন, আবার অনেকেই এখানে এসে স্থায়ী হয়েছেন। কুলাউড়া উপজেলায় সাধক কবি ভবানন্দ, সাদেক আলী, ইয়াছিন শাহের প্রভাব রয়েছে। সাধকদের সমাধিস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে বাউলা গানের আসর। নারী-পুরুষ উভয়েই মিলে বিশেষত ওরসের দিন গান গেয়ে থাকেন। বর্তমানে কিছু সংখ্যক শরিয়তপন্থীদের ক্রমাগত বাধা-নিষেধের ফলে বাউলগানের আসর কিছুটা ম্লান হচ্ছে। মাজারের শিষ্যরা কখনো খালি গলায় কখনো বা ঢোল-ডপকি বাজিয়ে গান করেন। নানা তরিকার লোকজন এই উপজেলায় আছেন। কিছু খানকা শরিফও আছে। তারা মাসে একদিন এসে জিকির করেন।

বাউল রানু সরকারের গান

১

আমি করজোড়ে আছি খাড়া অপরাধী দুয়ারে
দয়া নি করিবায় গো আমারে ও দয়াল আল্লা গো
দয়া নি করিবায় গো আমারে। ঐ

www.pathagar.com

তুমি দয়ারি সিন্দু, তুমি পরেরি বন্ধু, দয়া কর এক বিন্দু
আমার আপন বলতে আর কেউ নাই– দুঃখীজনার সংসারে। ঐ
তুমি রহিম রহমান, তুমি পাক ছোবহান
তুমি হাফেজ মহীয়ান
কী গাইবো তোমার গুণগান
গাইবার শক্তি দাও মোরে। ঐ
আমার যাইবার জায়গা নাই
ওগো পাক বারী সাঁই, বল কার সাথে দাঁড়াই
রানু সরকার কেন্দে বলে, মাইরো না আর মরারে। ঐ

২

প্রণয় স্রোতে টেনে আন প্রাণবন্ধু সুজন
ছয়টি রিপু বাদ্য করে ঠিক রাখ লুচন।
যখন তুমি এসেছিলে ধরণীর উপর
মায়ের কোলে ছিলা তুমি কত যে আদরে।
যৌবনে কামিনীর ফেরে হারাইলায় মূলধন– ঐ
মহাজনের কাছে তোমার কী ছিল পণ
নিত্য সদায় থাকবে তুমি করিতে ভজন– (২)
অসাধ্য হইবে সাধন পূর্ণ হবে মন বাসন– ঐ
কাম ক্রোধ লোভ হিংসা করি পরিত্যক্ত
দমের সাথে দম রাখিয়া হৃদয় কর শক্ত।
ভাবিয়া কয় রানু ভক্ত পাবে খুঁজে মনু জন– ঐ

৩

আল্লাহ তুমি সর্বশক্তিমান পাক ছোবহান।
আল্লাহ তুমি সর্বশক্তিমান
এই পৃথিবী তোমার গড়া
আর কেউ নয় তোমার জোড়া
লা-শরিক রহিম রহমান পাক ছোবহান।
আল্লাহ তুমি সর্বশক্তিমান ॥

এই পৃথিবী তোমার হাতে সবকিছু পাক্কা করিতে
ওই ধরাতে যা আছে সৃজন ॥
তুমি এক লা-শরিক, তাতে নাই কোন মানিক
কেউ পারে না ভাঙ্গাতে তোমার মান ॥
'পাক ছোবহান'
আল্লাহ তুমি কাদির গণি কর আমায় মেহেরবানি
পেরেশানি করিও পরিত্রাণ ॥
তুমি ছাড়া নাই দরদী, ওহে আমার গুণনিধি

www.pathagar.com

অপরাধী পেতে চাই আহছান ॥ ঐ (পাক ছোবহান)
পাক কোরআনে বলছো তুমি, তুমি সবার অন্তরযামী
কাঁদি আমি রহমত কর দান ॥
রানু সরকার অপরাধী কাঁদি বসি নিরবধি
দয়াল বিধি তুমি দয়াবান ॥ ঐ[১৪]

সীতেশ রঞ্জন সরকার রচিত গান

সীতেশ রঞ্জন সরকার প্রায় ৫০ বছর ধরে গান গেয়ে আসছেন। তার গানগুলো মূলত বাউল, কবিগান, পদাবলী, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি। তিনি বিশেষ মরমিসাধক বাউল-ফকিরের গান গেয়ে থাকেন। তবে তিনি নিজেও মনের ভাব থেকে কিছু কিছু গান রচনা করেছেন। এগুলো কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

তিনি ২০০-এর মতো গান রচনা করেছেন। তিনি নিজস্ব দলবল নিয়ে ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে বেড়ান। এসব গানে তার আয়-রোজগার অতি সামান্য। কোনোমতে পেটে-ভাতে চলে। তবে এসব তার লক্ষ্য নয়। গানপাগল সীতেশ রঞ্জনের কাছে গানই জীবন।

১

লম্বা চুলে হইলাম সাধু
ঘরবাড়ি আর মনে চায় না
দেখে কলির আজব ঘটনা।
এই যে দারুণ কলির কালে
বাপ মানে না অনেক ছেলে
পটনা বুড়ি মায়েরে বলে
বউয়েরে কয় সোনার ময়না।

আজকাল ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বিবাদ
একে অন্যে করে আঘাত
হায় রে হায় কি ঘটল প্রমাদ
এ কর্মে কেউ থাকতে চায় না।
এ যুগে ভাই সমাজ নেতা
ঘুষ না দিলে কয় না কথা
সত্য কথা বলতে চায় না।
তাই তো ছেড়ে দিলাম আশয় বিষয়
গাছতলাতে নিলাম আশ্রয়।
মনদুঃখে সিতিশ কয়–
খাইতে গেলে ভাত মিলে না
দেখে কলির আজব ঘটনা।

www.pathagar.com

বাউল সীতেশ রঞ্জন বাউল ফকির। বিত্ত বেসাত সহায় সম্পদহীন এই বাউল এই সমাজকে ঘোর কলি হিসেবে দীক্ষিত করেছেন। তার কলি বা সমাজ এখন আধুনিক সমাজ হিসাবে আমরা জেনে আসছি। তিনি কলির আধুনিক সমাজটাকে নাকচ করে দিয়েছেন। এই সমাজে মা-ছেলে কোনো সম্পর্ক রাখে না। লেখাপড়ায় বিদ্বান নন এমন মানুষ বাউল সীতেশ গানে এই সমাজের যে মূল্যায়ন চিহ্নিত করেছেন, তা আসলে পুঁজিবাদী, ভোগবাদী, অন্যায়, বে-ইনসাফী সমাজ। তিনি বুঝে শুনে এ সমাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। ঘৃণায় সচেতনভাবে তিনি গাছতলাতে আসন পেতেছেন। তিনি সততা রক্ষায় এ সমাজের কাছে হার মানেননি।

২

আমার সোয়াপাখি কোন দিকে যাইব ছেড়ে
আমায় ছেড়ে
প্রাণপাখি কোন দিকে যাইব উড়ে।
ও মন রে, পাখি বাঁধল বাসা আমার ঘরে
আসে যায় কি সন্ধান করে, ধরা নাহি দেয় আমারে।
তারে জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা
লাগাইয়া মায়া-মমতা
ভুলাইয়া রাখিয়াছে আমারে।
ও মন রে, বুঝি না তার ফাঁকি ঝুকি
কত করে লুকালুকি
দৌড়াদৌড়ি ঘরে আর বাহিরে।
সে একটা মিনিট শান্তি বয় না
করে কলতান বাহানা
সে যন্ত্রণা সয় না অন্তরে
যাবে ছেড়ে–
ও মন রে, সেই অচিন পাখি
চিনল যারা অমর হয়ে গেল তারা
আসবে না আর ভবের বাজারে।
সিতিশেরে-ই কপাল পোড়া
হলো না আর অধর ধরা
জনম ভরা গেলাম কষ্ট করে
আমায় ছেড়ে কোন দিকে যাবে
প্রাণপাখি ছেড়ে।

এখানে আত্মার কথা বলেছেন। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস-এর Know thy self, নিজেকে তার চেনা হলো না বলে এই অচিন পাখিটা চেনা হলো না। তিনি এই পাখিটির নিয়ন্ত্রণ

www.pathagar.com

রাখেন না বলে মনে ক্ষোভ আছে। জীবনভর তিনি কষ্টের বোঝাই বহন করে তোলেন কিন্তু এই প্রাণপাখি তাকে ছেড়ে যাবে এই বেদনায় তিনি বিচলিত।

তার দুঃখের কাহিনি এখানেই শেষ নয়। বাল্যকালে তার দাদি মারা গেলে গ্রামে উচ্চ বংশীয় বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে গেলে পায়ের জুতো খুলে না যাওয়াতে ফিরে আসতে হয়। তার নিমন্ত্রণ হয় নাই। তিনি নমশুদ্র, জুতা পায়ে দেয়ার এই বেদনাবোধ থেকে তিনি লিখেন–

৩

হিন্দু কি মুসলিম, বৌদ্ধ কি খ্রিষ্টান
সকলই সমান প্রেমের বাজারে।
ব্রাহ্মণ হয়ে যদি না থাকে
তার ব্রাহ্মণত্ব, বৈষ্ণব হয়ে যদি
থাকে তার আদিত্য
প্রমাণ দিয়াছে শাস্ত্র, যাবে কাচা গায়ে
সকলেই সমান প্রেমের বাজারে।
শারিয়েতের মুল্লা মুন্সি
মারিফতের পির ফকির
শরিয়ত কে ছাড়ে না।
শুন ভাই মুসলমান
ইমান না গেলে হইবে তামাম
আগুনে পুড়ে
সকলেই সমান প্রেমের বাজারে।
এ দুনিয়ার যত মানুষ এক হাতের তৈয়ারী
তবে কেন হিংসা নিন্দা
বুঝিতে না পারি।
সিতিশেরই এই বিনয়
ওহে দয়াল দয়াময়
কোন পথে গেলে
আমি পাব তোমারে ॥

বাল্যকালে সীতেশ বাউল উচ্চ বংশীয় দ্বারা অপমানিত হয়ে তার বিরোধিতা বা তার অকল্যাণ কামনা করেননি। হিংসা ছড়াননি। বরং তিনি এই দুনিয়া সৃষ্টি প্রেমের জন্য– এই সত্য প্রচার করতেন। তিনি মানুষে মানুষে যেন ভেদাভেদ দেখছেন না। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজে মানুষ ভদ্র সুশীল হয়ে উঠতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। কিন্তু কোনো বিশেষ শিক্ষার দ্বার গ্রহণ না করেও সীতেশ সহজেই মানুষকে প্রেমময় হয়ে ওঠাই সার্থকতা এই বোধ অর্জন করে তার গানে তুলে ধরেছেন।[১৫]

www.pathagar.com

শাহ সুন্দর আলী বাউলের গান

আগে বাছিয়া নিও দেশবাসী গো
মিছা দুনিয়া
মিছা দুনিয়া ধান্ধা গো সাঁইজি
কোন রংগে বাধিয়াছ ঘর।
হাড়ের ঘরখানি চামড়ায় দিয়াছে ছানি
ওই না ঘরে বসতি করে
মন মনুরা চুরা গো সাঁইজি।
মাথার চুলও পাকিবে দন্ত নড়িবে
যৌবন দিবে যখন ভাটি
দিনে না দিনে খসিয়া পড়িবে
ওই রঙিন দালানের মাটি।
বাউল সুন্দর আলীর জীবন গেল ওই অকারণে
না পাইয়া তারে
পাইলে যে সারা দুই নয়নরে ধারা
না অইল আমার সাধনভজন গো সাঁইজি।

সুন্দর আলী বস্তুগত সম্পদপ্রাপ্তির জন্য নয়, স্রষ্টার সান্নিধ্য পেতে তার মন উথাল পাতাল। তাকে না পেলে জীবন অন্ধকার। গানে তার বেদনাবিধুর আর্জি প্রকাশ পেয়েছে। এজন্য তিনি হতাশা ব্যক্ত করে দুনিয়াকে ধান্ধাবাজ উল্লেখ করেছেন। এই দুনিয়ায় যা চাওয়া যায় তা পাওয়া যাচ্ছে না। এ জন্য মিথ্যা আশা। তার কিনার পাওয়া সহজ নয়। তিনি তার গানে সে কথাই ব্যক্ত করেছেন।[১৬]

আবদুল কাদিরের গান

পল্লিগায়ক আবদুল কাদির ১৯৯২ সালে এই গানটি দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবেশন করেন। ইউনিসেফের উৎসাহে গানটি গেয়ে তিনি মানুষকে সচেতন করেন।

এখন বলি সবার তরে
শুনেন সবাই খিয়াল করে।
মা বইনেরা আছ যতজন
শিশু বাচ্চা পালন করা
শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।
মায়ের বুকে আল্লার দান
রইল অমূল্য রতন।
আল্লা পাকে করছে দান
শুনেন বাই দিয়া কান।
দুধ খাওয়াইলে বাড়িবে সন্তান
দুই বছর দুধ বছর খাওয়াইলে
হুকুম করছেন ছোবহান।

www.pathagar.com

কোরানে তার প্রমাণ আছে
শুনেন তারও বিধান।
যদি কোনো শিশুর তরে
দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে
পাপের ভাগী হইয়া যাইব মায়।
যদি শিশুর মঙ্গল চাও
বুকের দুধ শিশুরে খাওয়াও।
বাড়তি খাওয়াতো তাহার
সাগু বালি যত হতি।
শিশুর খাদ্য দুনিয়ায়
সবার চেয়ে সেরা খাওয়া
মায়ের বুকে বইয়া যায়।
মায়ের বুকের দুধ খাওয়াইলে
কবি আব্দুল কাদির বলে নাইরে
ভাইটামিন এর অভাব হয়
সেই ভিটামিন শিশু খাইলে
সুন্দর দেহ গঠন হয়।
তাই তো এখানে বলিয়া গেলাম
স্মরণ রাখিও সবায়।[১৭]

রাকেশ চন্দ্র সরকারের গান

১

আমি বন্দি গুরুর চরণ শতবার
কৃপা কারা নহে গুরু, প্রথম জানাই বারবার ॥
গুরু ওহে, সকল চরণ বন্দি আমি, শ্রীকৃষ্ণ রাধার।
ওহে যে চরণে আশ্রয় নিয়ে, ভবসিন্ধু হবে পার ॥
গুরু হে ব্রহ্মা বিষ্ণু বন্দি আমি হর গৌরি আর।
রাম, সীতা, শ্রীচৈতন্য, জানাই আমি নমস্কার ॥
গুরু হে, দেব দেবীর চরণ বন্দি, মাতা-পিতা আর।
দীন ও রাকেশ বলে এ জীবনে মাতৃঋণ না শুধিবার ॥

২

রূপ বর্ণনা

সোনার গৌর উদয় হইল দেখ গো নবীন বেশে
ওগো কপালে তিলকের ফোটা নামাবলী গায়ে গো
চূড়াধরা নাই তার শিরে মোহন বাঁশি নাই তার গো
ওগো হরি হরি হরি বলে নাচে বাহু তুলে গো।
প্রেমঋণ শুধিবার তরে, কানাই এবার যোগী বেশে গো।
ওহে রাধাভাব সঙ্গে নিয়ে ঘুরে দেশে দেশে গো।

www.pathagar.com

দীন বা কোথা বলে করজোড় দেখবে যদি খায় সকলে গো।
ওগো দ্বাপর যুগের কৃষ্ণ চন্দ্র, উদয় কাঙ্গাল বেশে গো ॥

৩

একাত্তরের কথা শুন গো, সখি শুন মন দিয়া
ওগো ইয়াইয়ায় মানুষ মারে, পাঞ্জাবি পাঠানরা সখি গো।
পাকিস্তানি দেশ ছিল গো সখি, দুইটি প্রদেশ লইয়া
ওগো পশ্চিম পাকিস্তান আর বাংলাদেশ লইয়া একটি গো।
পাঞ্জাবিদের অত্যাচারে গো সখি, বাঙালিয়া ক্ষেপিলা
ওগো বাংলাদেশের স্বাধীনতা, আনিল কাড়িয়া সখি গো।
রাকেশ বলে অত্যাচারীর গো গলে সাঁড়াশি লাগাইতো
ওগো বাংলাদেশের স্বাধীনতা, আনিল কাড়িয়া সখি গো।

৪

আমি কী বলবো তোমার ঠাই
পাকিস্তানির অত্যাচারীর সীমা নাই
ওগো অত্যাচারীর সীমা নাই গো, জ্বালাই পোড়াই করে ছাই।
সাতাত্তরের ফাল্গুন মাসে, সংগ্রাম শুরু হয়।
ওগো লাখে লাখে মানুষ মারে, নারী-পুরুষ বিচার নাই।
পাঞ্জাবিরা দলে দলে বাড়ি বাড়ি যায়।
ওগো পুরুষ মারে নারী ধরে, নিয়ে যায় গো, তাদের ঠাই।
রাকেশ বলে, শুন সবে, বিলম্বের কাজ নাই।
ওগো বাঁচতে চাইলে, তীব্র চলো, অত্যাচারে প্রাণ বাঁচাই।

৫

মন রে মানবজমিন রইল পতিত, আবাদ করো না
ভাবের লাঙ্গল দিয়ে মনরে কর্ষণ করো না ॥
ভক্তিরস সিঞ্চন করে, ভাবের দ্বারা আইন বাঁধিয়ে
ওহে যতন করে প্রেমের চারা রোপণ করো না ॥
আগাছা হয় রিপু ছয়জনা, ফেলে থাকলে ফসল ফলে না।
ও সঙ্গ আর উপাসনা হয়ে ক্ষেতের দেখাশুনা
দীন রাকেশ বলে তাই করিলে ফলবে সোনা ॥[১৮]

৬. মঙ্গলা গান

প্রতি আশ্বিন মাসের শুরুতে মঙ্গলা গানের সুচনা ঘটে। মধ্যরাত থেকে শুরু হয়ে। সকাল পর্যন্ত মঙ্গলা গান চলে। তখন কৃষিকাজ কম থাকে। গ্রামের হিন্দু লোকজন সবাই মিলে মঙ্গলা গানে অংশ নেয়। এই গান মূলত শ্রীকৃষ্ণকে ঘুম থেকে জাগানো। মৃদঙ্গ, ঝান, করতাল নিয়ে কীর্তনীয়ারা চাটাইয়ের মধ্যে বয়ে সারা রাত ধরে গান গেয়ে থাকেন। জুড়ি উপজেলার ভাবানীপুর গ্রামের কীর্তনীয়ারা মঙ্গলা গান করে থাকেন। এ বাড়ি একদিন, ও বাড়ি একদিন এভাবে গান গেয়ে কার্তিক মাস অতিবাহিত হয়।

www.pathagar.com

বর্তমানে এ গান বিবর্তিত হয়ে চৈতন্য দেবকে জাগানির গানে রূপ নিয়েছে। গানের মধ্যে 'গৌরা'র শয়নকক্ষের বর্ণনা আছে, ভোরবেলার প্রকৃতির রূপও গানের মধ্যে পাওয়া যায়। ঘুম থেকে উঠার সময় শ্রীকৃষ্ণের আলু-থালু ও ঢুলু-ঢলু ভাবের দিকটি ফুটে ওঠে। গায়করা একের পরে এক গান পরিবেশন করেন। বিমোহিত শ্রোতারা তন্ময় হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বা গৌরচাঁদের ঘুম থেকে ওঠার গানগুলো উপভোগ করেন। মঙ্গলাগানের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হলো:

১

উঠ উঠ গৌরাচন্দ্র নিশি পুহাইল।
নদিয়ার যত লোক জাগিয়া উঠিলা
ময়ুরা-ময়ুরী রব কোকিলার ধ্বনি। কত সুখে নিদ্রা
যাও গৌরা গুণমণি॥ অরুণ উদয় হইল কমল
প্রকাশ, তেজ হল মধুকর কুমুদিনীর পাশ॥
কর জোড় করি বলে বাসু দেব ঘোষে।
সুখে নিদ্রা যাও প্রভু ঘুমের আলসে[১]।
(ভোরের গান)

২

শুনিয়া কোকিলার রব গৌরা নটবর উঠিয়া
বসিলা প্রভু সিংহাসন মাঝ॥ সুবর্ণের
ভৃঙ্গায় জল দিয়াছে ঈশানে, মুখ প্রক্ষালন
করইন আনন্দিত মনে॥ সুভাসিত জলে মুখ
মাজইন[২] করিলা। ভক্তগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া
বসিলা। কিবা সে লাবণ্য রূপ প্রভুর বয়স
উদাম। বাসুদেব ঘোষে বলে না পুরিল আশ।[১৯]
(ভোরের গান)

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়, ২. সকালে ঘুম থেকে উঠে হাতের আঙ্গুলি দ্বারা দাঁত ঘষা।

৩

নিশি অবসানে গৌরা শ্রীবাস মন্দিরে
জাগিয়া বসিলা পুষ্পশয্যার উপরে
বামেতে অদ্বৈত চন্দ্র, দক্ষিণে নিতাই, মধ্যে
আসি বসিলেন চৈতন্য গোসাঁই॥ চতুর দিকে
ভক্তগণ জাগিয়া বসিলা। হরি বলে জয়ধ্বনি
করিতে লাগিলা। নর হরি বলে এবে
নিশি গেল দুরে॥ পাষণ্ডীরা না জাগিতে
শীঘ্র চল ঘরে। পাষণ্ডীর কুবচন শরীরে না
সহে, ধর্ম বলে শীঘ্র গতি চল নিজ ঘরে॥
(সকালের গান)

www.pathagar.com

৪

মঙ্গল শ্রী আওরতি শ্রী গৌর কিশোর।
মঙ্গল শ্রী নিত্যানন্দ প্রেমরসে ভোর॥
মঙ্গল শ্রী অদ্বৈত ভক্তগণ সঙ্গে। মঙ্গল
গাওত প্রেমের তরঙ্গে॥ মঙ্গল বাজাওত
খোল করতালে। মঙ্গল হরিদাস নাচইন তো ভালে॥
মঙ্গল দীপধুপ লইয়া স্বরূপে।
মঙ্গল আওরতি করে অতি অপরূপে॥
মঙ্গল গদাধর হেরি প্রভুর আশ।
মঙ্গল আওরতি করে দ্বিজ কৃষ্ণ দাস॥ (ভোরে)

৫

রাই জাগো গো সারি, শুক বলে। কত নিদ্রা
যাও গো রাই শ্যাম নাগরের কোলে॥
সারি বলে, ওহে শুক ডাক উচ্চ স্বরে, মলয়া
পবন বহে কুঞ্জের দুয়ারে॥ সারি বলে, ওহে
শুক হই গেল বিয়ান, গগনে উদয় ভানু
উড়িল পরান॥ সারি বলে, ওহে শুক মোরা
পৌষনীয়া পাখি, জাগাইলে না জাগে রাই
ধর্ম কর স্বাক্ষী। সারি বলে, ওহে শুক গগণে
উড়ে ডাক, গগনের মেঘ আনি অরুণকে ঢাকি॥
জাগিয়া উঠিলা রাধে শুকের কথা শুনি।
উঠিয়া বসিলা রাধে শ্রীচান্দ বদনী॥ যদুনন্দন
দাসে বলে সারি কিনা দুঃখ দিলে। এমন
সুখের নিদ্রা কেমনে ভাঙ্গিলে॥ (সকালে)[২০]

৭. কীর্তন

প্রতি সপ্তাহে হিন্দুপল্লির কোনো না কোনো বাড়িতে রাত্রিকালে কীর্তনের সুর বেজে ওঠে। মৌলভীবাজার জেলা বিভিন্ন উপজেলার মধ্যে অনেক কীর্তনীয়া দল রয়েছেন। কীর্তনের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। মূলত শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীকৃষ্ণের নামমাহাত্ম্যের জয়গান করা হয়। কীর্তনীয়ারা প্রধানত ধুতি পরিধান করেন। মৃদঙ্গ, ঝান, করতাল এই তিনটি যন্ত্র দ্বারা গান পরিবেশিত হয়। নারী-পুরুষ উঠানে চাটাই বা মাদুরে বসে গানের দোহারায় শরিক হন। গানের শুরুতে আলাদা একটা 'আসনে' প্রথমে মৃদঙ্গ রাখা হয়। সেখানে ফুল-দুর্বা-চন্দন দ্বারা মৃদঙ্গকে সম্মান জানানো হয়। তখন জয়ধ্বনি দেওয়া হয়, অতঃপর প্রধান গায়ক গানে টান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। গায়ককে আসর বন্দনা দিয়ে তার গানের কর্মসূচি আরম্ভ করতে হয়। শেষ দিকে কীর্তনীয়ারা দাঁড়িয়ে নেচে উচ্চস্বরে গানের দোহার দেন। তাদের হাতগুলো তখন উর্ধ্বে উঠে এবং চৈতন্যদেবের নৃত্যের ভঙ্গিমা কিছুটা হলেও প্রকাশ পায়।

www.pathagar.com

১

আইলো ঐ আইলো দেখ সংকীর্তনের
গৌরা রায়, নামের ধ্বনি প্রেমের ধ্বনি
মধুর ধ্বনি সোনা যায়॥ গৌরা চান্দের
ভক্ত যত যন্ত্রধারী সমুদায়, কেহ বাজায়
নামের যন্ত্র কেহ হরির গুণ গায়॥ সোনার
গৌররসের ভরা ধুলায় গড়াগড়ি যায়।
দুই নয়নে বহে ধারা, ধারা অঙ্গ ভেসে যায়॥
ভাব কান্তি বিলাস নিয়ে আইলো গৌর নদীয়া।
গৌরচরণ পাবো বলে দীন দয়াল দাসে গায়॥

২

ও মন আইসাছ ভবের বাজার কে বা কার,
নিতাই চৈতন্য বল বারে বার। নিতাই নিতাই
গৌর গৌর বল বদনে সদায় থাকবে চেতনে।
মনের সনে ভাবিয়া দেখ চোখ মুজিলে অন্ধকার॥
ভাই-বন্ধু স্ত্রী-পুত্র সবও অকারণ
কেবল নিশির স্বপন। হার গাথিয়া গলে
পইরো না চিন্তা মণিহার॥ সম্মুখে তরঙ্গ
নদী অতি চমৎকার, নদী কেমনে হবো পার।
হরির নাম তরণী কর গুরু আছইন কর্ণধার॥
মাইয়ার অনুগত প্রেম যে করিয়াছে যার
ভবে জন্ম না হয় তাঁর। ভাবিয়ে
ব্রজনাথে বলে মানব লীলা সারাসার।

এখানকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সহজিয়া বৈষ্ণবদের কিছু কীর্তন নিশিরাতে হয়ে থাকে। তারা নিজেদের রাধাকৃষ্ণ ভেবে গানে বিভোর হয়ে পড়েন। নারী-পুরুষের এই নিশিরাতের গান অনেকে নিন্দনীয় চোখে দেখেন।[২১]

কালীবাড়িতে কীর্তন

www.pathagar.com

৮. গাজির গীত

এক সময় মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক গাজির খলিফা ছিলেন। বর্তমানে গাজির গান বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। গাজি সাহেব আগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গাজির গান করতেন এবং গৃহস্থরা তাঁকে ধান দিতেন। গাজির হাতে 'আসা' থাকত। সেই 'আসার' (অর্থাৎ পিতল নির্মিত বাঁকা চাঁদের মতো পাতের নীচে লোহার দণ্ড যুক্ত থাকা) স্পর্শ করা পানি কৃষকরা পবিত্র মনে করে গরুর ঘরে ছিটিয়ে দিতেন।

বর্তমানে নির্ধারিত বাড়িতে গাজির গান হয়। গ্রামের সাধারণ লোকরা এই গানের শ্রোতা। গাজির নির্ধারিত পোশাক থাকে। তবে এক একজন গাজির গানের খলিফার এক এক ধরনের পোশাক হয়। উপরের অংশ ফুল শার্টের মতো (যা অনেকটা ব্লাউজ আকৃতির থাকে) এবং নিচের অংশে বড় ঘাঘরা পরেন। মাথায় থাকে নানা ধরনের মালা। হাতে থাকে গামছা। গানের তালে তালে ঘাঘরা দুলিয়ে অপূর্ব ভঙ্গিতে তারা গান পরিবেশন করেন।

গাজীর গানে খলিফা চেরাগ আলী, মুকুন্দপুর, কালাউড়া, গাজীর গানের পোশাক পরিধান অবস্থায়

গাজির গান ও নাচ খুবই সুন্দর। কথায় কথায় সুরের সংযোগে কিচ্ছা বলার সাথে সাথে গান পরিবেশন করা হয়। কুলাউড়ার মুকুন্দপুর গ্রামের চেরাগ আলী (৫৬) গাজিকে 'খলিফা' বলা হয়। তিনিও প্রান্তিক কৃষক। অগ্রহায়ণ মাসের ধান কাটার পর অবসর সময়ে গাজির গান শুনতে আগ্রহী কেউ তাদেরকে নিতে চাইলে তিনি তার দলবলসহ রাতের বেলা গাজির গান পরিবেশন করেন। ২০০/- থেকে ৪০০/- টাকার বিনিময়ে সারারাত এই গান করা হয়। গাজির গীত অনেক দীর্ঘ। প্রথমে আসর বন্দনার গান হয়।

চেরাগ আলী খলিফার গাজির গীতের বন্দনা

১

আজি আইসো দয়াল আশনে আমার ওগো ॥
ও ভাই রে, প্রথমে আল্লাজির নাম গো মনে করি সার,
লইলাম পদের ধূলা নবি মোস্তফার গো ॥ আজি আইসো...
ও ভাই রে, নবি আপ্তাব, নবি মাপ্তাব, নবি মক্কার ফুল,

www.pathagar.com

এক নাম দীনের নবি, অপর নাম রসুল গো ॥ আজি...
ও ভাই রে, আনকারে উনকার বন্দি, বন্দি নিরঞ্জন,
নবলাখ ফিরিস্তা বন্দি, হাছন আর হোছন গো ॥ আজি...
ও ভাই রে, ফাতেমা জহুরা জান, হযরতের বেঠি,
যার হাতে রাখছইন আল্লায় কুদরতের রুটি গো ॥ আজি...
ও ভাই রে, সুন্দরবনে রইছইন গাজি হরছিত মন,
তোমারও পদের ধূলা মাথারও উপর গো ॥ আজি...
ও ভাই রে, দয়া কর দয়াল গাজি, অজ মক্কায় বইয়া,
তোমারও বালকে ডাকি তোমার নাম ধরিয়া গো ॥ আজি...
ও ভাই রে, আইসো ওবা দয়াল গাজি, আশনে কর ভর,
ভুলিয়া গেলে মুখের কালাম যোগাই দিও মোর ॥ আজি...
ও ভাই রে, এই সবাদি সব কথা নিরবে যাই থইয়া,
চৌকোট বন্দনার কথা শুনেন মন দিয়া ॥ আজি...
ও গো ফাতিমা মাও বন্দনা গাইলাম চরণে তোমার ॥
ও ভাই রে, পূর্বেতে বন্দনা গাইলাম পূর্বে কাগেশ্বর,
উত্তরে কামিনি বন্দি, দক্ষিণে সাগর ॥ ও গো ফাতিমা...
ও ভাই রে, পশ্চিমে বন্দনা গাইলাম, মক্কা পবিত্র স্থান,
যেই জায়গায় সালাম জানায় মোমিন মুসলমান ॥....
ও ভাই রে, তারপরে বন্দনা গাইলাম আমার পিতাজির চরণ,
যার উছিলায় দেখলাম আমি এই ত্রিভুবন ॥...
ও ভাই রে, এরপরে বন্দনা গাইলাম, আমার মাতাজির চরণ,
দশ মাস ও দশ দিন মায়ে রাখছইন উদরের ভিতর ॥...
ও ভাই রে, আক্কলে ছক্কল গো বন্দি, খালে বন্দি গাছ,
তিরিয়ে (স্ত্রী) পুরুষগো বন্দি, জালে বন্দ মাছ ॥...
ও ভাই রে, বাদশার মাঝে গাই বন্দি, বাদশা সিকন্দর,
চৌদ্দ বৎসর করছইন লড়াই, মশারির ভিতর ॥...
ও ভাইরে, ঘাটের মাঝে গাই বন্দি, আলেছুমার ঘাট,
সেই ঘাটে গাজি, পিতায় রান্ধিয়া খাইছইন ভাত ॥...
ও ভাই রে, মাটির মাঝে গাই বন্দি, রাঙ্গাটিলার মাটি,
বেটির মাঝে গাই বন্দি, কালা টুটি বেটি,
হাওরেতে গাই বন্দি, হাওরিয়া কেজা,
ষোলোশত নদীয়ার মাঝে, বরমপুত্র (ব্রহ্মপুত্র) রাজা ॥...
ও ভাই রে, হাওর কইলে হাকালুকি আর যত কুয়া,
বেটা কইলে মাওন মনসুর, তার যত পোয়া ॥
পংকির মাঝে গাই বন্দি, পংকি ধলেশ্বর,
সর্পের মাঝে গাই বন্দি, সর্প অজগর
মাছের মাঝে গাই বন্দি, রউ-কাতলা মাছ

www.pathagar.com

গাছের মাঝে গাই বন্দি, যত কপল (পেঁপে) গাছ গো ॥...
ওরে ওলির বন্দনা গাইলাম রে ॥
ও ভাই রে, সিলেটে বন্দনা করি শাহজালাল পিরজাদা,
আলিয়া মক্কার মাটি, সিলেট করলা থানা ॥ ওরে ওলির...
ও ভাই রে, পিরের মাঝে বন্দনা করি শাহজালাল পির,
আলিয়া মক্কার মাটি সিলেট করলা স্থির ॥...
ও ভাই রে, আবারও বন্দনা করি, শাহজালাল ইয়ামনী পির
সিলেটতনে পড়ইন নমাজ, মক্কায় দিয়া ছির (মাথা) ॥...
ও ভাই রে, পিরের মাঝে বন্দনা গাইলাম, পির শাহটিয়া,
আশি মণ পাটে হয় পিরের কমরের বাটিয়া ॥...
ও ভাই রে, পিরের মাঝে গাইলাম বন্দি, পির শাহ কিম,
এক মণ তামাখে বেটার গাজার এক চিলিম ॥ ...
ও ভাই রে, পিরের মাঝে গাইলাম বন্দি পির শাহা লাই,
আশি মন তামাখে বেটার কল্কিতে এক কালাই ॥
ও ভাই রে, পিরের মাঝে গাইলাম বন্দি পির জুব্বা লাল,
খনে বুড়া, খনে জোয়ান, খনে হইন ছাবাল (শিশু) ॥ ওরে...

গাজির গীত বা গান মূলত পুথি থেকে নেয়া বা পুথির গল্প গাওয়া হয়। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু রঙ্গ-ঢঙ্গের গানও গাজি গেয়ে থাকেন। এই গান রাতের পর রাত চলে।

২

ও বিদেশি সোনা ভাইছাব, বিয়া করবায়নি মোরে,
মায়া লাগাইলায় অন্তরে ॥ মায়া লাগাই...
তুমি না করিলে বিয়া, আর করিব কোনে,
মায়া লাগাইলায় অন্তরে ॥ ঐ
এত মায়া, এত দয়া, ভুলিতায় কেমনে ॥ ঐ
তুমি আমার রসিক নাগর, বিয়া করো মোরে ॥ মায়া লাগাইল...
এমন কইও নাগো কন্যা, এমন কইও না,
প্রাণ থাকিতে তুমায় আমি বিয়া করব না,
গোল রায়হান আমার মাসুক, তুমি জান না ॥ মায়া...
ও বিদেশি ভাইছাব আমার, দেখ্না চাহিয়া,
তোমার লাগি রইছি আমি পন্থে দাঁড়াইয়া,
ছাড় ছাড় ছাড় ভাইছাব, পরির আশা তবে,
আমারে করো বিয়া কুল্জুম ও শহরে ॥ মায়া...
এমন কইও না গো কন্যা, এমন কইও না,
গোল রায়হান আমার মাসুক ছাড়তে পারমু না,
তোমার লাগি আনমু জামাই, রাজপুত্র চাইয়া ॥ মায়া...
ও বিদেশি ভাইছাব আমার নিষ্ঠুর হইও না,
জীবন জৈইবন সব সঁপিলাম, ছাড়িয়া যাইও না,

www.pathagar.com

আমারে না করলে বিয়া, মরব গলায় রশি দিয়া ॥ মায়া...
এইসব কথা ভাই রে নিরবে মাই থইয়া, আর গোল রায়হান
ওর বেড়ানির কথা কিছু শুনেন মন দিয়া।

ওগো ভইনারী (বান্ধবী) শংকমুরায় নাও (নৌকা) বান্দাইছি নাইয়র
যাইতায়নি ॥ নারে গো নারিয়ার বল নারে নারে নার গো ॥
ও ভাই রে, প্রথমে বাহির হইলো সখি, তাইর নাম সুয়া,
দুই দাঁত বাহির করি রাখছে ভাঙ্গ ঘরের রুয়া ॥
ও ভাই রে, ওরপরে সাজিল গো সখি, তাইর নাম উনি, সামনে দুইটা
বাহির করি রাখছে যেন উপর টিল্লার থুনি (খুটি) ॥
ও ভাই রে, ওরপর সাজেগে সখি, তাইর নাম উমা,
একদিন রান্ধিলে ভাত, তিন দিন উড়ে ধুমা ॥
দেখ দেখ করিয়া সখিগণ, করিলা গমন, গোল রাহানের আগে
গিয়া দিলা দরশন।[২২]

৯. মনসাপূজার গান

সর্পভয় থেকে এ অঞ্চলের প্রতি ঘরে ঘরে মনসার পূজা হয়ে থাকলেও অধুনা কালে এই পূজা ও গান কমে গেছে। মুসলিম সমাজের লোকজন এককালে মনসাকে শ্রদ্ধা করতেন। মনসাপূজা শ্রাবণ মাসের পঞ্চমী দিন করা হয়। হিন্দু মহিলারা মনসা দেবীর উদ্দেশে গান গেয়ে থাকেন। পুরুষরাও পদ্মপুরাণের গান করেন। 'ওঝা'র পদ্মপুরাণ পরিবেশন কুলাউড়া অঞ্চলে প্রায় বিলুপ্ত। মনসাপূজার আগের দিন সন্ধ্যায় গ্রামের মহিলারা সমবেত হয়ে পুকুরঘাটে ফুল-দুর্বা-প্রদীপ ইত্যাদি নিয়ে যান এবং দেবীকে আসার অনুরোধ জানিয়ে তারা মনসা দেবীর আগমনের উদ্দেশে গান শুরু করেন। এই গানে কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। এই প্রক্রিয়াকে 'ঘাটনি' দেওয়া বলে। মনসাপূজার দিন মহিলারা একত্রে বসে পদ্মাবতীর জন্মবৃত্তান্ত, বড় হওয়া, বেহুলার ঘটনা ইত্যাদি গীত করে থাকেন। সব গানই বাদ্যযন্ত্র ছাড়া হয়।

মহিলাদের গান চলে সন্ধ্যারাত পর্যন্ত। রাতের বেলা পুরুষ-মহিলারা একত্রে পদ্মপুরাণের গান পরিবেশন করেন। কুলাউড়া উপজেলার গুতগুতি গ্রামের সুরেশচন্দ্র শর্ম্মা (৬৫) জানান, তাঁর ছোটবেলা 'ওঝারা' বাড়িতে এসে মনসা বা পদ্মা দেবীর গান গেয়ে যেতেন। তাদের পরণে থাকত ঘাঘরা, হাতে চামুণ্ডা। নেচে নেচে তারা গান করতেন। বর্তমানে শ্রাবণ মাসে মনসাপূজার সাথে হিন্দুবাড়িতে মনসার গান কিছুটা পরিবেশিত হয়। মনসা পূজার সময় বিপুলার ছয়মাসি গান গাওয়া হয়।[২৩]

মনসা বা বিষহরির জন্ম

জনমিলা[১] মনসা মাও গো হরিস ওপার।
দেবে করে জয়র ধ্বনি মঙ্গল জোকাড়[২]।
সোমবারে জনমিলা মাও গো পোষাই মঙ্গল বার।

www.pathagar.com

এ গো অশ্বিনী সে রইল পাইলা মনসার।
মাগো ব্রহ্মায় পড়ইন বেদ।
এ গো সুবর্ণের কাঁটাইলে[৩] মায় করলা নারীচ্ছেদ[৪],
আর বিষ্ণু নারাইন তৈল্য মায়ে অংগেতে ভুঞ্জাইয়া[৫]।
এগো ভৃঙ্গারের জলে মায়ে স্নান করাইলা।
ব্রহ্মায় থইলা নাম দেবি পদ্মাবতী।
বিষ্ণুয়ে থইলা নাম জয় দেবি মনসা গো।
আর শ্রী ষষ্ঠি বর[৬] কবি মনসার বর।
পদ্মার জনম হইল পঞ্চ ভুবন গো।

মনসা বা বিষহরির সাজানির গান

নাগের রথ সাজাইয়া আন গো ও পাত্র নেতা।
আর শিব প্রণমিয়া পদ্মা উঠিলা রথেতে গো।
ও নেতা আর ঠেকিয়াছে মনসার নৌকা ধলাই গাঙ্গের পারে গো।
আর আপনে কাড়ার[৭] ধরিয়া আইলা সেবক[৮] পাড়া গো। শ্রী ষষ্ঠি বর (বড়) করি
মনসার বর মনসার চরণধূলি শিরেতে বন্দন গো।
ও পাতও নেতা নাগ রথ সাজাইয়া দেও আনি।

মনসা বা বিষহরির আহ্বান

বেলের তলে শিলায় ঘাটেরে আরে পদ্মার দিল দেখা।
ওরে ডাকিয়া বলইন সেবক সকলেরে পদ্মারে নিতায় আইয়া
আর হাতে নাই মোর পয়সাকড়ি ঘাটে নাই রে নৌকা।
ওরে আসুউকা যে দয়ার পদ্মা যদি থাকে দয়া।
আর গলায়ে ফটকা বান্দিয়া সেবক সকল খাড়া।
ওরে পদ্মার নির্মাণ ঘট সাথে তুলিয়া লইয়া।
আরে নাচিয়া নাচিয়া সেবক সকল বাড়িতে চলিয়া আইলা।
আর ইঙ্গল মন্দির ঘরে চন্দন লেফিয়া, মনসার নির্মাণ ঘট বসাইয়া রাখিলা।

মনসা বা বিষহরির বসিবার গান

শাশুড়িয়ে ডাক দিলা বধূ গো সুন্দরী।
পূজার মাওবে নাগ আক[৯] শিগ্র করি।
শ্বাশুড়ির বাক্যে বধীয়ে শিরে ধার্য্য করি মণ্ডলে[১০] কুটিয়া আনইন কালি দলির গুড়ি[১১]।
আর অনন্ত বাসুকী নাগ আকিতে লাগিলা।
ত্বক্যক কুলিকা নাগ দেশে চলি আইলা,
আর পদ্মফুলে পদ্মপত্রে করিয়া সাজন তার উপরে বসাইলা পদ্মা মার আসন।
শ্রী ষষ্ঠি বর কবি মনসার বর মনসার চরণধূলি শিরেতে বন্দন।

www.pathagar.com

মনসা বা বিষহরির স্নান

স্নান কর গো মাও বিষহরি।
বেলা হইল অসময় স্নান কর গো মাও বিষহরি সেবকের আইজ শুভদিন।
রাজার মাইয়ার স্নান করিতে সঙ্গে যত কামিনি।
নিত্য করে আবেচ্ছরি স্নান কর মাও বিষহরি।
পঞ্চঘটে জল ভরিয়া পঞ্চ দ্রব্য তায় মিশল,
মন্ত্র পড়ি পুরোহিতে শিরে লইন গঙ্গার জল।
স্নান করিয়া মাও বিষহরি ঝারিয়া বান্ধইন কেশ রে,
সেবকের মাণ্ডব ঘরে করিলা প্রবেশ করে।[২৪]

মনসা বা বিষহরির নাইয়র যাওয়ার খেদ (আক্ষেপ)

কান্দে দুলালী পদ্মারে, আরে নাইয়ওর বিলাসে,
এও মাস গেল বাবা নাইওর না নিলায়রে[১২],
ভাদ্র মাসের দিন রে আরে ভাধাই চণ্ডীর পূজা।
আশ্বিন মাসের দিনরে আরে নব দূর্গার পূজা,
এগো কার্তিক মাসের দিনরে আরে কার্তিক গনাইর পূজা।
আগন মাসের দিন রে আরে লক্ষ্মী দেবীর পূজা।
পৌষ মাসের দিন রে আরে পৌষ নারানির পূজা।
মাঘ মাসের দিন রে আরে সূর্য দেবের পূজা।
ফাল্গুন মাসের দিন রে আরে ডুলপূর্ণিমার পূজা,
চৈত্র মাসের দিন রে আরে অষ্টমী বারুণী,
বৈশাখ মাসের দিন রে আরে বৈদ্যিনাথের পূজা,
জৈষ্ঠ্য মাসের দিন রে আরে সাবিত্রীর পূজা।
আষাঢ় মাসের দিন রে আরে আষাঢ়ী পঞ্চমী।
শ্রাবণ মাসের দিন রে আরে সুন্দরী যাইতা ভাসিয়া।
এও মাস গেল বাবা নাইওর না নিলা,
শ্রী ষষ্ঠি বর করি মনসার বর মনসার চরণধূলি শিবেতে বন্দন।[২৫]

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. জন্ম নিল, ২. উলুধ্বনি, ৩. লোহার তৈরি চাকু বিশেষ– যার হাতল বাঁকানো এবং মহিষের শিং দ্বারা তৈরি। দেখতে ছোট, ৪. জন্মমুহূর্তের নবজাতকের নাড়িচ্ছেদ, ৫. বেশি করে তেল দিয়ে সারা শরীর মালিশ করা বিশেষ, ৬. আসল নাম ষষ্ঠীবর দত্ত, সপ্তদশ শতকের লোক, পদ্মপুরাণের রচয়িতা, বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার দত্তগ্রামে, ৭. নৌকার কাণ্ডারি অর্থাৎ যিনি নৌকার হাল ধরেন, ৮. যিনি মনসাকে পূজা করেন সেই গৃহকর্তা হচ্ছেন সেবক, ৯. অংকন, ১০. হাতের লম্বা ও শক্ত কাঠের গুড়ি যা দিয়ে ঢেঁকিতে চাল গুড়ো করা হয়, ১১. ঢেঁকিতে তৈরি চাউল যখন গুড়ো গুড়ো হতে হতে মিহি হয়ে যায়, ১২. সঙ্গে নিয়ে যাওয়া।

বিপুলার ছয়মাসি

শোন দুখ[১] মনসা মাগো মহাদেবের ঝি
প্রথমও বৈশাখও মাসে বিয়া অইলো তর

www.pathagar.com

তরও প্রভু খাইলো নাগে লোহার বাসর।
রামও কলা কাটিয়া মাগো ভেরুয়া[১] বানাইলো
ইস্ট কুটুম বাপও ভাই ফিরিয়া না চাইলো।
জ্যৈষ্ঠ না মাসেতে মাগো ভাসিলাম সাগরে
পাপীষ্ঠ জ্যৈষ্ঠেও খরায় বর্জ ভাঙ্গিয়া পড়ে।
প্রাণনাথ মরিয়া মর চক্ষেও পড়ে পানি
শুকনা কাষ্টে মাগো জলন্ত আগনি[৩]।
আষাঢ় মাসেতে মাগো বাদল ঘন অইলো
কীট ও পতঙ্গ যত চারি ঘর লইলো।
তিতিয়া বিজিয়া[৪] মাগো বড় পাইলাম জাড়[৫]
পন্ত্র লইয়া ভাসিলাম মাওগো সমস্ত আষাঢ়।
আইলো তো শ্রাবণও মাস গাঙ্গে নয়া পানি
মরাধরা খাইতে আইলো অরণ্যেও বাসুকি।
আত্মমাংস কাটিয়া মাগো বাঘের দিমু আহার
বাঘে না খাইলো পন্ত্র দেখিয়া ব্যবহার।
আইলো তো ভাদ্র না মাসও জুড়িল কান্দন
আগে পাছে বেড়িয়া আছে ডাকাত সাতজন।।
চিত্ত স্থির মনসারে করিলাম স্মরণ
পলাইয়া গেলা মাগো ডাকাত সাতজন।
আশ্বিনও মাসেতে মাগো নেতার ঘাটে আইলো
রজকিনীর বেশও ধরি বস্ত্র পাকালিল।
বস্ত্র পাকালিয়া মাও গো লিখিলাম লিখন
নেতার ঘাটে ছিলাম মাগো সমস্ত আশ্বিন।
কার্তিকও মাসেতে মাগো দেবপুরি আইলুম
নৃত্য করিয়া মাগো দেবতা ভুলাইলুম।
দেবতা ভুলাইয়া মাগো মাগিয়া লইলাম বর
জিয়াইয়া দিবায় মরও পতি লক্ষীন্দর।
মরও প্রাণনাথ যদি না দেও জিয়াইয়া
দেবেরও সত্য জানিমু মনুষ্য জাতি হইয়া।
হয়ে ষষ্ঠিবর কবি মনসারও বর
আনলাম আনলাম অস্থিমালা জিয়াই লক্ষীন্দর।
আওয়া পাতিলেনে[৬] কাবুলি গঙ্গার জল
জল ছিটা দিয়া পদ্মায় লখাই জিয়াইলা[৭]।[২৬]

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. দুঃখ, ২. কলাপাতার মধ্যের ডাটা দ্বারা নির্মিত সুদৃশ্য মুকুট বিশেষ, ৩. আগুন, ৪. হালকা বৃষ্টির পানিতে কাপড় ভিজে যাওয়া, ৫. মাঘ মাসের খুব শীতকে জাড় বলা হয়, ৬. মাটির সেই পাতিল, যা কোনো কাজে ব্যবহার হয়নি, ৭. জীবিত করলেন।

www.pathagar.com

১০. ধামাইল ও বিয়ের গান

মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বিয়ের সময় সবচেয়ে আনন্দের আয়োজন হচ্ছে ধামাইল গান। হিন্দু বিয়েতে মহিলারা কয়েক দিনব্যাপী দীর্ঘ অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রায় সারাদিনই ধামাইল গান করে থাকেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মুসলিম পরিবারেও গান গাওয়া হয় কিন্তু হিন্দু পরিবারের মতো নয়, মুসলিম পরিবারে কোনো বাদ্যযন্ত্র থাকে না। মেন্দির জন্মকথা, হাতে মেন্দি বা মেহেদি লাগানোর সময় কিংবা জামাই বা দামান্দকে কেন্দ্র করে হাস্য-রসাত্মক গান চলে। গান গেয়ে গায়ক নিজেও আনন্দিত হন ও শ্রোতারাও দেখেশুনে আনন্দিত হন। হিন্দু কিছু বিয়েতে মহিলারা বসেও গান করেন। যেমন দধিমঙ্গল কিংবা বান্দা গান-বাজনা ছাড়াই মহিলারা মুখে মুখে সুর তুলে গান গেয়ে থাকেন। ধামাইল গানে ঢোল, করতাল, ঝান ব্যবহৃত হয়। এগুলোর অভাবে হাতে তালি দিয়েও ধামাইল গান চলে। আট বা দশ বারোজন মহিলা গোলাকার বৃত্তের মতো দাঁড়ান, তন্মধ্যে একজন উঁচু দরাজ গলায় ধামাইল গান তোলেন এবং হাতে তালি দিয়ে দেহ প্রক্ষেপণের মাধ্যমে সমান তালে ছন্দায়িতরূপে পা ফেলেন, তখন সকলেই গানের দোহার দেন। ঢোলের তালে তালে গানের গতি বাড়তে থাকলে বিভিন্ন দেহভঙ্গিমায় ধামাইল দেওয়া হয়। এই ধামাইল গানে সমাজের প্রান্তিক মহিলারাই বেশি অংশ নিয়ে থাকেন। কিছু সাধারণ কৃষক পরিবারের অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত গৃহী মহিলাদের ধামাইল দিতে দেখা যায়, তবে শিক্ষিত বা চাকুরিজীবী মহিলারা ধামাইল উপভোগ করেন কিন্তু দূরত্ব বজায় রাখেন। এই ধামাইল বিয়ে, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে করা হয়। কয়েকটা স্তরে এই গান গাওয়া হয়। (যেমন- আসর বন্দনা, নাম, খেদ, বিরহ, মিলন, বাশি ইত্যাদি)

বিয়ের সময় জামাই, জামাইর ভাই-বোন, বাবাকে নিয়ে রঙ্গিলারা হাস্যরসাত্তক কিছু গান গেয়ে থাকেন, এগুলোকে বলা হয় 'বান্ধা গান'। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো ধামাইল গান।

গ্রামাঞ্চলে মুসলিম বিয়ের সময় মুসলিম মহিলাদের দ্বারা পরিবেশিত কয়েকটি ধামাইল গান নিম্নে উল্লেখ করা হলো। এগুলো বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত।

১

মাঝ ঘরে কলসি হইয়া কিসের ধামাইল খেলো গো
কও গিয়া কন্যার মারে জল আনিয়া দিতা গো ॥
কন্যার মার পিন্ন দেখছি, লাল জামদানি শাড়ি গো
হাটিয়া যাইতে চড়িয়া পড়ে, নতুন গাছের পাতা তো ॥ ঐ
কন্যার চাচির পিন্ন দেখছি, নীল বেনারসি শাড়ি গো
হাটিয়া যাইতে ঝরিয়া পড়ে, নতুন গাছের পাতা গো ॥ ঐ

২

পন্থ ছাড় চিকন কালা, জল আনিতে যাই আমোরা
ওরে জলের ঘাটে শ্যামকালা, ওহ প্রাণসখি গো ॥ (জল আনিতে যাই)
যাইতাম জলে কদমতলে, বন্ধু দেখি বারে বারে
ওরে হাতের কলসি স্রোতে লইয়া যায়, ওহ প্রাণসখি গো ॥ (জল আনিতে যাই)

www.pathagar.com

বন্ধু যদি আপন হইত, স্রোতে কলসি ভরিয়া দিত
পরার বন্ধে বসিয়া রঙ্গ চায়, ও প্রাণসখি গো ॥ (জল আনিতে যাই)
পুস্কুন্ডিরও (পুকুর) চারি পারে, রাইরে দংশিয়াছে নাগে
রাজ ও পন্থে ঢলিয়া রইছইন রাই, ও প্রাণসখি গো ॥ ঐ
পুস্কুন্ডিরও চারি পারে রাধারে দংশিছে নাগে
রাধা কি বাঁচিবার ঔষধ নাই। ও প্রাণসখি গো ॥ ঐ

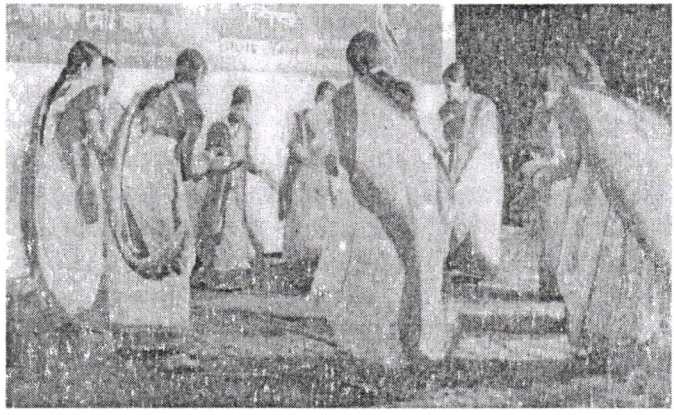

ধামাইলনৃত্য পরিবেশন করছেন রামকৃষ্ণ সরকারের ধামাইল দল, শ্রীমঙ্গল

৩

ঢাকা থাকি আইলা চন্দ্রবইত (নাপিত) ছাত্তি কান্দে লইয়া রে
বারকরি দেও শীতলপাটি নাপিত বউকা আইয়া রে ॥
মাই চাচির দুলবের কন্যা, আলোচে কামাইও রে
এক জরা দুঃখ পাইলে কন্যায় টান দিয়া কোলে লইও না রে ॥
হাটিয়া যাইতে ধরল কন্যার শাড়ির খুটে না রে।
মোর দক্ষিণা দিয়া কন্যা, চলিয়া যাও তোমার ঘরে না রে ॥
কন্যার মারে দিয়া দেও নাপিতের ঘরে না রে
নাপিত বলে চি চি মুইনা গছি তোরে না রে
তোরও থাকি পরম সুন্দরী আছে আমার ঘরে না রে ॥

৪

তুমি তো বিয়ার নৌশা আইছো রে, তোমার কেনে মাথায় পাগড়ি নাই রে
মাথার পাগড়ি থইয়া আইছি, বেদানা মাইজির কোলে রে
হাটিয়া গেলে তুলিয়া মাথায় ফইরাইয়া দিবা রে
তুমি তো বিয়ার নৌশা পাগড়ি নাইও রে॥
থইয়া আইছি, থইয়া আইছি, দয়াল আব্বার কোলে রে
হাটিয়া গেলে তুলিয়া মাথায় ফরাই দিবা রে ॥ ঐ [২৭]

www.pathagar.com

৫

তোরও বানে চাইতে গো বালি মরোও লাগে দয়া
কি বুক কান্দিয়া দিলা তোর বাবায় বিয়া।
যেই সময় দয়ার বাবায় কাবিন লইছইন ইছিয়া
সেই সময় দয়ার বাবায় শানে বানছইন হিয়া।
তোরও বানে চাইতে গো বালি মোর লাগে দয়া
কি বুক বান্দিয়া দিলা তোরও মায়ে বিয়া।[২৮]

রমজান উল্যাহর বয়স যখন ১০/১২ বছর তখন থেকেই তিনি গান গাইতেন। অল্প বয়স থেকেই গজল তাকে আকৃষ্ট করে। গ্রামাঞ্চলে এ সময় পুথিপাঠ, যাত্রা, বিয়েশাদির গান ইত্যাদি হলে এগুলো দেখে তিনি খুবই মজা পেতেন। এ সময়ে তার এক নানা ছয়দুল হাসান গান-বাজনা করতেন। নানার গানে আকৃষ্ট হয়ে তিনি পির-ফকিরি-মুর্শিদি ভাটিয়ালি-ওরসের গান ইত্যাদি গানের সঙ্গে যুক্ত হন। যাত্রাগানে আকৃষ্ট হয়ে তিনি একাধারে ১৩ বছর কাটান। পরবর্তী সময়ে তিনি ধামাইল, গাজির গান পরিবেশন করেন। গাজির খলিফা হিসাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে গান গেয়ে সুনাম অর্জন করেন। ২০০৬ সালে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে লোকসংগীতের অনুষ্ঠানে ধামাইল গানে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সম্মানীত হন। নিম্নে তার রচিত একটি ধামাইল গানের উদাহরণ দেয়া হলো–

আগে চলঅইন রতিকলা[১] অইয়া সারি সারি
তার পাছে সাজিয়া আইলা রাজারও কুমারী
সই আনন্দে চলিলা ফুলবনে
সই বিনন্দে চলিলা ফুলবনে।

আগে পিছে দশ দাসী মধ্যে রতিকলা
হালিয়ে ডলিয়া তারা জল সিনানে[২] গেলা
সই আনন্দে চলিলা ফুলবনে
সই বিনন্দে চলিলা ফুলবনে।

জলের ঘাটেতে গিয়া তারা কিনা কাম করিলা
ছয় বনির[৩] শাড়িখানি ছয় স্থানে তইলা[৪]
রতিকলার শাড়িখানি সান ঘাটে তইলা
সই আনন্দে চলিলা ফুলবনে
সই বিনন্দে চলিলা ফুলবনে।

পাতা পানিত নামিয়া তারা পাতা[৫] মাইনজন কইলা
আটু[৬] পানিত নামিয়া তারা আটু মাইনজন কইলা
সই আনন্দে চলিলা ফুলবনে। (২)

আর উরাত পানিত নামিয়া তারা উরাত[৭] মাইজন করিলা
ছাত্তি[৮] পানিত নামিয়া তারা নইয়া ভোড় দিলা

www.pathagar.com

সই আনন্দে চলিলা ফুলবনে। (২)
আর সিনান করিয়া তার পারেতে উঠিয়া
ছয় বনিয়ে শাড়িখানা ছয় জনে পাইলা
আর রতিকলার শাড়িখানি কোণে চুরি করিলা
সই আনন্দে চলিলা ফুলবনে (২)

আর ঝেলায়[৯] যদি করে চুরি তার সনে বইনালা[১০]
মুনিয়ে[১১] যদি করে চুরি তার সনে বইমু[১২] বিয়া
সই আনন্দে চলিলা ফুলবনে
বিনন্দে চলিলা ফুলবনে।
আর গাছ থাকি যুবরাজে হাসে কল কল
সাক্ষী থাকিও চন্দ্রসুরুজ সাক্ষী থাকিও তোমরা
আজি অইতে রতিকলা আমারও জোড়নী[১৩]
সই আনন্দে চলিলা ফুলবনে।

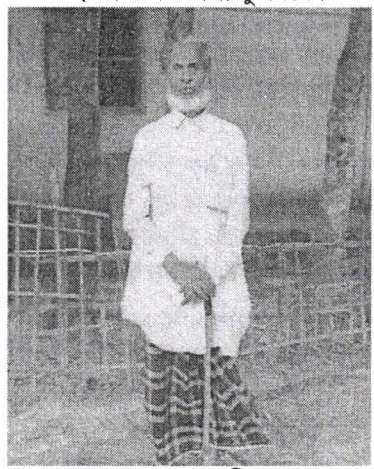

রমজান বয়াতি

সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় পুরুষ-মহিলারা এই গান গেয়ে থাকেন। ধামাইল গানে ১৫/২০ জন একত্রিত হয়ে গোল হয়ে পরিবেশন করে। গানে নৃত্য, ছন্দ, তাল একটা প্রক্রিয়ায় গাওয়া হয়। এটাকে তিন পাড়ার গান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই গানের ভেতর অপ্রত্যক্ষ একটি প্রেমের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাজকন্যা রতিকলা তার ছয়জন বোনকে নিয়ে স্নান করতে গেছেন। সঙ্গে দাসীরা আছেন। বিরাট এ আয়োজনে তিনি স্নান করেন নানা প্রক্রিয়ায়। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাজা ঘষা করেন। তাদের এ উপস্থিতি একজন রাজপুত্রের দৃষ্টি কাড়ে। তিনি স্নান সেরে পাড়ে ওঠেন, তখন তার পরনের শাড়ি খুঁজে পান না। কিন্তু তার বোনেরা যার যার শাড়ি পেয়ে পরে নিলেও তিনি বেকায়দায় পড়েন। তিনি তখন বলেন– তার এই শাড়িখানি কোনো নারী ফিরিয়ে

www.pathagar.com

দিতে পারলে তার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়বেন আর কোনো পুরুষ ফিরিয়ে দিলে তার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক গড়বেন। রাজপুত্র এই কথা গাছের উপর থেকে শুনতে পেয়ে চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী মেনে শাড়িখানা ফিরিয়ে দিলেন। রাজকুমার ও রাজকুমারী দৃশ্যত অচেনা মনে হলেও রতিকলার শাড়িখানা লুকিয়ে নেবার ক্ষেত্রে একটা অধিকারবোধ কাজ করছে। শাড়ি না পেয়ে রতিকলা ক্ষিপ্ত কিংবা উদ্বিগ্ন না হয়ে একটা ইতিবাচক আহবান ছুঁড়েছেন– যে আহবানটি তাকে জীবনসঙ্গী করে নেবার মতো প্রতিজ্ঞা। রতিকলা এ প্রক্রিয়ায় যুবরাজের কাছে ধরা পড়েন। এভাবে তাদের মধ্যে একটা নিবিড় প্রেমের সম্পর্ক বিবাহে রূপ নিয়েছে।

এখানে রতিকলা ও রাজকুমারের মধ্যে ভালোবাসার একটি আড়াল আমাদের মুগ্ধ করে তুলে। অধুনা নাগরিক সভ্যতার নর-নারীর সম্পর্কে বা প্রেম যে ভাবে চাকু-ছুরিতে হিংস্র হয়ে ওঠে রতিকলার প্রেম কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটা ক্লাসিক্যাল জীবনদৃষ্টি অবলীলা করে তুলে। তা হিংস্র না হয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মতো আবেদন তৈরি করেছে।[২৯]

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. গানে কথিত গ্রাম্য মেয়ের নাম, ২. স্নান, ৩. বোনের, ৪. কোনো কিছু রাখা, ৫. পায়ের পাতা, ৬. হাঁটু, ৭. উরু, ৮. বক্ষ, পাঁজর, ৯. অতি আপন বোন, ১০. মেয়েতে মেয়েতে বান্ধবী, যার সাথে বন্ধুত্ব করা হয়, ১১. ঋষি, ১২. স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা, ১৩. বিবাহিত স্ত্রী অর্থে।

১

লিল ঘোড়া সোয়ারী দামান্দ যাইন শ্বশুর দেশের
আজব তামাশার পনা রে[১]।
আঁধা পথ গিয়া দামান্দ পাইলা লাল সউলের[২] পনা রে
আর পনা পাইয়া দামান্দ রাজায় ভাবছইন মনে মনে রে
আজব তামশার[৩] পনা রে–
এছু নাই হেবত নাই কি দি পনা তুলতাম রে
আজব তামেশা পনা রে–
ভাবিয়া চিন্তিয়া দামান্দ কিনা কাম করিলা
কান্দে আছিল খাস্তার রুমাল, পনা ছাবিয়া তুললা রে
আজব তামেশার পনা রে।
আর পনা তুলি দামান্দ রাজায় ভাবছইন মনে মনে রে
মার টাইন দিলে পনা মাইয়ে খাইয়া লইবা রে
আজব তামেশার পনা রে–
সেই পনা বেজিয়া[৪] দিল নবীন শাশুড়ির দেশে রে
বনিরটাইন[৫] দিলে পনা বইনে খাইয়া লইবা রে
আজব তামেশার পনা রে–
আর পনা পাইয়া কন্যার মা ভাবঅইন মনে মনে রে
আজব তামেশার পনা রে–
দা নাই, টাকল নাই, কি দি পনা ভাছতাম[৬] রে
আজব তামেশার পনা রে–

www.pathagar.com

সুরুযখানি[৭] দামান্দর মায় শুনিলা করনে[৮] রে
আজব তামেশার পনা রে-
আনি দিমু দা টাকল পনা বাছ বসে রে
আজব তামেশার পনা রে-
খলই[৯] নাই, ধুচইন[১০] নাই কি দি পনা ধইতাম রে[১১]
আজব তামেশা পনা রে।
আনি দিমু খলই ধুচইন পনা ধইবার রসে রে
আজব তামেশার পনা রে–
পাটা[১২] নাই, পুতাইল[১৩] নাই, কি দি মরিছ পিসতাম রে
আজব তামেশার পনা রে–
আমি দিমু পাটা পুতাইল মরিছ পিসবায় বসে রে
আজব তামেশার পনা রে–
তেল নাই, তেলাইন[১৪] নাই, কি দি পনা রানতাম[১৫] রে
আজব তামেশার পনা রে–
সূরুযখানি দামান্দর মার শুনিলা করনে রে
আমি দিমু তেল তেলাইন পনা রান্দবায় রে
আজব তামেশার পনা রে–
পনা রান্দি[১৬] কন্যার মায় ছিকাত তুলি তইলা রে
আজব তামেশার পনা রে–
উছরাখানি[১৭] হুরতে হুরতে দুইটি পনা পাইলা রে
পিছখানি হুরতে হুরতে[১৮] আধাআধি কইলা রে
আজব তামেশার পনা রে–
ঘরখানি গুরতে হুরতে লেয়ামুছি[১৯] খাইলো রে
আজব তামেশার পনা রে–
পশ্চিমে দিয়া চাইয়া দেখওইন দামান্দর লস্কর[২০] আরা[২১] রে
পূর্বে দিয়া চাইয়া দেখওইন দামান্দর লস্কর আরা রে
দক্ষিণে দি চাইয়া দেখওইন দামান্দর লস্কর আরা রে
উত্তরে দি চাইয়া দেখওইন দামান্দর লস্কর আরা রে
আজব তামেশার পনা রে–
মালিয়া[২২] বাড়ি কালিয়া উলায়[২৩] এমন শরম দিল রে
উলা বেটায় চালে উটিয়া আল্লার কছম কর রে
আমি তো না খাইছি পনা খাইছে তোর শাশুড়ির রে
আজব তামেশার পনা রে–

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. পোনা, ২. শোল মাছ, ৩. ঠাট্টা করা, ৪. বিক্রয় করে, ৫. বোনের কাছে, ৬. মাছ পরিষ্কার করা, ৭. সূর্যের মতো দেখতে, ৮. কর্ণে, ৯. বাঁশের বেত দ্বারা ঘন করে তৈরি মাছ রাখার ঝুড়ি, ১০. বাঁশের বেত দ্বারা তৈরি একটু বড় ছিদ্রযুক্ত মাছ ধৌত করার ঝুড়ি, যা আগে বাজার করার ঝুড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হতো, ১১. ধৌত করা, ১২. পাথরের শিল, ১৩.

www.pathagar.com

শিলের মধ্যে মরিচকে বাটার জন্য পাথরের তৈরি লম্বা আকৃতির ও গোলাকৃতির যন্ত্র, ১৫. রান্না করার মাটির চেপ্টা বাসন, ১৬. রান্না করে, ১৭. ঘরের বারান্দাখানি, ১৮. ঝাড়ু দিতে দিতে, ১৯. পরিষ্কার করে চেটে খাওয়া, ২০. সাথি, ২১. আসছেন, ২২. মৎস্যজীবীর বাড়ি, ২৩. কালো রংয়ের হুলো বিড়াল।

এই গানে কৃষিভিত্তিক সমাজের একটা চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। ঘোড়া দৌড়িয়ে জামাই শ্বশুরদেশে রওনা দিতে গিয়ে পথে সউল মাছের পনা পেয়ে এগুলো তুলে নিয়ে নতুন শাশুড়ির কাছে পৌঁছে দিলেন যাতে এগুলো রন্ধন হয়। এদিকে পোনা পাওয়ার পর এগুলোকে খাবার উপযোগী করতে হলে যে জিনিস-এর দরকার তা শাশুড়ির ঘরে নেই। কিন্তু এগুলো জামাইয়ের দেশের মা যথারীতি পরিবেশন করে দিলেন। এখানে তেলাইন, দা, টাকলু, এছু, ধুচইন, পাটা, পুতাইল– কৃষিভিত্তিক পরিবারের নিয়মিত কাজের জিনিস। মরিচ পিষতে পাটা ব্যবহৃত হয়। ধুচইন বা বেতের পাত্রে মাছ, তরিতরকারি ধোয়া হয়ে থাকে। এছু মাছ ধরার বেতের তৈরি ত্রিকোণা বিশিষ্ট জিনিস। এই জিনিসগুলো গ্রামীণ জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় হলেও অধুনা এগুলোর পরিবর্তিত হয়েছে। অ্যালুমিনিয়াম বা প্লাস্টিক জাতীয় জিনিসের কারণে প্রাচীন এই জিনিসগুলোর কদর এখন একেবারে কমে গেছে।

এই গানে শাশুড়ির মনোভাবের একটি চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। তিনি সউল মাছের পোনার তরকারি এত সুস্বাদু হওয়ায় এগুলো খেয়ে সাবাড় করেছিলেন। কিন্তু এদিকে মেয়ের জামাই ঘোড়া দৌড়িয়ে লোকজন নিয়ে যখন উপস্থিত তখন তিনি উলা অর্থাৎ বিড়াল লুকিয়ে খাবার খেয়েছে বলে জানিয়ে দিয়েছেন। এ জাতীয় কাহিনির বাস্তবতা অমূলক নয়। এখনও আমাদের সমাজ পরিবারে এরূপ ঘটনার খবর মিলে।[৩০]

রামকৃষ্ণ সরকার ছোটবেলা থেকে আঞ্চলিক ধামাইল গানের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরিবারে মা, বাবা, বোনেরাও ধামাইল গান জানতেন। তাদের অনুপ্রেরণা ছিল। গ্রামের বিয়ে-শাদি, পূজা-পার্বণ ইত্যাদিতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। এসব দেখতে দেখতে ধামাইল গান সংগ্রহের ইচ্ছা জাগে। গ্রামে গ্রামে এগুলো সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এগুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেকের উৎসাহ পাওয়া যায়। আবার কেউ কেউ অবহেলা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। তথাপি তিনি দমে থাকেন না। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তার সংগ্রহ করা ধামাইল গানের সংখ্যা ৩০০-এরও বেশি। এগুলো সংগ্রহ করতে তাকে নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, চুনারুঘাট, বানিয়াচং, বিশ্বনাথ, ফেঞ্চুগঞ্জ, জগন্নাথপুর, দিরাই, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গলসহ বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়। সংগৃহীত অনেক গানের কোনো রচয়িতা খুঁজে পাননি। রামকৃষ্ণ সরকার ধামাইল সংগ্রহের পাশাপাশি যে সমস্ত বাউল, লোকশিল্পী দৃষ্টির অন্তরালে পড়ে আছেন তাদের স্মৃতি, কীর্তি, স্মরণ রাখতে বা তাদের পুনরুজ্জীবিত করতে প্রচেষ্টা চালান। তার উদ্যোগে এ পর্যন্ত ৩৪টির মতো ধামাইল গানের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা শিল্পকলা একাডেমীতে প্রদর্শনী হয়েছে। রামকৃষ্ণ সরকার গ্রামে-গঞ্জে ধামাইল গানের চর্চা উন্নত করার লক্ষ্যে লোক ধামাইল প্রশিক্ষণে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেখানে বাদ্যযন্ত্রসহ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ৫টির মতো ধামাইল প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড বিভিন্ন স্থানে হয়। রামকৃষ্ণ সরকার যেমন ধামাইল গান সংগ্রহ

www.pathagar.com

করে থাকেন, তেমনি নিজেও ধামাইল গান রচনার চেষ্টা করেন। এ পর্যন্ত তিনি ২৫টির মতো ধামাইল গান রচনা করেছিল। তার রচিত দুই গান দেওয়া হলো–

১

সখি তরা বার বেলাতে, যাইও না গো জলে
জলে গেলে কালার বাঁশি জ্বালাই পোড়াই মারে
আরশি-পরশি কালনদী বলে নানান ছলে
কার মালা আর যাব না যমুনারই কুলে।
কাঙ্খে কলসি ও সজনী লও গো সবে মিলে
কালনদীর ভিষণ জ্বালা ঘুচাইব কৌশলে
কালশশী বাজায় বাঁশি ওই কদম্বতলে
রামকৃষ্ণ কয় হবে দেখা জলের ঘাটে গেলে।

২

ও মন একবার তুমি ভাবতে নিরলে বসিয়া
ও তোর দেহতরি অইল জুরী কার পানেতে চাইয়া।
এই ভবেতে আইলায় রে মন কার মন্ত্রণা পাইয়া
মহামায়ায় ভুলিয়া রইলায় কামিনীর রূপ লইয়া।
উড়াইলে উড়বে মন হিজলের মুড়া
রামকৃষ্ণ কয় যাইব একদিন এই ভব ছাড়িয়া
আমি সাধনার ধন যা চাইছিলাম করিয়া।

নিম্নে রামকৃষ্ণ সরকারের সংগৃহীত ধামাইল গান থেকে কয়েকটি গানের উল্লেখ করা হলো। বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত এই গানগুলি সিলেটি আঞ্চলিক ভাষায় গীত হয়েছে। গানগুলো এখানে হুবহু তুলে ধরা হলো। বিবাহ অনুষ্ঠানসহ ধর্মীয় নানা স্থানে এগুলো গাওয়া হয়ে থাকে।

১

আমি বৃন্দাবনের শ্যাম গো সখি, আইস
তুমি নিরালায়, আসলে হবে কৃষ্ণলীলা আমি
ফুল ছিটাবো তোমার গায়। (২বার)
সখিগনে হেসে খেলে নাচবো নানান ঢঙ্গে
প্রেমখেলাতে মগ্ন হইয়া থাকব তোমার সঙ্গে
চান্দের আলো পড়বে লুটে তোমার দুটি রাঙ্গা পায়।
ফুলের মালা দিব গলে করব বুকে বন্দি
সুখ-বুঝিতা তোমার চুলের নিব যে সুগন্ধি
ভালোবাসা নিও সখি তোমার যত মনে চায়।

২

কহন না যায় গো সখি কহন না যায়
আর কতকাল থাকমু ভালা প্রাণবন্ধুর আশায়।
আর আমার কুঞ্জে আসব বলে থাকি তার আশায়

www.pathagar.com

পুষ্প চন্দন ছিটাই কত ফুলের বিছানায়।
আর আসব বলে কথা দিয়া আমারে কান্দায়
না জানি কার কুঞ্জে থেকে কার আশা পুরায়।
আর দারুণ বসন্তকালে মরি প্রেমজ্বালায়
ওগো কুকিলায় কুহু করে পুড়া প্রাণ জুড়ায়।
আর বাউল করিমে বলে হইলাম নিরূপায়
ওগো দেশান্তরি করল নাকি প্রাণের বন্ধুয়ায়।[৩১]

৩

জল ধরা দেও সাথে সই গো জল ধরা দেও সাথে
জল ঢালিয়া জলে গেলা বন্ধু পাইবার আশে।
কি আচানক কালিয়ার পিরিত জ্বইলা জ্বইলা উঠে
ওগো জলের লাগি স্ত্রী রাধিকার ধরছে মাথার বিষে।
আর বটবৃক্ষের তলে গেলাম ছায়া পাইবার আসে
ওগো পত্র ঝাড়ি রুদ্র লাগে আপন কর্মদোষে।
আর নদীর ঘাটে গেলাম আমি পাঁচ পাইবার আসে
ওগো নৌকা আছে মাঝি নাই গো খাইছে লংকার বাগে।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
ওগো কুল গেল কলংক রইল জগত ভাবিয়া।[৩২]

৪

বন্ধু আওরে তোমায় বুকে লইয়া পুড়া প্রাণ জুড়াই
ওরে আমি তোমার, তুমি আমার
শ্যাম নাগর কানাই। (২বার)
তুমি ছাড়া এ জগতে আমার কেহ নাই
তোমার কুলে মাথা রাখি মরলে শান্তি পাই।
আমার মনের যত দুঃখ বলব তোমার ঠাই
ওরে সোনা মুখে কইব কথা খুশির সীমা নাই।
চান মিটার মরণে যদি তোমায় কাছে পাই
সমন নিদানে দিও চরণেতে ঠাঁই।[৩৩]

১১. মুর্শিদি/ ফকিরি গান

শহীদুল ইসলাম সাইদ, স্থানীয় ভাবে শহীদ গাজি হিসাবে পরিচিত। গান-বাজনা করা তার নেশা। এগুলো তিনি ছাড়তে পারেন না। তার ভাষায়, আগে তিনি গান-বাজনা পছন্দ করতেন না। গাজির গানে একদিন তিনি বেয়াদবি করে ফেলেন। বাড়ি এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বপ্নে দেখেন তিনি গান গাইতে পারলে সুস্থ হয়ে উঠবেন। এরপর তিনি গান গাইতে শুরু করেন। মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গাজির গানসহ পির-ফকিরি, মুর্শিদি, ভাওয়ালি ইত্যাদি গান গাইতে থাকেন। মানুষ আনন্দ পায়। তিনি গান রচনা করতে থাকেন। কিছু কিছু ভাবের গানও রচনা করেন মুখে মুখে। কষ্ট ও অভাবের

www.pathagar.com

জীবনে তিনি যখনই ফাঁক পান তখন গান করেন ও ভাবের গান রচনা করেন। তার গ্রাম নছরতপুরে একটা মোকাম, এই মোকামের সৈয়দ শাহ নজির উদ্দিন ছিলেন। তিনি শাহজালালের অনুসারী বলে তাদের দাবি। তিনি তাকে সম্মান জানিয়ে ভক্তিমূলক গান রচনা করেছেন।

আমি বাপ মায়ের মুখ পুড়িলাম
নছরত শাহ-এর লাগি গো।
আগে কান্দি নছরত শাহের লাগি
মনে কি পড়ে না নছরত শাহ রহিতাছ ভুলিয়া।
লোকসমাজে অইলাম দোষী তোমারও লাগিয়া গো
ইছরত শাহ এতই কি কঠিন তোমার হিয়া গো।
আর কত জনে বিচার দেয় মনের বাড়ি গিয়া
সেই বিচারে সদয় হও বিচার যায় হইয়া গো।
এতই কি তোমার কঠিন হিয়া।
আর চোরা বেটায় করল চুরি ঘরে প্রবেশিয়া
তোমার নামে বাতি দিলে যায় পাগলিনী হইয়া
এতই তোমার কঠিন হিয়া।
আরে বছর বছর বাঘ আসিত দর্শন পাইবার লাগিয়া
পাগল শাহীদ কানতেছে নছরতপুর বসিয়া গো।

সাহেব কিবলার গান

হোসেনপুরের ভাণ্ডারের ধন
পাইলেন যারা গুণী
ছিল ছিলায়ে ফুলতলী ফুল ফুটাইলেন
ফকির আনাছ আলী।
আর, হোসেনপুরের ভাণ্ডারের ধন
পাইলেন ফুলতলী
জানি তিনি দয়ার সাগর
সত্য আল্লার অলি ছিল ছিলায়ে ফুলতলী।
এই লতিফি নামে দোহাই ফিরাইয়া খালি
ঘোর নিদানে পাইতে পারি ধূলি
ছিল ছিলায়ে ফুলতলী ফুল ফুটালেন আনাছ আলী।[৩৪]

হযরত মৌলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী- ফুলতলী সিলেটের বিখ্যাত আলেম একজন। তাঁর হাজার হাজার ভক্ত মুরিদান আছেন। শহীদ গাজী তাঁকে ভক্তিসহকারে এ গান রচনা করেন।

কবি ফকির আব্দুর রহমান ভাণ্ডারী ছোটকাল থেকে গান পছন্দ করতেন। নিজে বুঝে না বুঝেই গান গাইতেন। অভাবের সংসারে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি কাঠমিস্ত্রির কাজ করেন কিন্তু গান ছাড়েননি। ওরস মাহফিলেও যোগ দিতে থাকেন।

www.pathagar.com

মোকাম মঞ্জিলের আসরে গানে যান। তার মনের মাঝে সবসময় একটা ভাবনা কাজ করছে। এ জীবনটা কি এসব ভাবতে ভাবতে সংসার ও বৈষয়িক বিষয়ে মনোযোগী হতে পারেননি। ভান্ডারীর শিষ্য আবদুর রহমান গানের ভেতর দিয়ে জীবন খুঁজেন।

আব্দুর রহমান ভাণ্ডারী

১

দাও শিক্ষা দাও মোহন বাবা
জ্ঞানের নয়ন দাও তুলে
ভর্তি হয়েছি মাইজভাণ্ডারী স্কুলে।
নেই স্কুলের লেখাপড়া
খাতা-কলম এই সব ছাড়া
ধ্যান স্বরূপে মনমহলে।
দিবা-নিশি ক্লাস করিলে
ভর্তি হয়েছি মাইজভাণ্ডারী স্কুলে।

২

হে চির মহান তুমি সর্ব শক্তিমান
তাপিত মনকে শান্তি কর
বড় পেরেশান, আমি বড় পেরেশান।

মানব দেহে তোমারি স্থান
কুরানে রয়েছে প্রমাণ
মাসুক হয়ে পূরণ কর
আসিকের ধ্যান।

তোমার অনন্ত অসীম গুণে
এসেছি এ ভূ-মণ্ডলে
আমার বলিতে কিছু নাই

www.pathagar.com

সব তোমারই দান।
আশরাফুল মকলুকাতে প্রেম
দিয়েছ সব রূহুতে
রহমান চায় অনুগ্রহ
পাইতে সন্ধান।

৩

আমার সালাম নিও তুমি
হায় বড় পির বাগদাদী
কবর হইতে লাশ উঠিল
তোমারই শব্দ শুনি ।
আজমীরে আরজও আমার
খাজা বাবা আজমীরি
আলোর পথ দেখাও আমার
আঁধারে ঘুরে মরি।

মাইজভাণ্ডারে পাঠাই সালাম
মহিন বাবা ভাণ্ডারী
জোড় হাতে ভিখারি দরজায়
নাও তুমি গ্রহণ করি।
সিলেটেতে শাহজালাল ৩৬০
অনুসঙ্গী সালাম জানাই
পাক দরবারে সালাম বাবা।

৪

মুর্শিদ আমার নয়নমণি
মুর্শিদ আমার জানের জান
হৃদয়ে রেখেছি আমার
পূর্ণিমারি চান।

যে নামে আকুল হয়েছি
দেহ-মন পেরেশান
দিবানিশি গাই আমার
মুহিন বাবার গুণগান।

ধ্যান ভক্ত আশেক গুণী-জ্ঞানী
মুহিন বাবার জানের জান
খাঁটি প্রেমে না মজিলে
কেন্দে হবে পেরেশান।

www.pathagar.com

ভক্ত আশেক আছে যারা দিবানিশি
কান্দে প্রাণে শুনলে মুহিন বাবার বাণী
আশেকগণের জানের জান।
রহমান কয় দিবানিশি গাইব
মাইজ ভাণ্ডারীর গান
কঠিন মউত মুছিবতে
আমিনু পাইমু আছান।

৫

মুরশিদ ডাকি তোমারে ঘোর তুপানে
তরাও তরী তোমার কৃপা গুণে
ভাঙ্গা নায়ে মালে বোঝাই ভয়ে
পরান কাঁপে কালো মেঘে সাজ করেছে
পাড়ি দেই কেমনে।

উতাল-পাতাল ঢেউ লাগিয়া
নৌকা হেলে দুলে মুরশিদ
লাখ হাজার মন মাঝি ভাই।
শুধু এক ধ্যানে সাগর তরঙ্গ
তারা কেই চায় না কেউর প্রাণে
মুহিন বাবার প্রেমিক যেই জন
সদার এক ধ্যানে।
কাল কুম্ভীরের ভয় নাই
তাহারে পার করিয়া নিবে
তর মন মাঝি।
রইছে আশার ঘুমে চাইয়া
দেখ তর বেলা নাই, পারে হইবে কেমনে।[৩৫]

ইউছুফ আলী বাল্যকাল থেকেই গানের প্রতি আকৃষ্ট হন। পিতা রমজান আলী, চাচা রজব আলী উভয়ে সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। পারিবারিক বলয়ে গানের চর্চার প্রভাব পড়ে। যৌবনে তিনি মেলা, মাহফিলসহ বাড়ি বাড়ি পুথিপাঠ ইত্যাদির পরিচালক হিসেবে এলাকায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি মরমি, ভক্তিমূলক, গজল গান ইত্যাদিতেও আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। তিনি নিজে এসব গানের একজন পরিচিত শিল্পী হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। মরমি সুফিসাধক ইয়াছিন শাহের অনুসারী হিসাবে ইয়াছিন শাহের অন্যতম উত্তরসুরী শাহ মো. আশিকুর রহমানের নিকট বয়াতপ্রাপ্ত হন। ইউছুফ আলী রচিত গানের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে ১০টি গান এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় সহজ ও অনাড়ম্বর শব্দে তিনি গানসমূহ রচনা করেছেন। গানগুলো মরমের কথা বলে। তার গানে সমকালীন বিষয়ও স্পর্শ করেছে, যেমন–

www.pathagar.com

১

নাতীন সোনালীরে আমি বুঝাই কেমন করি
সুখের ঘরে দুঃখের অনল সহিতে না পারি নাতীন সোনালী রে ॥
মায়ের কুল ভাঙ্গিয়া তোমার যে নিয়াছে হরী গো সোনাল যে নিয়াছে হরি।
সর্বকুল ভাঙ্গিয়া তার যাইব একদিন ঘিরি নাতীন সোনালী রে ॥

সাধুগিরী দেখাই করল বিশ্বাসের ঘর চুরি গো সোনাল বিশ্বাসের ঘর চুরি
এর ইন্‌ছাফ করিবা আল্লায় থাক ধৈর্য ধরি নাতীন সোনালী রে ॥

দেখিয়া এই দুঃখ বেদন সহিতে না পারি গো সোনাল সহিতে না পারি
দিবানিশী ঝুরি তোমার চান্দমুখ হেরি নাতীন সোনালী রে ॥
পাগল ইউসুফে কয় মুর্শিদ চরণ ধরি গো সোনাল মুর্শিদ চরণ ধরি।
ছবর আর সুকুরের মালা লইছি গলে পরে, নাতীন সোনালী রে ॥

২

আউলা মাড়া[১] লাগাই দিছে সোনালী নাতীনে
কওছাই কিতা কয় মোর মনে
আউলা মাড়া লাগাই দিছে সোনালী নাতীনে ॥

গান লেখিতে পারি না মুই সোনালীর উথানে
খাতাপত্র আউলাই ঝাউলাই[২] কলম ধরি টানে
কওছাই কিতা কয় মোর মনে ॥
কুনোবায়দি[৩] ডাইতে দেয় না কাপড় ধরি টানে
বাজার হাট সব বন্ধ করি থইছে ঘরের কুনে
কওছাই[৪] কিতা কয় মোর মনে ॥

ঘরের মাঝে শান্তি তেইরে দেয় না রাইতে দিন
সারা ঘরে ভাঙ্গাচুরা সবতায় ধরি টানে
কওছাই কিতা কয় মোর মনে ॥

হকল সময় করে ওউতা কিতা[৫] কয় তার মনে
সবের মন কাড়িয়া নিছে শাসন করত কুনে
কওছাই কিতা কয় মোর মনে ॥
ভাবিয়া ইউসুফে কয় কিতা করমু অনে
যে লাগাইছে মায়ার লেটা সে রইছে গোপনে
কওছাই কিতা কয় মোর মনে ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বিশৃঙ্খল, ২. বুদ্ধিশুদ্ধিহীন, ৩. কোনদিকে, ৪. বলেন তো, ৫. এই জিনিসটা কি?

www.pathagar.com

৩

বর্তমান জমানার তালে তাল মিলাইতে পারলাম না
তাইতো আমার সব তালে বিড়ম্বনা ॥

কথাবার্তা সাধুগিরী বিশ্বাস না করিয়া কী পারি
অন্তরেতে হরা হরি তালবাহানা বুঝি না ॥
কত সুন্দর মুখের বুলি বাক্য ছাড়ে সব দলিলী
ছকাওতি বাইরের ঝুলি অন্তরে কুমন্ত্রণা ॥

আপন ভেবে যার কাছে যাই একমাত্র বন্ধু তারেই পাই
করি কত আড়াই বড়াই পিছে আছে সামনে না ॥
চক্ষে সাদা চশ্‌মা দিয়া সাদা দেখি সারা দুনিয়া
মরছি আমি ধোঁকা পদে পদে লাঞ্ছনা ॥

না বুঝিয়া এ যুগের খেলা ইউসুফ আলী রই একেলা
আমার বাজনা বাজার বেলা তালে তালে মিলে না ॥

৪

তোরা পাইলে কইও তারে গো মনচোরা বন্ধুয়ারে
আমি হইয়া যার প্রেমের ভিখারি ফিরি ঘরে ঘরে গো ॥
বিরহ বিচ্ছেদের জ্বালা আর কত সই অন্তরে
ওগো কি নিদারুণ প্রেমের আগুন জল ঢালিলে বাড়ে গো ॥

কার কাছে কই মনের দুঃখ বিশ্বাস কে বা করে
ওগো বুক চিরিয়া কারে দেখাই কে আছে সংসারে গো ॥

কুলুটা বানাইয়া গো বন্ধে কান্দাই কেনো মারে
আমি কলংকিনির এ পোড়া মুখ দেখাই বল কারে গো ॥

যদি আমি পাই না মরি তোরা কইও গো বন্ধুরে
ও তার জয় নামের কলঙ্ক থুইয়া ইউসুফ গেছে মরে গো ॥

৫

খেলো গো ধামালী খেলো গো ধামালী
এগো মনো স্বাদে আনন্দে লইয়া বনমালী ॥

বাক্কা শ্যামের চুড়া ধড়া মুখে মধুর বুলি মুখে মধুর বুলি
এগো নবীন বসনে অঙ্গে করে ঝিলিমিলি ॥

ললিতা বিশখা সখি আও সবে মিলি আও সবে মিলি
এগো মনো স্বাদে গাঁথো মালা নানান ফুল তুলি ॥
নব রঙ্গের গাঁথা মালা হস্তে লও তুলি হস্তে লও তুলি
এগো পরাইয়া শ্যামেরই গলে দাও করতালি ॥

www.pathagar.com

চতুর্দিকে সখিগণ মধ্যে বনমালী মধ্যে বনমালী
এগো যাইতে না দিও তারে বলে ইউসুফ আলী ॥

৬

প্রেম করিয়া হইলাম কুলুটা গো সখি লোকসমাজে পাই না স্থান
কি যাদু করিয়া গো বন্ধে নিল কুলমান ॥

নয়ন নিল নয়ন বানে রূপবানে নিল প্রাণ
আমার কলিজা চৌচির করিল মারিয়া প্রেমের কামান ॥
কইতে নারি সইতে নারি সদায় আছি পেরেশান
শাশুড়ি ননদী ঘরে শ্বাস ফেলিলেও পাতে কান ॥

ঘরে বারে কলংকিনি হইলাম কত অপমান
না জানিয়া প্রেম করিয়া কাটা গেল নাক আর কান ॥

পাগল ইউসুফের গলে প্রেমডোরে লাগাইয়া ফান
দূরে বসি টানে ডোরে মনোহরা কালাচান ॥

৭

ঐ দেখো শ্যাম রইয়াছে দাঁড়াইয়া গো কদমতলে
ও তার অঙ্গে পরান নবীন বসন, প্রেমমালা গলে গো ॥

মাথে চুড়া হাতে বাঁশি মনোচূড়া কালো শশী গো
ও তার অধরে মধুর হাসি রমণীর মন ভুলে গো ॥

কোমল পদ যুগল করে কদম্ব হেলানও ধরে গো
সে যে বাজায় বাঁশি মধুর সুরে রাধা রাধা বলে গো ॥

যাও গো সখি জিগাও তারে কেনো রয় শ্যাম দূরে ধূরে গো
এগো তার জন্যে মোর কুঞ্জ দ্বারে মোমের বাতি জ্বলে গো ॥

সাজিয়া রাই নব রঙ্গে সব সখি লইয়া সঙ্গে গো
ও তারে আদর করি আনো বলে ইউসুফ পাগলে গো ॥

৮

প্রাণের বন্ধু বংশীদারী প্রেম শিখাইয়া গেল ছাড়ি
তবু কেনো প্রাণে তারে চায় ॥

বাঁশিতে কি মধু ভরা মনপ্রাণ করিল সারা
গৃহ ছাড়া করিল আমায়
গেল বন্ধু মথুরাতে আমায় রেখে আসার পন্থে
আইল না শ্যাম রইল কোথায় ॥

www.pathagar.com

পুরুষ ভ্রমরা জাতি নানান ফুলে করে গতি
ফাঁকি দিয়া নারীর মন ভুলায়
মুখেতে মধু দিয়া জাতি কুল যৌবন নিয়া
গেলে নিষ্ঠুর ফিরে নাহি চায় ॥
শোন গো বিশখা সখি বন্ধে আমায় দিল ফাঁকি
আর কি গো না আসবে শ্যামরায়
ভুলিতে পারি না তারে ভুলিয়া রইল আমারে
না জানি গো কাহার ছলনায় ॥
আশার আশে কয় দিন থাকি আর কত সামলাইয়া রাখি
উড়ু উড়ু করে মনু রায়
ইউসুফ আলীর কর্মদোষে বন্ধুয়া রইল বিদেশে
নব যৌবন পড়িল ভাটায় ॥

৯

ঐ যায় আমার সোনা বন্ধু বাঁশির ধ্বনি শুনি গো
বন্ধে করিয়া নিল অবলার পরানি ॥

নামটি ধরে মধুর সুরে করল উদাসিনী
ঘরে না রইতে পারি আমি অভাগিনী গো ॥

আষ্ট আংলা[১] বাঁশের বাঁশি তরলের আগানী[২]
কে তারে শিখাইয়া দিল রাধা নামের ধনী রে ॥

অবিরতে জ্বলে চিত্তে বিচ্ছেদের আগুনী
একবার আনিয়া দেখাও দেখি দর্শনে নিবেনি রে ॥

পাগল ইউসুফে বলে শুন গো বিনোদিনী
নন্দের ঘরের কালা চান্দে করল কলংকিনি রে ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. আঙ্গুল, ২. কচি বাঁশের অগ্রভাগ।

১০

প্রাণ কান্দে গো সখি, বন্ধু বিনে সদায় দুঃখী।
ও তারে পাব পাব বলে আশাতে
প্রাণ কয়দিন রাখি ॥
সখি গো– পিরিতি করিয়া গো সখি
হইলাম আমি চিরদুঃখী
বন্ধু বিনে বাঁচে না পরানি।
আমার বুকে জ্বলে তুষের অনল
কি দিয়া নিবাইয়া রাখি ॥

www.pathagar.com

সখি গো– কি বলব কি বলব গো সখি
এ বেফানা কেমনে থাকি, বুকের ব্যথা কেমনে সহিব
পাগল মনরে বুঝাইয়া রাখলেও
বুঝে না মোর দুইটা আঁখি ॥
সখি গো– দুঃখের কি আর আছে রাখী
দুঃখের উপর দুঃখ রাখি
আর কত হই বন্ধুহারা হইয়া
পাগল ইউসুফে কয় মরণ ভালো
কি হইত এই জীবন রাখি ॥[৩৬]

১২. শোকগাথা

গীতটি সিলেটি আঞ্চলিক ভাষায় গ্রামীণ লোকগায়ক সাদেক আলীর মুখে রচিত ।

মারিও না, মারিও না মারিও না রে বেহার[১]
ধরি তব পায়। (২)
বাদায়[২] আছে দুইটি বাচ্চা তারার কি উপায়
আগে যদি জানতাম রে বেহার
নল[৩] চালাইবায় বুকে
প্রাণের ভয়ে উড়িয়া যাইতাম সোনালী জঙ্গলে রে
বনের বেহার রে। (২)
খবর উলিয়ে খবর দিল দুইটি বাচ্চার আগে
তোমার মাও মারা খাইছে অধম পিয়ারির হাতে রে
বনের বেহার রে। (২)
এক যাদু[৪] পয়দা[৫] লইতে মায়ে কত কষ্ট পায়
এক জানে তার একত্রের আন্তা আরও জানে মায়
ওরে বনের বেহার রে।
এক বাজু[৬] পচিল মায়ের গুয়ে আর মুতে[৭]
আরেক বাজু পচিল মায়ের মাঘ মাইয়া শীতে রে
বনের বেহার রে।
মায়ের গায়ের বস্ত্রখানি যাদুর গায়ে দিয়া
সারা রাত্র কাটিয়ে মায়ে আনল বুকে লইয়া রে
বনের বেহার রে।
দুইটি বাচ্চা কান্দন শুনিয়া বেহার হায় রে
বুক্ষের রক্ত ঝরে
বাটিওল[৮] আছিল যদি নদী ফিরিয়া উজান ধরে রে
বনের বেহার রে।
পানিত কান্দে পানি কাউরি[৯] শুকনায় কান্দে উদ[১০]
তিন দিনের ছাড়ওয়ালে কান্দে ছাড়িয়া মায়ের দুধ
ওবে বনের বেহার রে।

www.pathagar.com

তুর কলা[১১] বাদুরে খাইলে কলা না হয় বার্তিক[১২]
শিশুকালে মাই-বাপ মরলে ছাওয়ালের দুর্গতি রে
বনের বেহার রে।
অধম ছাদেকও বলে ও ভাই রে নদীর কুলে বইয়া
এই গান রচিলাম আমি দুই বাচ্চার লাগিয়া রে
মারিও না মারিও না রে বেহার ধরি তব পায়
বাচ্চার আছে দুইটি তাদের কি উপায়।

এই গীতে পাখির বাচ্চা দুটি শিকারি কর্তৃক বিপদের মুখে পড়ে। শিকারি দুইটি বাচ্চার মাকে পেয়ে পাকড়াও করলে মা বাচ্চার শিকারিকে নিবৃত্ত করতে বিলাপ বা কাহিনি বর্ণনা করেন তা খুবই হৃদয়বিদারক। তিনি শিকারিকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে যে প্রতীক, উপমা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়েছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। মনুষ্যসমাজে সন্তানের বিপদ হলে পিতা-মাতা কি যাতনা ভোগ করেন তা পাখির বিলাপের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

অধুনা কবি এ বিলাপ পাঠ করে আধুনিক কবিতার যে রসদ পেতে পারেন তা তার ভাবনার দরজাকে নাড়িয়ে দিতে পারে। সাধারণ লোককবির ভাব কোনো অংশেই বিদ্বান আধুনিক কবির ভাবনার জগত থেকে ছোট নয়।[৩৭]

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. শিকারি, ২. পাখির বাসা, ৩. বন্দুক, ৪. সন্তান, ৫. প্রসব, ৬. কোমরের উপরের অংশ, ৭. প্রস্রাব-পায়খানায়, ৮. ভাটির দিকে, ৯. পানিতে থাকে এক ধরনের পাখি, ১০. ডুব দিয়ে যে প্রাণী মাছ ধরে, ১১. কচি কলাসহ মোচা, ১২. আধা পাকা ফল।

১৩. সহজিয়া

একসময় সহজিয়া বৈষ্ণবদের চারণভূমিতে পরিণত হয়েছিল মৌলভীবাজার অঞ্চল। তারা দেহবাদী এবং নারী বা প্রকৃতি বা সাধিকা বা বৈষ্ণবি নিয়ে সাধন-ভজন করতেন। সাধারণ শাস্ত্রমার্গীয়রা সহজিয়াদের সম্পর্কে নানা বিদ্রূপাত্মক কথা বলতেন, কখনো শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা করতেন। এই সাধনা তাই গোপনে ও লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল। বিশেষত রাত্রিকালে নারীসহযোগী নিয়ে সাধন-ভজন ও গান-কীর্তন চলত। মৌলভীবাজার শহরের উত্তরে ঢেউপাশা গ্রাম তাদের পীঠস্থান ছিল। সাধক রঘুনাথ গোস্বামী (১২০৩-১২৯৪ বঙ্গাব্দ) এই ধর্মমত প্রচার করলে সহজিয়াদের ভক্তিপ্লাবন স্রোত মৌলভীবাজার অঞ্চলে বয়ে যায়। তারা কেবল গান করতেন। গানের মধ্যে আকারে-ইঙ্গিতে তাদের তত্ত্বকথা বলতেন। আজো প্রত্যন্ত গ্রামে 'শ্রীরূপের সেবা'র আড়ালে সহজিয়া মত প্রচলিত আছে। একজন সহজিয়া মতের অনুসারীর কাছে শোনা কিছু গান দেওয়া হলো।

১

শ্রী রঘুনাথ গোস্বামী তার সাধিকা শ্রীমতিকে দেখে এই গান করেছিলেন।

পৃথিবী ত্রিকুণ হয় আগাম-পুরান কয়
মাতৃযন্ত্র ত্রিকুণ ভাবনা।

www.pathagar.com

ত্রিকুণ শ্মশান স্থান, সাধনার হয় স্থান
শবাসন দেবী মহামায়া।
বিপরীত রতি রণে, কামাদি অসুর গণে
করি নাশ ভক্তে করে দয়া।
পশু আদি জীবগণে, এ তত্ত্ব নাহি জানে
মায়াবদ্ধ মানুষ নিয়ে।
আত্মসুখে হয় হত, সাধি কার্য বিপরীত
শ্মশানেতে সবে হয় লয়।
চিতাতে মৃতের লয় যোণীতে জীবন ক্ষয়
এই সত্য নহে অনুমান।
বিন্দু মধ্যে জীব রয়, মাতৃকা যন্ত্রতে লয়
শ্মশানেতে সব সমাধান।

২

সাধিকা শ্রীমতির সহজিয়া গান

কালরূপ সে কেমন, প্রাণসখি গো
সবাই বলে কাল কাল, কাল বহু নিদর্শন।
এক কাল কৃতান্ত কাল, আর কাল সর্পকাল
আর যে কোকিল কাল, কাল কি তার নিরূপণ।
কেশ ভুরু আঁখি কাল, কাল সে তমাল কাল
কোন কাল হৃদয়ে আলো কোথা কাল উদ্দীপন।
সজল দ্বিদল পথে কাল ভাল মৃণালেতে
বেড়ারক্ত শ্বেতপীতগোপনে কর সাধন।
গোপনে ত্রিকুণে থাকি, রঘু কয় লাগাইয়া আঁখি
ঐ কাল রূপ দেখি দেখি মরি যেন আকিঞ্চন।

৩

এবার বুঝিয়া রে মন করিবে বেপার
যারে বেদ বিধিতে না পাইছে পার।
সে বাজারে গেলে মরে অল্পবৃত্তি আছে যার
বড় চমৎকার রঙ্গের জিনিষ পশারিয়া মেলে বারে বারে।
সে রঙ্গের মার্যা পইয়া আর্য্যাধায় লাখে লাখে খরিদ্দার
কি ঠগের বাজার ডাকিয়া লয় পাইকার।
রঙ্গের জিনিস খুলিয়া দেখায় এই যে রীতি তার
পাছে দাম লইয়া জিনিস দেয় না, ঘাড়ে ধরি করে বার।
লোক না বুঝিয়ে কেবল বেগার খাটিয়া আয়
মহাজনের তহবিল ভাঙ্গিয়া মধ্যে যে লোটায়।
পাছে মূল খাজনা হয় না, কাজে যমরাজ দেয় কারাগার

www.pathagar.com

যদি কর সে বেপার শুন ওজন আছে তার।
কর মন মাস্তুলে তনু তরি ছয়জন গুণাধার
দশ জনা দশ দাড়ে রেখে শ্রীরূপকে কর কাণ্ডার।
ভাবের জিনিস ভারে ভরিয়া চলে সে বেপার
পরমেশ্বরের তিন ঘাটে দেখি তিনজন মোক্তায়ার।
তারে তালাশ দিয়া খালাস দিও, একত্রে তিন জনাব।
শ্রীমতি কহে হারাইলে মূল দুই গণ্ডার বুন্দাসার।[৩৮]

১৪. গাঞ্জার গান

গাঞ্জা একটি নেশা জাতীয় গাছ। এটির বীজ রোপণ করলে গাছ ওঠে। যারা নেশা করে তারা এই গাছ সংগ্রহ করেন। তবে এখন সমাজে রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা থাকায় গাঁজা সহজে পাওয়া যায় না।

শিব হচ্ছে গাঞ্জার ভক্ত। তার উপাসনা করতে সিদ্ধি-গাঁজা আবশ্যক। দল বেধে গাঁজা খেয়ে গান গাওয়া হয়।

সিদ্ধি আইল সিদ্ধি আইল
ভাই রে ভাই, বল হরি বল।
সিদ্ধির জন্মকথা কইয়া যাই বিস্তারি
আদিনাথ আর কাশিনাথ
আরেক নাথ শিব।
তিন বাউলে যুক্তি করি
আনলা গাঞ্জার বিছ
গাঞ্জার বিছ আনিয়া তারা
দেইন করতালি।

আশ্বিন কার্তিকও মাসে
গাঞ্জার পালায় আলি।
অগ্রাইন মাইয়া সুবাতাসে
গাঞ্জার দিল ফুটি
আসিয়া মহাদেব তাতে দিলা খুটি।

পৌষ মাইয়া খুয়া পাইয়া
গাঞ্জায় ছাড়ে পাতা
তেত্রিশ কোটি দেবগণে
উপরে ধরে ছাতা।
মাঘ মাইয়া শ্রীপঞ্চমী
গাঞ্জায় ধরে চটা

www.pathagar.com

আসিয়া মহাদেবে সেই চটা তুলিয়া
যোগায় ত্রিনাথ ঠাকুরের সেবা।
তিন বাউলে যুক্তি করি
গাঞ্জায় দিল সেবা
জটা ভাং ছটা ভাং
ভাং কামেশ্বর
তারে খাইয়া মগ্ন অইলা
পাগলা শংকর।

এই গানটি শব্দকর সমাজসহ নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে। লিখিত কোনো রূপ না থাকায় মুখে মুখে চলে।

সোনা মাই গো মাই
আচ্ছা সুন্দর তর জামাই।
সোনা মাই গো মাই
হাতে সাপ গলায় সাপ
ও মাগো সর্পে ধরে ফানি।
কোন সময় মারব কামড়
নিলয় ও না জানি।
ও মাই গো মাই
কুচনি নগরে যায়
কুচের সনে প্রেম বাড়ায়।
কুচের মাইয়ার সাথে কয় কথা
কাড়িয়া নেয় তার ঝুলি কাঁথা।
কি কইতাম গো লাজের কথা
লজ্জার আমার পড়ে মাথা।
ধাক্কা খাওরা সদা শিবে
জাতি করল নাশ।
সোনা মাই গো মাই
আচ্ছা সুন্দর তর জামাই।

এই গানে শিবের স্ত্রী গৌরী শিবের কাণ্ডকারখানায় লজ্জিত হয়ে দুঃখের কথা বর্ণনা করেছেন।

অং তুংগা তুং
নাতুং তংগা
ওরে ভাং খাইয়া দেখ দেখ দেখ গো
কুচের মাইয়া।
কাইস্তের পুতে খাইয়া ভাং
কলম তইল কানে

www.pathagar.com

রাখাল ভাইয়ে খাইয়া ভাং
গরু দিল ধানে
রইলাম চাইয়া
দেখ দেখ দেখ গো কুচের মাইয়া।
রাঢ়ীর পুতে খাইয়া ভাং
চট পটাইয়া চায়
মায়ে বলে ওরে পুত
জমে লইয়া যায়, রইলাম চাইয়া।
সুতার ভাইয়ে খাইয়া ভাং
গাছের মারে গুড়ি
কামার ভাইয়ে খাইয়া ভাং
লোহায় দিল বাড়ি
দেখ দেখ দেখ গো কুচের মাইয়া।

গাঁজা হচ্ছে শিবের প্রধান নেশা। এই নেশায় শ্রদ্ধাভক্তি আছে। শিবভক্তদের এই লোকগানে বিভিন্ন ভাবে গাঁজাটানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[৩৯]

১৫. বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর সংগীত

খুলং ঈশৈ

সাধারণত মণিপুরী যুবক-যুবতীরা অনেক কাজে দলবদ্ধভাবে অংশ নিয়ে থাকে। এককভাবে মাঠে কাজ করার সময়ে এক দল আরেক দলের উদ্দেশ্যে– যুবকেরা যুবতীদের প্রতি বা যুবতীরা যুবকদের উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন প্রেমের গান পরিবেশন করে থাকে। বলা বাহুল্য, এসব সংগীতের মূল উপজীব্য হলো প্রেম। এ সংগীতধারার নামই 'খুলং ঈশৈ'। 'খুলং' মানে দলবদ্ধভাবে কাজ করা; আর এভাবে দলবদ্ধভাবে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে ঈশৈ বা সংগীত পরিবেশনই হলো 'খুলং ঈশৈ'।
এর একটি নমুনা নীচে দেওয়া হলো–

নিপা (পুরুষ)	নুপী (নারী)
নূরা ইবেম্মা নুংশিবা	শাবী ইবুংঙো নংশিবা
শিঙেল লক্তগী অথোইবী	থংলেন ইমানগী মচা হায়সি হায়ঙমদা
লৈরাং লক্তগী শকহেনবী।	লেমলৈঙানা ওয়া ঙাঙরা লাইজ ঈশিংনা
চিনি চম্প্রা কৌবী শীঙেন্না	পনবগুম
লৈরাং মদোম শাৎতনা	কেতুকী কৌবী লৈরাংনা
কোচি খাংনা শাৎপগুম	তিংথং নাওমলক্তা শাৎপগুম
থোকলরে নবুঙ ঐঙোন্দা	ওয়ানা খাঙজরিবী ননাওনি।
কোলোয় নপাও শেংলম্মো।	

www.pathagar.com

এখানে একজন প্রেমিক-হৃদয় তার প্রেমিকাকে ফুলের সাথে তুলনা করে তাকে পাবার চিরায়ত আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করছে। প্রত্যুত্তরে প্রেমিকাও পানির গভীরে থাকা মাছের মতো হৃদয়ের কথা প্রকাশে অপারগ বলে তার অসহায়ত্বের কথা বর্ণনা করছে।

লোকনৃত্যের মতো মণিপুরী লোকসংগীতের ভাণ্ডারও খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ। মণিপুরী লোকসংগীতগুলো মূলত মেলডি ধারার এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের রসধারায় পূর্ণ। প্রধান প্রধান লোকসংগীতের ধারায় আছে– খুনং ঈশৈ, খুলং ঈশৈ, পেনা, খোংজোম, নাউথেম ঈশৈ, নাউশুম ঈশৈ প্রভৃতি।

মণিপুরী সমাজে আজও প্রচলিত এরকম একটি লোকসংগীত নীচে উদ্ধৃত হলো:

চীংদা শাৎপা ইঙেলৈ–
চিন্নদনা কেনখিবা
কলøকই দে।
ঐনা কেনগে কেনদেদা
মালংবনা হুম্বগী
কেনবনি দে।
মালংবা ঐসু কৈদৌদে
লৈরাংদা লৈখোক লোইবগী
কেনবনি দে।

বাংলা অনুবাদ

পাহাড়ি ফুল ইঙেলৈ–
অজান্তেই ঝরে গেলে
হয় আফসোস।
ইচ্ছে করে তো ঝরিনি আমি
ঝড়ো হাওয়া যে আমাকে
ঝরিয়ে দিয়েছে।
বাতাস আমারই বা কি দোষ
ফুলের জীবন যে শেষ হয়েছে
তাই তো ঝরে গেছে।[৪০]

চা-জনগোষ্ঠী

কুলাউড়া এবং জুড়ী উপজেলায় বহু চা-বাগান রয়েছে। সেখানে প্রায় দেড়-দুইশত বছর ধরে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর লোকজন বসবাস করছে। আজও তারা নিজস্ব সংস্কৃতির আলোকে গান-বাজনা করে থাকেন। যেমন টুসু পূজা, করম পূজা, দণ্ড পূজা, ফাগুয়া, বাঘাহুত, বনছত্রি, শিবের গীত ইত্যাদি অন্যতম। নিম্নে দেশওয়ালী সম্প্রদায়ের লোকসংস্কৃতিবিষয়ক তথ্যাদি দেওয়া হলো–

www.pathagar.com

দুলপূজার গান

১

সিয়া ডালে রাম গলে জয়মালা।(২)
দুলাহা তো শ্রী, রাম বনে হেঁ,
লছমন দেওর শহবাল্লা
সিয়াডালে... জয়মালা,
সমধিন তো বনে মাতা কৌশিল্লা,
দশরথ সমধি, মহিপালা
সিয়াডালে... জয়মালা
জিনকে সম্ভু, বারাতি মে আয়ে,
ওড়ে দিগম্বর মৃগ ছালা
সিয়াডালে... জয়মালা
তুলসীদাশ বলি আশা চরণকি
সুর বলে জয় জয় কালা–
সিয়াডালে... জয়মালা।(২)
হলি খেলে রঘুবিরা আওধমে, হলি মেলে-রঘুবিরা
কেকরা কনক ফিছকারি, কেকরা হাতে আবিরা।(২)
হলি খেলে রঘুবিরা আওধমে, হলি মেলে-রঘুবিরা
রামকে কনক ফিছুকারী, লছুমন হাতে আবিরা
আওধমে হলি মেলে রঘুবিরা।(২)
কেকর ভিজেলা চুনরি, শাড়ি, কেকর ভিজেলা চিরা?
সীতাকে ভিজেলা চুনরি শাড়ি, রামকে ডিজেলা চিরা।
হলি খেলে রঘুবিরা আওধমে, হলি মেলে-রঘুবিরা।

২

শুনা, শুনা জনককে বতিয়া, সখিয়া, শুনা জনককে বতিয়া
রাজা জনকজি প্রণ্ একঠানে, দুয়ারে ধরেলাঁ পিনকিয়া।(২)
সখিয়া শুন জনককে বতিয়া।
দেশ দেশকে ভূপ সব আয়ৈ, তারেন সকে
পিনকিয়া, আরে তারেন সাথে পিনকিয়া সখিয়া
শুন জনককে বাতিয়া,
বানাসুর, রাওন চলিআয়ে, ওহো ভাগেলা আধি রাতিয়া।
সখিয়া শুন জনকে বাতিয়া
মুনীকে সঙ্গ দো বালক আয়ে, ঊন ধর্ তোরা পিনকিয়া।
সখিয়া শুন জনকে বাতিয়া
তুলসী দাশ বনে আশা চরণকে সিয়া বিয়াহে
এহি ডথিয়া।(২)
সখিয়া শুন জনকে বাতিয়া।

www.pathagar.com

মনসার গান

ভজ মন শ্রী গুরু চরণ, মাতাপিতা না ভজিলে নরকে গমন।
হরিবল ওরে পাষাণ মন, এ ভব সংসার হতে কেই নাই আপন।
সওদাগর শ্বশুর সওদাগর, সনকা শাশুড়ি আমার। স্বামী লক্ষিন্দর।
ভালই বলে চান সওদাগরে, লুকায়ে শুনিছেন পদ্মা লুহারি বাসন।
ক্ষমা বান গো বেহুলা সখি, ওই আসছে সওদাগর তোমার শাশুড়ি।
লক্ষিন্দর জনমের সুন্দর, কুচি করে ধুতি দেব মিলনের চাদর।
কান্দেরে বানিয়া সাধু বসে কারাগারে।
বিদেশে আসিয়া বিধি সংহারিল মোরে।
সিতার মাথার কেশ বাতাসে উড়িল।
গসয় সিতা কান্দে রাবণেরই রথে।
জানগো মনসা দেবি হৃদয়ো মাঝারে
দয়া করে এসো মাগো আমারি আসরে।

টুসু পূজার গান

আঘনে আসিয়া উদ্ধব জানাইও সম্ভাধব
নিশ্চয়ই আসিবে কৃষ্ণ দিনও চারিদিন।

পুষেতে প্রবল শীত সহন্ না জাইবে
কার অঙ্গে দিব জল আঞ্জলি আঞ্জলি।

মাঘেতে মাধব জাইয়ো মথুরায় গমন গো।
কৃষ্ণবিনা নিরানন্দ সব বৃন্দাবন গো।

ফাল্গুনে পূর্ণিমা তিথি ঝুলনা ঝুলিতে গো
গোকুলেতে কৃষ্ণ নাই খেলিব কার সাথে গো?

চৈতেতে চাতকি ডাকে, পিহো পিহো সুরে
কৃষ্ণন বিহনে চিত্তো ধুক ধুক করে।

বৈশাখ মাসে ভরা নদী দু'কুলো সাঁতার
কেমনে আসিবে কৃষ্ণ না জানে সাঁতার।

জ্যৈষ্ঠেতে যমুনায় গিয়ে করি জলখেলা
কারও অঙ্গে ভরসিবো হইয়া শীতল।

আষাঢ়ে আসিল কৃষ্ণ মধুর বৃন্দাবনে
অষ্ট সখি নিয়া কৃষ্ণ খেলে মনের সুখে।

চান্দকে যেমন তারা ঘেরে, তেমনি ঘেরে গোপিগণ
আমরা সবাই ঘেরে রাখবো রাজকুমারী টুসুধন।

www.pathagar.com

দাতাকর্ণ পদ্মাবতি গুরুসেবায় দিলো মতি
নিজের ছেলের মুণ্ড কেটে ব্রাহ্মণকে করায় ভোজন।
টুসুকে অনিতে যাব চন্দন কাঠে চড়লে
যদি টুসু দয়া করে রাখব সোনার মন্দিরে।

বাঁশি কে বাজায় কে বাজায় ওই ঘাটেতে শোনা যায়?
চল গো ললিতা যমুনায়।

যখন আমি রানতে বসি তখন কালায় বাজায় বাঁশি
রান্দা বাড়া ছেড়ে আমি কেমন করে আসি?
চল গো ললিতা যমুনায়।

বিয়ের গান

দশ মাস দশদিন ছিলে মায়ের গর্ভে
আপন মনে ভাবে দেখো কি আছে নসিবে
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চার যুগে অবতার
যখন ছিলে মায়ের গর্ভে রান্দে খাইলে কোথা?
বনে ফুটে বনতিরা বনকে করে আলো
বিটি ছায়ায় মিছায় জনম পরের ঘরের আলো
কুমার ঘরের কুম কলসে সোনার বান্ধা কানা
রাধিকা সাজিছে জলে কৃষ্ণ করে মানা।

ভজপুরী বিয়ের গান

১

গিরি পরবত মে ক্ষমা মাংযায়ো
আয়োসখি পাতনো মাড়ো ছাওয়াই
মাড়োয়া বাড়ি সুন্দর।
সেওরি গাইকে গবরা মাঙ্গায়ো
দুধন আঙ্গনা লিপায়ো।
কঞ্চন কলস গঙ্গাজল পানি
আয়োসখি গজমতি চওকা পুরাই
মাড়োওয়া বড়ি সুন্দর।
চারই কণা চারই ক্ষাম্মা গাড়ায়ো।
আয়ো সখি বিচওয়া মে কলসা ধারায়ো।
মাড়োয়া বড়ি সুন্দর।
চারই কনা চার দিয়া জ্বলায়ো
আয়ো সখি বিচওয়া মে ধনুকা রাখায়ো।
দেশ ন দেশ কে ভূপ সব আয়ো
আয়ো সখি কোই নহি ধনুকা উঠাই

www.pathagar.com

যব রাজা রাম চন্দর মাড়ওয়া মে গয়ঁলো
ধনুক ভইল নব খণ্ড
আয়ো সখি সুতা ডালো রামগলে বরমালা।

২

আঙ্গনা লিপায়েলা দাঁহা চাঁহা
তেহি চড়ি চিতয়োলো ভুইয়া।
ধন আওতবানি গওয়া মোর বহিনইয়া
চিরহি জানি জেলা।
অওয়া উহে নন্দে পলঙ্গ চড়ি বইঠা
কচরা মাঙ্গাইয়া ডলা পান, গাওয়াহো
নন্দ একহি মঙ্গল। গাইব শুনাইব।
ভওজি জওনে মঙ্গনা হাম্ মাঙব,
তওনে হমকে দেওবো।
কহওন নন্দ কইকে শুনায়ো
ভওজি হমরো ইয়েরি সে পিইরি
বালককে সোনেকে হাসুলি।
হরি জিকে চড়নে কে ঘোড়াওয়া
রহসি ঘরে যাইবা।
নন্দ কাঁহা পাইবো ইয়েরি সে পিয়েরি
বালক্ মোরা হাসুলি কাঁহা পাইবো
কাঁহা পাইবে হরিজিকে চড়নেকে ঘোড়াওয়া
রোওত নিকলে ননদিয়া
বিলখাত ভগিনা নিকলে
রহসত নিকলে নন্দোইয়া
ভলেরে আশা টুটল।
জানি রোয়া জানি রই মোরো হোঁ
হম যাইব রাজাকে নকরিয়া
দরব লেই আইব।
তোহরেকে ইয়েরি সে পিয়েরী
কলক যোগ হাসুল,
আপনেকে আনবো চড়নেকে ঘোড়াওয়া
রহসি ঘরে যাইব।

৩

কেথয়ে কে থালি, কেথুয়ে লাগল বারি
সোনেকে থালি রূপে লাগলে বারি
জওনা ভরি ভরি আয়ো।
জওনা পরোসেলা ভাইয়া, আঞ্জন্ ভাইয়া

www.pathagar.com

ভাইয়া ধোতিয়া লেওনা খোটিয়াই
ধোতিয়া ধুমিল্ হই যাই।
আইসন ধোতিয়া বহিনা নিতি উঠি পাইবো।
বহিনা আইসন সজন কাঁহা পাইবো?
ধোতিয়া ধোয়াইব বহিনা ধোবিয়াকে পাট পর।
বহিন আইসন সজনা কাঁহা পাইব।

শিব পূজার গীত

১

রাউর মেলা গজবকি খেলা (২)
নাহি সহিব ঝামেলা এ ভোলা (২)
ভইলে আধিকা বাউর-ই লইকা (২)
সব গওয়া কহেলা এ ভোলা (২)
রাওয়া তো ভাঙ্গ খাই ধুইয়া রসাই
সবদেখেলা চেলা এভোলা (২)
কহে নিশাচে যওন রাওয়া সে বাচে (২)
ভর ঘরওয়া পিয়েলা এ ভোলা (২)
রাউর মেলা ... নাহি সহব (২)
ভাঙ্গকে রক্ষা সে হোকে উমঙ্গমে
খুটা বস হ তুরেলা এ ভোলা (২)
মোরয়া না মানে মুসয়ে পে ফানে (২)
দেখি জিওয়া ডরেলা এ ভোলা (২)
রাউর মেলা ... নাহি সহব (২)
রাউর গণেশ ওর কার্তিক ললন উয়া
পাহি কইল শুনেলা এ ভোলা (২)
বউয়েকে দেখে হরদম নিরেখে (২)
রাউর অসর পড়েলা এ ভোলা (২)
রাউর মেরা... নাহি সইব...
ভইলে অধিক।
রাউর ই লইকা
সব গাওয়া কহেলা এভোলা।
বাবাকে বাবাকে
বাবাকে চওকট চুমকে নাচন দে মাহে
ঝুম ঝুম ঝুমকে (২)
বুড়া নাচে বুড়ি নাচে, মাইকে সঙ্গমে লইকা নাচে (২)

পাঁচ পণ্ডা নাচে ঝুমকে,
নাচন দে মাহে ঝুম ঝুমকে

www.pathagar.com

ব্রহ্মাজি নাচে, বিষ্ণুজি নাচে, নারদ বাবা পাতিজি নাচে (২)

সবে নাচে বল্ বম বম শুনকে
নাচন দে মাহে ঝুম ঝুম কে।
ভলে বাবা কে কয় দরসনিয়া সনি।
সুমন গৌরী ভইলে নচনিয়া (২)
সব বলে জয় জয় চুমকে
নাচন দে মাহে, ঝুম ঝুমকে।
বাবা কে বাবাকে
বাবাকে ওকট চুমকে নাচন দে মাহে
ঝুম ঝুমকে (২)

২

আই যাইতু তো মইয়া আই যইতুহো,
হমরো ঘরে আই সই তু হো (২)
হে মাইয়া মোরি... (২)
সেওকা তহরো সহেলা ডহরিয়া বঘরিয়া
হমরো শুন লাগে হো... (২)
গবরা সে আঙ্গানা লিপওলে বানি,
চৌকা পুরওলে বানি হো (২)
হে মাইয়া মোরি (২)
হে মাইয়া মোরি কেওড়া ছিড়িকলে বানি হো
বারিয়া বখরিয়া হমরো শুন লাগে হো (২)
লালি লালি পুড়িয়া পকওলে বানি,
হলুয়া বনওলে বালি হো (২)
হে মইয়া মোরি, হে মইয়া মোরি
হে মইয়া মোরি ঘোগুরি বাতাসা আউরি
ধরিয়া বখরিয়া হমরো শুন লাগে হো (২)
অড়হল কা ফুলয়া মঙ্গওলে বানি;
গজরা বানওলে বানি হো (২)
হে মইয়া মোরি (২)
হে মাইয়া মোরি ভরি দা না উমা কো অসরিয়া
বসরিয়া হমরো শুন লাগে হো (২)
আই যইতু হো (২)
হে মইয়া মোরি (২)
সেওকা তহরো সহেলা ডহারিয়া, বখরিয়া
হমরো শুন লাগে হো (২)

www.pathagar.com

৩

উচে জঙ্গল পাহাড় লাগে গরমি জড়
কইসে সহেলু হো।
মাই হমনি সে দুর কাঁহা রহেলু হো (২)
অতনা বেটা কে বাড়ু এগো মহতরিয়া
হটকে রহেলু মায়ি কউনি নগরিয়া (২)
দে কে এতনা দুলার কাহে দেলু তু বিসারে
নাহি কহেলু হো।
মায়ি হমনি সে দুর কাঁহা রহেলু হো
কেঁহুসে কহি কেঁহু নহি বতলায়ে, রহেলু তু কাহা
কেঁহু নাহি পৌছায়ে (২)
অতনা নিচে নিচে খায়ি, অতনা উচেরে চড়াই
কইসে চড়েলু হো।
মাই হমনি সে দুর কঁহা রহেলু হ
সাল ভরমে দুইয়ে বেরা কাহে তু
মমতা লুটাকে ঢের খুব ফুসলাইয়ো (২)
হম পুঁজি একবার, দুইয়ে দিনকে দুলার
কাহেঁ করেলু হো
মায়ি হমনি সে দূর কাহা রহেলু হো।

৪

ঝুরু ঝুরু নিমিয়া গাছিয়া রহে ঝিহিরাইকে
ঝুলতাড়ে সাতারে বহিনিয়া ঝুলুয়া লগাইকে (২)
ঝুলত ঝুলত মাইকে লগলি পিয়া সিয়া হো
চলিদিহলি ঘরে যঁহা মালিন সেবাকিয়া হো।
কেনে তেনে বড়েরে মলি নিয়া পনিয়া পিয়াইদে
ঝুলতাড়ে সাতেরে বহিনিয়া ঝুলুয়া লগাইকে।
কই সে কে পনিয়া পিয়াই মরি মইয়া হো
গদি মে হোরি লউয়া বাড়ে লাগেনা উপইয়া হো
সনকে খটলবা আপন বলকা শুতাইদে
কেনেতেনে হু বাড়ে রে মলি নিয়া পনিয়া পিয়াইদে
ঝুলতাড়ে সাতরে বহিনিয়া ঝুলুয়া লগাইকে।
বড় ভাগ মইয়া রাউয়া, অইনি অংগনউয়া হো
একটক দেখে মলিনিয়া হো করিসে না
নয়ন উয়া হো।
গঙ্গজুড় পানিয়া দিসালী মলিনলে আইকে
ঝুলতাড়ে সাতরে বহিনিয়া ঝুলুয়া লগাইকে

www.pathagar.com

জইসে মলিন অজু হমকে জুড়বলু হো
শীতল ঠাইয়া জুড় পানিয়া পিয়বলু হো।
গাওয়া নগরিয়া তোহার জিয়ে হর সাইকে
ঝুলতাড়ে সাতরে বহিনিয়া ঝুলুয়া লাগাইকে
ঝুরু ঝুরু নিমিয়া... ঝুলুয়া লগাইকে (২)

৫

ধন্য ভবানি বিন্দ বাসিনি (২)
মহিমা রাউত অপরম পায়
হাথমে ত্রিশুল অভালা
লিহলে হাত কাল ওলওয়াল (২)
ছপছপ মাথ উতারে (২)
দুষ্টনকে কইলি সংহার।
মন্দির পে বা লাল পাতা কা
অখিয়ন সে বরসে অঙ্গার।
হাতমে ত্রিশুল।
দুনিয়া ভরকে লোগ কহেলা (২)
যায়িকে সচ্চা দরবার।
জগমগ দিপজলে চৌকট পর
ঋণে ভৈ রোজি হেঁ রঘবার (২)
মর গয়নি হম অরজ শুনাকে (২)
বিন্দ বাসিনি কে দরবার।
গাওনগরকে তামা সই সইকে
জিয়ল ভইল বড়া ধুসবার
ধনদৌলত কোছউনা চাহি (২)
কয়দা অঙ্গনা কে উজিয়ার
নওরাতর সব আই মাইয়া
অলস জগাইব বারম বার (২)
ধন্য ভবানি কিদ বাসিনি (২)
মহিমা রাউর অপরমপার
হাথমে ত্রিশুল আভালা
লিহাল হাতভাল তলওয়াল (২)[৪১]

ভর গোষ্ঠীর গান

জবসে বসে সইয়া হুমরো গইলে পরদেশিয়া
উদাস লাগে জীয়ারা হমরো করহো অইয়ানা
সইয়া হমরো পুলিশকে নকব্রীয়া ॥
মাথা মে টুপিটা সঙে

www.pathagar.com

কাঁধে মে বনদুকিয়া
উদাস লাগে জীয়ারা হমরো
কহহো অইয়া না ॥
সইয়া হমরো সোওত রইলা মখমলকে বিছানা
আরী বাতে সইয়া হমবো
ধরে না দুনো ছাতিয়া
উদাশ লাগে জীয়ারা হামরো
ভাবার্থ :
সাথি বিদেশ চলে গেছে
উদাস মনে অপেক্ষা করছে
সাথি পুলিশে ঢাকরি করে
মাথায় সুন্দর টুপি কাঁধে বন্দুক
উদাস লাগে
সাথি নরম বিছানায় ঘুমাত
অর্ধেক রাত্রে আমার আমার
আমার হাত বুলিয়া আদর করল
উদাস লাগে।[৪২]

সাঁওতালদের বিয়ের গান

১
বাড়ে টলারে
বাপলা দেলালা
দুলমণি দং এনে

ভাবার্থ : একটি গ্রামে বিয়ে হচ্ছে। দুলমণি নামে নামে একটি মেয়ে ছেলেকে বলছে, চল বিয়েতে যাই।

২
মারাং বুরু চটরে
লেশার জম বুটারে
গিতি লি নি গো
জপি পি লিদিং গো
হো হো হিং কাং গো
আজ মে বিং কাং গো বাড়াই এ
মনে মনে তে মেধা জর।
ভাবার্থ : মারাং বুরু মানে টিলার উপরে
ঘুমিয়ে আছে। মা ডাকছে ছেলেকে
ছেলে ডাক শুনছে। মনে পড়ছে তার
আঘাতের কথা তাই কাঁদছে।[৪৩]

www.pathagar.com

৩
চল দিলি আসাম যাব
দেশে বড় দুঃখরে
আসাম দেশেরে যিনি চাবাগান হরিহর
টহর মারা যেমন তেমন
পাতা তোরা কামরে
হায় যদুরাম ফাঁকি দিয়া
পালাইলি আসাম
এক পয়সার পুঁটি মাছ
কায়া গলা তেলা গো
মিনির বাপ মাগে যদি
আরও দিব ঝুল গো
সর্দার বলে কাম কাম
বাবু বলে ধরে আন
সাহেব বলে লিব
পিঠের চাম রে চতুরাম ॥

ভাবার্থ : এই গানটি ঝাড়খণ্ড ভাষার। এখানে মিনি নামীয় কন্যাকে তার মাতা বলেছে এখানে চা-পাতা তোলার দুঃখ আছে। আসাম দেশে চা-পাতা হরিৎ বা সবুজ ভালো। যদুরাম তাকে না বলে ফাঁকি দিয়ে আসাম চলে গেছে।

এখানে সংসারের নিত্যদিনের কথাও হচ্ছে। বাজার থেকে মিনির বাপ যে পুঁটি মাছ এনেছে তাতে আরও ঝুল দিতে হলে দেওয়া হবে। পরবাসের দুঃখে জ্বালা মনে উঠেছে, এখানে বাবু সর্দারদের জ্বালাতন এমনকি নির্যাতন আছে। সর্দার বাবু সাহেব হয়ে শ্রমিকের পিঠের খাল তুলে নিয়ে যায়। এই গানের ভেতর দিয়ে উপনিবেশিক বর্ণনা ভারতে চা-শ্রমিকদের জীবনকাহিনির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৪৪]

খ. গাথা

মৌলভীবাজার জেলায় গাথা-গীতিকার প্রচলন ছিল। এখন এসব গাথা-গীতিকা আর গাওয়া হয় না। তবে মৌলভীবাজার জেলায় স্ত্রীর হাতে কটু মিয়ার করুণ মৃত্যু ও তরুণ জমিদার আলী আমজাদ জমিদারের অকালমৃত্যুকে কেন্দ্র করে রচিত দুটো গীতিকা এক সময় খুবই জনপ্রিয় ছিল।

কটু মিয়ার গাথা/গান

কটু মিয়ার বাড়ি ছিল রাজনগর উপজেলার বালিদিঘি গ্রামে। তিনি বিয়ে করেছিলেন কুলাউড়া উপজেলার লংলা পরগনায়। করিমুন্নেছা তার স্ত্রীর নাম। করিমুন্নেছা তার 'লাং' বা গোপন উপপতি পাওয়ার আশায় কটু মিয়াকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সে ঘটনা আঠারো শতকের শেষ দিকের। পরিণতিতে করিমুন্নেছার ফাঁসি হয়। কটু মিয়ার মৃত্যুতে তার মায়ের বিলাপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কটু মিয়ার গীতিকা। আগে

www.pathagar.com

ভিক্ষুকরা এই গান গেয়ে ভিক্ষা করতেন। অনেক চেষ্টা করেও এই গীতিকা সম্পূর্ণ সংগ্রহ করা যায়নি।

কাউকাপন তেরাপাশা মনু ৩ বার পাড়ি
চান্দ জন্ম উদয় হইলা গজম্বর আলীর বাড়ি
ইটায় থাকেন কটু মিয়া লংলায় করলা বিয়া
বড় সাধ ছিল মিয়ার লংলা দেখত্যা গিয়া
অকাল কান্দন মায়ে দেওয়ান কটু মিয়ার লাগি
করিমুন্নেছা গো মনের সাধ পুরাইলায়নি।
বিবি যে গিছিলা মাগো রইতা[১] কতদিন
ভাতও যেন রান্ধ মাগো না কাটিও ফেনা
শ্বশুরবাড়ি দামান্দ যাইতে না করিও মানা
অকাল কান্দে মায়ে কটু মিয়ার লাগি
শ্বশুরবাড়ি যাইতে মানা করি না
স্ত্রী, ঘোড়া, জানের[২] বৈরী আপন জানিও না
দানাপানি খাইয়া মিয়ারে মুখে দিলা পান
ঘরতো বারইলা[৩] যেন পূর্ণিমারই চান
অকাল কান্দইন মায়ে কটু মিয়া
ঘরতো বারইতে মিয়ারে আলীয়ে[৪] টিক টিক করে
মায়ে বলে আরে বাবা যাইও না লংলা শহরে
অকাল কান্দে দেওয়ান কটু মিয়ার লাগি
ঘোড়িয়াতে উঠিয়া মিয়া, ঘোড়িয়া[৫] মারে হ্যছি
মায়ে বলে আরে বাবা না যাইও লংলাতে
অকাল কান্দে মায়ের দেওয়ান কটু মিয়ার লাগি
মানা না মানিলা মায়ের রে
ঘোড়ায় চাবুক মারে
আর কতখানি গিয়া দেখেন
কাল নাগে বাইছালি[৬] খেলে
রাত্রিকালে মায়ে স্বপ্নে দেখিলা রে
হাতি মানুষ মারে।
অকাল কান্দেন মায়ে দেওয়ান কটু মিয়ার লাগি
ঘোড়িয়া মারি যান মিয়া বারো টঙ্গির আগে
দাসী-বান্দি খবর দিলা করিমুন্নেছা আগে।
ইটারও মিয়া আইছন বারো টঙ্গির ঘরে
জলদি করি যাও দাসী আন আন্দোর মহলে[৭]
আন্দোর মহলে গিয়া সাহেব পানি মাঙ্গিলা
ঘোলপানি দেখিয়া মিয়ায় উজরও[৮] করিলা
ইহা দিঘির পানি মিয়ারে দুধের বরাবর

www.pathagar.com

পিয়াসে পিলাও পানি না কর উজর।
বিছমিল্লাহ না বলিয়া পানি খাইলা
কি পানি খাওয়াইলায় বোনগো কলিজা যায় জ্বলিয়া
মায়ের নিষেধ না মানিয়া আসিলাম লংলায়
চার গুণ্ডা আসিয়া তার কোমরে মারিলা বাড়ি[৯]
ঢলিয়া পড়িলা মিয়া মহল ঘরের ধারী
গলাতে ছিয়া[১০] পালাইয়া মিয়ারে তিন জনে দিলা ভর
কটু মিয়ার মউত হইল জুলুমের উপর।
অকাল কান্দেন মায়ে দেওয়ান কটু মিয়ার লাগি
খবরউলি খবর পাঠাইলা গজম্বর আলী আগে
ইটার মিয়া আইছিলা মরছইন মহল ঘরে।
সেই কথা শুনিয়া গজম্বরে মাথায় মারে হাত
কলংক বানাইলায় মোরে দুনিয়াত।
রাত্রি না পুয়াইলে কাউয়ায় [১১] ছাড়ল রাও
কটু মিয়ার মউতের খবর ইটায় লইয়া যাও।
খালি ঘোড়ার লাগাম ছাড়া পারেদি[১২] যায় হাটি
মায়ের পায়ে ঘোড়ায় করে ছাটাছাটি[১৩]
অকাল কান্দেন মায়ে দেওয়ান কটু মিয়া লাগি
বাজিদ জালুয়ার বাড়ি গিয়া ঘোড়া করে ছাটাছাটি
খবর উলিয়ে খবর দেয় কুটু মিয়ার বাড়ি
তোমারও কটু মিয়া মারা খাইছন করিমুন্নেছার বাড়ি
অকাল কান্দে মায়ে দেওয়ান কটু মিয়ার লাগি
গোরস্থানের পারে রাখে লাশ মায়ে দেখবার লাগি
কছম করে করিমুন্নেছা লাশের উপরে লিখে
এই লাশ যে খুলে দেখবে মাটি দিমু তারে।
নাকের উপর দাগ দেখিলা বাজিদ জালুয়া
মা পুত্রশোকে পড়িলা অজ্ঞানে।
কছমের মানা শুনিয়া বাজিদ জালয়া লাশের কাপন খুলিলা
ছলমলে[১৪] মানা করিলা লাশ কবর না দিতে
থানা পুলিশ ঘেরাও করিলা বাড়িতে।
করিমুন্নেছাকে সঙ্গে নিয়া গেলা কোট কাচারিতে
রায় পাইয়া করিমুন্নেছা আইলা ঘাটের উপরে
চার গুণ্ডাকে খাওয়ান পান-সুপারি বাড়ির ভিতর নিয়া
জজে হুকুম দিলা বান্দি রাখ চান্নিঘাটের পুলে
খুপা কাটি বিড়ম্বনা কর তারে

www.pathagar.com

নাই চাটি নাই মশারি সারারাত কাটাইলা চান্নিঘাটের উপরে।
এতবড় হইছিলাম আমি মাই বাপের ঘরে
তাজ্জব মানছি আমি মশার কামড়ে।[৪৫]

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. থাকবেন, অবস্থান করবেন, ২. প্রাণের, ৩. বাহির হলেন, ৪. টিকটিকি, ৫. ঘোড়া, ৬. জলক্রীড়া, ৭. অন্দরমহল, ৮. জিজ্ঞাসা করেন, ৯. লাঠির আঘাত, ১০. নাগেশ্বর গাছ দ্বারা নির্মিত বড় দণ্ড,১১. কাক, ১২. নদীর তীর দিয়ে, ১৩. ছটফট করা, ১৪. কৌশলে।

আলী আমজাদের গীতিকা

আলী আমজাদ কুলাউড়া পৃথিমপাশা এস্টেটের জমিদার ছিলেন। তার রহস্যজনক অকালমৃত্যুতে এই গীত গ্রামে-গঞ্জে গাওয়া হতো।

প্রথমে বন্দনা করি প্রভু নিরঞ্জন।
এ ত্রিভুবন হইল যাহারই সৃজন।
সিলেট জেলার লংলা পরগণা ভাইরে পৃথিমপাশা গ্রাম।
তথা ঘরে নবাব ছিলা আলী আমজাদ নাম
হায় রে কিবা শোভা মনো লোভা আহা মরি মরি
সোনারও চান যেন দুই নয়নে দেখি।
১২৬৬ সালে অগ্রহায়ণ মাসতে বৃহস্পতিবারে সোনার চান আইলা দুনিয়াতে।
মাতা-পিতা খুশি হইলা চান্দমুখ দেখিয়া।
আলী আমজাদ নামটি তার রাখিলা বাছিয়া।
৫ বছরের সাহেবজাদা যখনই হইলা
পিতা আলী আহমদ খান উপায়াত করিলা
৬ বছরে সাহেবজাদা যখনই হইলা
সিলট শহরে সাহেবরে মায়ে পড়িতে পাঠাইলা
মাস্টার সাহেব যখন জজ পদ পাইলা
সিলটও[১] হইতে সাহেব বাড়িতে আইলা।
তারপর মিয়া সাহেব বিপদে পড়িলা
মাতা উম্মরুননেছা বিবি উপায়াত করিলা
মুরব্বি বলিতে রেহানা রহিল আর
পাল্লাকান্দিতে রইল ফুফু আপনার
একদিন মিয়া পাত্রমিত্র লইয়া পরামর্শ করলা
বাড়িরও সামনে যেন দিঘি কাটাইবা
উৎসাহে মিয়া সাহেব খুশিতে ভরিলা
গৌরীপুরী কামলা আনি দিঘি কাটাইলা
তারপরে টাকা লইয়া কামলা আপন বাড়ি গেলা।
দিঘির চারিপারের কথা কি কইমু আর
চমৎকারই কান্দার[২] আছে দিঘির চারিপার।
পশ্চিম পারেতে সাহেব পছন্দ করিলা

www.pathagar.com

শানে বান্দাইল ঘাট দিলা বান্দাইয়া,
পূর্ব পার সাহেব পছন্দ করিলা
মুরব্বিগণের কবর পাকা করিলা,
উত্তর পারেতে সাহেব পছন্দ করিলা
বিজলীবাতির কল এক দিলা বসাইলা
মধ্য ইংরেজ স্কুল দিলা বসাইয়া,
ফুলেরও বাগান তাতে লাগাইলা
জবা, টগর কামিনী ফুল বছরে বছরে ক্ষেত করিবারে
হাতি ধরিয়া রাখছইন জেলখানার ভিতরে।
৪০ জন মাউথ ছিলা হাতিরও কারণে
৩০ টাকা করি পাইতা ডাক্তারও সৃজনে।
প্রতি বছর কলিকাতাতে যাইতা একবার
অজ-মক্কা কাহিনি তাতে দেখান খোদায়
কালেরও মাসেতে পড়ি কি করিব হায়।
বিছমিল্লাহ বলিয়া সাহেব করিলা গমন
তের ছালি ঘরে গিয়া দিলা দরশন
কই গেলায় বিবি সাহেবানী ঘরেতে বসিয়া
বিদায় দেওগো যাইতাম আমি কলিকাতা চলিয়া হায় রে...
কি শুনাইলায় ওরে সাহেব কি শুনাইলায় মোরে
উড়াইয়া বরছের ছেল[৩] মারিলায় পরাণে হায় রে।
শুন শুন ওগো বিবি মুই বলি তোমারে
এগু বেটা দিলা না আল্লায় জবানের দুষণে- হায় রে
রাইয়ত-বিলাত গো বিবি রাখিও যতনে
দুঃখ সাজা দিলে যাইবায় দোযকের ভিতরে হায় রে
পিন্দিলা ঝরির গো জোড়া[৪] মাতায় দিলা তাজ[৫]
ঘরতো বারইলা যেন পূর্ণিমারই চাঁদ হায় রে
মৌলানা মৌলভী কত সঙ্গীনা করিলা
মা বাপের কবর গেলা জিয়ারত করিতা হায় রে
কবরের কিনারায় কান্দনও জুড়িলা
এমনও সময় কালে মাইজি আমার কোথায় রহিলা হায় রে
আজ যদি মাইজি আমার দুনিয়া থাকিতা
গলায় ধরিয়া মায়ে রোদনও করিতা হায় রে
কবরের ধুলা নাকে- মুখে লাগাইলা
অতি রোদন করেন সাহেব মা মা বলিয়া- হায় রে
আমার মাইজি যখন জিন্দা ছিলা দুনিয়ার উপরে
খই ভিজাইয়া পানি দিছইন সব বেমারীরে[৬] হায় রে
এই সময় শিরের তাজ কবরে পড়িল

www.pathagar.com

আব্দুর নূর সাহেবরে ডাকি কইতে লাগিলা হায় রে
শুন শুন আব্দুর নূর সাহেব মুই বলি তোমারে
মউতের নিশানি আল্লায় দেখাইলা আমারে হায় রে
বিছমিল্লাহ বলিয়া সাহেব করিলা গমন
ফুফুর বাড়ি গিয়া সাহেব দিলা দরশন হায় রে
কি গো ফুফু সাহেবানী ঘরেতে বসিয়া
বিদায় দেও গো যাইতাম আমি কলিকাতা চলিয়া- হায় রে
কি শুনাইলায় ওরে বাবা কি শুনাইলায় মোরে
উড়াইয়া বরছের ছেল মারিলায় পরাণে- হায় রে।
ভাই-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলই খাইয়া
আমার জ্বালা-মুখ ঠাণ্ডা রাখছি বাবা তোমার চান্দ মুখ দেখিয়া- হায় রে।
বড় আশায় করছিলাম রে বাবা দুনিয়ার উপরে
এক মুঠো মাটি যেন দিবায়ও আমারে হায় রে,
মানা দিও না ফুফু সাহেবানী মানা দিও না তুমি
সপ্তাহ দিনের মধ্যে আমি আসিমু ফিরি হায় রে
যাও যাও ওরে বাবা কলিকাতা শহর
সপ্তাহ দিনের মধ্যে আইও আমি অভাগিনীর ঘর।
বিছমিল্লাহ বলিয়া সাহেব করিলা গমন
টিলাগাঁও ইস্টিশনে গিয়া দিলা দরশন- হায় রে
যেই ভালা[৭] নওয়াব সাহেব ইস্টিশনে পৌঁছিলা
পূর্ব সিলটে নবাব যত সকলি আসিলা হায় রে।
যাইও নারে সাহেব বাবু কলিকাতা চলিয়া
সামনের রবিবারে খেলাইতাম তোমারে লইয়া
মানা দিও না সাহেব বাবুরা মানা দিও না তোমরা
সামনের রবিবারে খেলাইমু আইয়া[৮] হায় রে
বিছমিল্লাহ বলিয়া সাহেব গাড়িতে উঠিলা
২৪ ঘন্টার ভিতরে কালিকাতা পাঁছিলা।
যেই বালা গো নবাব সাহেব কলিকাতা পৌঁছিলা
পেমটা আলী দুইজন রইছেন পথের বানে[৯] চাইয়া হায় রে।
যেই বালা গো নবাব সাহেব ঘরেতে বসিলা
দুই জনে দুই গ্লাস পানি সাহেবের হাতেতে দিলা
পানি খাইয়া সাহেব বিছানায় পড়িলা
ডাক্তার কবিরাজ আইয়া পরীক্ষা করিলা হায় রে
সকলে ডাকিয়া দেখেন নবাব সে তো নাই
বগুড়ার নবাব বলেন চক্ষু মেলে চাও হায় রে
হেকিম-ডাক্তার গো আসিয়া পরীক্ষা করিলা
আলী আমজাদ নবাব যেন দুনিয়া থেকে চলে গেলা হায় রে।[৪৬]

www.pathagar.com

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. সিলেট, ২. কিনার, ৩. লৌহ নির্মিত দেশীয় অস্ত্র, যা ছুঁড়ে মারা হয়, ৪. পোশাক, ৫. টুপি, ৬. রোগী, ৭. যেই সময়, ৮. এসে, ৯. দিকে।

তথ্যনির্দেশ

১. ভানুমতি মোহান্ত, গ্রাম : চাঁদগ্রাম, ইউনিয়ন : হাজীপুর, উপজেলা : কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ২০ সেপ্টেম্বর ২০১০

২. শৈলেন রায় রাখাল, পিতা : মৃত নলীনি রায়, গ্রাম : সৈয়ারপুর, মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১১

৩. আব্দুল কাদির, গ্রাম : নছরতপুর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ১১ অক্টোবর ২০১১

৪. মো. রফিক মিয়া (৬৫) কৃষক, গ্রাম : মহেশগৌরি, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ২০ নভেম্বর ২০১১

৫. ব্রজেন্দ্র শর্মা, গ্রাম : বিজলী, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ২২ নভেম্বর ২০১১

৬. বর্ণা দে, উত্তর ভবানীপুর, জুড়ী, সংগ্রহের তারিখ : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১১

৭. সতীশ শব্দকর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ৮ সেপ্টেম্বর ২০১১

৮. সতীশ শব্দকর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১

৯. রবাই শব্দকর, বালিটেকি, শ্রীনাথপুর, কমলগঞ্জ, সংগহের তারিখ : ২৭ জুন ২০১১

১০. শিউলী আচার্য্য, গাজীপুর চা-বাগান, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ৪ জানুয়ারি ২০১২

১১. বাদল শর্মা (৫৫), শিক্ষক, সাগরনাল, জুড়ী , সংগ্রহের তারিখ : ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

১২. শাহানা আক্তার, সোনা-রূপা চা বাগান, জুড়ী, সংগ্রহের তারিখ ২৮ আগস্ট ২০১২; শফিকুর রহমান, আমতৈল, খাদিপুর, কুলাউড়া

১৩. আব্দুল কাদির, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২৮ জুন ২০১১

১৪. মীর মো. বানু সরকার, গ্রাম : পশ্চিম গুড়াভূঁই, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১২

১৫. ক্ষিতিশ রঞ্জন, সংগ্রহের তারিখ : ১০ নভেম্বর ২০১২

১৬. শাহ দরবেশ আলী, গ্রাম : সিরাজনগর, ডাকঘর : নারায়ণছড়া, শ্রীমঙ্গল, সংগ্রহের তারিখ : ২৩ মার্চ ২০১১

১৭. আব্দুল কাদির, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২৮ জুন ২০১১

১৮. রাকেশ চন্দ্র সরকার, শ্রীমঙ্গল, সংগ্রহের তারিখ: ৫ নভেম্বর ২০১১

১৯. রবীন্দ্র কুমার দাশ, বেগমানপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ১১ নভেম্বও ২০১২

২০. জুয়েলী রানী সূত্রধর, হরিরামপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ২০ ডিসেম্বর ২০১১

২১. ব্রজেন্দ্র শর্মা, কীর্তনীয়া, বিজলী, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ ২০ এপ্রিল ২০১১; কুমুলচন্দ্র দে, উত্তর ভবানীপুর, জুড়ী, সংগ্রহের তারিখ : ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২; অজিত শর্মা, মশাজান, রাজনগর, সংগ্রহের তারিখ : ৪ জানুয়ারি ২০১২

২২. চেরাগ আলী, মুকুন্দপুর কুলাউড়া, মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১২

২৩. বেলা রাণী শর্মা ও রসেন্দ্র শর্মা,কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ১ মার্চ ২০১২

www.pathagar.com

২৪. পূরবী চক্রবর্তী, সৈয়ারপুর, মৌলভীবাজার সদর, সংগ্রহের তারিখ : ৩ মার্চ ২০১১
২৫. রেখা রানী শর্মা, মশাজান, রাজনগর, সংগ্রহের তারিখ : ২১ মার্চ ২০১২
২৬. ভানুমতি মোহান্ত, গ্রাম : চাঁদগ্রাম, ইউনিয়ন : হাজীপুর, উপজেলা : কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ১২ মে ২০১২
২৭. জাহানারা বেগম, গ্রাম : খুমিয়া, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ২২ জানুয়ারি ২০১১; পেয়ারুন নেছা, গ্রাম : মহেষগৌড়ি, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ২ মার্চ ২০১২; বেলারানী শর্মা, গ্রাম : গুতগুতি, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ৭ মার্চ ২০১২
২৮. মোঃ আব্দুস শাকুর, গ্রামঃ বোবারতল, উপজেলা : বড়লেখা, মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ২ জুলাই ২০১১
২৯. রমজান উল্যাহ, পিতাঃ মৃত শুকুর মুহাম্মদ, মাতাঃ মৃত মোছা. তরাজান বিবি, গ্রামঃ শ্রীনাথপুর, ডাক ও উপজেলাঃ কমলগঞ্জ, জেলাঃ মৌলভীবাজার, বয়স : ৭৭ বছর, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি
৩০. শৈলেন রায় রাখাল, সৈয়ারপুর, মৌলভীবাজার সদর, সংগ্রহের তারিখ : ১১ অক্টোবর ২০১১
৩১. রামকৃষ্ণ সরকার, শ্রীমঙ্গল, সংগ্রহের তারিখ : ২৫ ও ২৬ নভেম্বর ২০১২
৩২. জয়ন্ত পাল, কাঠালতলী, বড়লেখা, মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১
৩৩. শৈলেন রায় রাখাল, কাশীনাথ রোড, মৌলভীবাজার সদর, সংগ্রহের তারিখ : ৩০ মার্চ ২০১১
৩৪. শহীদুল ইসলাম সাইদ,কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২৫ জুন ২০১১
৩৫. আব্দুর রহমান, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২৮ জুন ২০১১
৩৬. ইউছুফ আলী, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২৭ নভেম্বর ২০১২
৩৭. রমজান বয়াতি, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ৯ নভেম্বর ২০১২
৩৮. রূপক গোস্বামী, ঢেউপাশা, মৌলভীবাজার সদর, সংগ্রহের তারিখ : ১ ফেব্রুয়ারি ২০১২
৩৯. উপেন্দ্র শব্দকর, মইডাইল, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ৪ ও ১৩ আগস্ট ২০১১
৪০. প্রতাপচন্দ্র সিংহ (অব. শিক্ষক, ৬২ বছর), গ্রাম : ভাণ্ডারী গ্রাম, কর্মদা ইউপি, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ২৬ ও ২৭ মার্চ ২০১২
৪১. রনজিৎ কুমার কানু, লংলা চা-বাগান, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২
৪২. রমেশ ভর, মাধবপুর চা-বাগান, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২০ নভেম্বর ২০১১
৪৩. লাল বাবু সরেন, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২০ নভেম্বর ২০১১
৪৪. রমাকান্ত ওয়ালা, আলীনগর চা-বাগান, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২২ নভেম্বর ২০১১
৪৫. অজিত শর্মা, গ্রাম : মশাজান, রাজনগর, মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১
৪৬. কবিয়াল রমজান আলী, হাশিমপুর, কর্মদা, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ২৩ নভেম্বর ২০১১

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া ও জুড়ি উপজেলার বহু লোকশিল্পী, গায়ক এবং বাদ্যকারের সাথে আলাপ করে জানা যায়, বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মতো এই জায়গায় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বহুমাত্রিক নয়। সাধারণ কতগুলো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ঢোল, মৃদঙ্গ, হারমনিয়াম, বেহালা, কাঁসার ঝাঁন (কাশিয়া), করতাল। বাঁশি, ডপকি, লাউ, একতারা, দোতারা, তবলা, খঞ্জনি, ঢাক, সানাই ইত্যাদির ব্যবহার কমে গেছে। স্থানীয়ভাবে কোনো বাদ্যযন্ত্র এই উপজেলায় তৈরি হয় না। কয়েকজন বাদ্যকার জানান, পূর্বে বাঁশি ও লাউ এবং একতারা কেউ কেউ বানাতেন কিন্তু বর্তমানে কোনো বাদ্যযন্ত্র তৈরি হয় না। লাউ-এর খোলের জন্য স্থানীয় 'পানি লাউ' গাছে পাকার পর সংরক্ষণ করা হয়। অথবা 'পাকা বন বেল' সংগ্রহ করে লাউয়ের খোল তৈরি হতো। কিন্তু আখড়ার সংখ্যা কমে যাওয়ায় লাউ-ডপকি বাজানো কমে এসেছে।[১] মৌলভীবাজার উপজেলার দিঘির পাড়ের খগেন্দ্র চন্দ্র ঋষি প্রায় ৪০ বছর যাবত মৃদঙ্গ, তবলা প্রভৃতি তৈরি ও মেরামতের কাজ করে আসছেন।

খাসিয়ারা মৃতদেহ সৎকারের সময় 'শারতী' বাঁশি নামে বিশেষ বাঁশি বাজিয়ে থাকে।[২]

মণিপুরীরা ধর্মীয় উৎসবে ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে থাকে। এর মধ্যে কাঠের তৈরি পুং (মৃদঙ্গের মতো), মন্দিলা, তৌদ্রি (বাঁশি), মোইবুং, শেল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৩]

ঢোলের ছবি

তথ্যনির্দেশ

১. কবি শহীদ সাগ্নিক, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২২ জানুয়ারি ২০১১
২. পিটিশন, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২০ জুন ২০১১
৩. হাম্মো তনু বাবু, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২৩ নভেম্বর ২০১২

www.pathagar.com

লোকউৎসব

মৌলভীবাজার জেলায় বারো মাসে তেরো পার্বণের মতো লোকউৎসব হয়। হিন্দু-মুসলিম উভয়ের সম্মিলিত কিছু উৎসব আছে, তাছাড়া রয়েছে আলাদা ধর্মীয় উৎসব। এসব উৎসব সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে। উৎসবের সন্নিকটে অস্থায়ী দোকান বসে। হাজার-হাজার মানুষের পদভারে ভরে ওঠে উৎসবস্থল। বহু বছর থেকে কিছু উৎসব চলে আসছে, যেমন রাখাল শাহের ওরস ও মেলা। এখনো কেউ জানে না তার আদি উৎস। যেমন লালবাগের বারুণী মেলা বা বান্নি খুবই প্রাচীন। প্রতিটি উৎসবে মেলা থাকে দুই থেকে তিন দিন পর্যন্ত। নিম্নে প্রচলিত কয়েকটি লোকউৎসবের বিবরণ দেওয়া হলো।

১. শারদীয় দুর্গোৎসব

শারদীয় উৎসবে মৌলভীবাজার সরব হয়ে ওঠে। ঢাক-ঢোল-কাঁসার বাদ্যযন্ত্রে চার দিন প্রতিটি জনপদ উৎসবমুখর থাকে। প্রতিটি মণ্ডপ ঘিরে চার-পাঁচ দিনের মেলা বসে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, মেলাতে বসা দোকানের মালিক অধিকাংশই মুসলিম। মুসলিম গ্রামবাসীরাও মেলায় ছুটে আসেন। পূজার তিন-চার দিন হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে পূজামণ্ডপে ও মেলায়। কোনো হিন্দু পরিবার ঘরে বসে থাকে না। নতুন পোশাক পরে আনন্দ-উল্লাসে তারা পূজা দেখতে যান। প্রতিটি চা-বাগানে পূজা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কুলাউড়ার কাদিপুর গ্রামে সবচেয়ে বড় দুর্গোৎসব হয়ে থাকে। সেখানে লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে বলে জানা যায়। প্রচুর দোকানপাট বসে। বিভিন্ন বাড়িতে ব্যক্তিগত ও গ্রামে সর্বজনীন পূজা হয়ে থাকে। সে সব স্থানেও আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। প্রগতিশীল প্রান্তিক সমাজের মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে আনন্দে শরিক হন। দুর্গাপূজায় মহিলারা দুর্গার দুঃখময় জীবনের গান গেয়ে থাকেন।

২. পৌষ-পার্বণ

পৌষ মাসের শেষ দিন এই পার্বণ উদ্‌যাপিত হয়। কৃষাণীরা পার্বণের প্রায় ১৫ দিন আগে থেকে ঘর পরিষ্কার করেন। পার্বণের আগের দিন বাজারে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলিম উভয়েই প্রচুর মাছ কেনে। পরদিন কৃষাণীরা নানা ধরনের পিঠা তৈরি করেন। প্রতিটি পরিবারে আনন্দের ধুম পড়ে যায়। সারা মাস কৃষক-সন্তানরা ধানীমাঠ থেকে ধানের নাড়া সংগ্রহ করে বুড়ির ঘর তৈরি করে, সেটার মধ্যে মুলিবাঁশ দেওয়া হয়। একে কেউ বলে ভেড়াঘর, কেউ বলে ভেড়া-ভেড়ি। পার্বণের দিন ভোরবেলা হিন্দু পরিবারের পুরুষশিশুরা স্নান করে ভেড়াঘরে আগুন লাগায়। আগুন জ্বলে উঠলে মুলিবাঁশ বিকট শব্দ করে ফুটে উঠে, তখন সবাই আনন্দে হৈ হৈ বলে চিৎকার করে ওঠে। পৌষ-পার্বণের সারা দিন লোকজন আনন্দে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়ায় এবং

www.pathagar.com

পিঠা ও তিলুয়া দ্বারা আপ্যায়িত হয়। পৌষ-পার্বণের ঐতিহ্যকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এখনও ধরে রেখেছেন।

৩. রাখাল শাহের আসন বা তলা বা ডের

রাখাল শা লৌকিক পির কি-না তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। এই নামে আরও মাজার পাওয়া যায়। রাখাল শা নিয়ে বহু কিংবদন্তি আছে। হাকালুকি হাওরের লোকসমাজের রক্ষক হিসেবে যেন তিনি আবির্ভূত। বিশাল হাওরের জলাভূমির মধ্যে কোথাও একটু স্থলভাগ নেই। কেবল একটি উঁচু ডিবি বা টিলা দেখা যায়। সেটাকে রাখাল শা'র ডের বা ডিবি বলা হয়। হাওরে কাজ করতে এসে কৃষক, রাখালরা অথবা মাঝিরা ঐ ডিবির মধ্যস্থ গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। মানুষ বিপদে পড়লে রাখাল শাহের দোহাই দেয়। মদনগৌরী গ্রামের ফাতেহা বেগম (৮৫) বলেন, তিনি দেখেছেন রাখাল শাহ উৎসবে ১০০/১৫০ জন পাগল লোক এসে জড়ো হতেন। বিভিন্ন মানত করে মানুষ ঐ ডিবিতে মাটি দেয়। সেটা মদনগৌরী গ্রাম থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে হাওরে অবস্থিত। বর্তমানে রাখাল শাহের মাজারে খড়ম ও মন্দিরা রয়েছে। এগুলো ধুয়ে পানি পান করে অনেক নিঃসন্তান দম্পতির সন্তান হয়েছে বলে শোনা যায়। রাখাল শার ওপর হিন্দু-মুসলমানদের অগাধ বিশ্বাস। তার ডের বা ডিবি হাওরের মধ্যে মানুষের আশ্রয়স্থল। সম্ভবত তিনি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে ভাসান পানির মধ্যে এই ডিবি তৈরি করেছিলেন। রাখাল শার মৃত্যুর পরও তাকে বাঘে চড়ে হাওরের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে অনেক লোকজন দেখেছেন। প্রতি বছর পাঁচ ফাল্গুন তার মাজারে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। শত শত লোকজন সে ওরসে যোগদান করেন। ধারণা ধরা হয় ২৫০ বছর পূর্বে রাখাল শাহ মারা যান।[১]

কুলাউড়াস্থ হাকালুকি হাওরের মধ্যে রাখাল শাহের ডের বা থলা

www.pathagar.com

৪. রাখালতলা ও ভৈরবতলার উৎসব

মৌলভীবাজার জেলায় অনার্য সংস্কৃতির অনেক তথ্য জীবন্ত পাওয়া যায়। শাস্ত্র এবং উপাসনালয় অপেক্ষা গাছতলার নিচে গিয়ে লৌকিক পূজাপার্বণ ও আচার-বিশ্বাসে বিশ্বাসী লোকজনকে বেশি দেখা যায় (সম্প্রতি লোকচার ও বিশ্বাস কমে আসছে)। এ এলাকায় শাস্ত্রের কৃষ্ণের চেয়ে লৌকিক রাখাল কৃষ্ণ গ্রামসমাজে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া ও জুড়ির বহু গ্রামে গাছের নিচে রাখালতলা দেখা যায়। আবার এ অঞ্চল শৈবতান্ত্রিকদের দ্বারা প্রভাবিত থাকায় বহু স্থানে ভৈরবতলা গড়ে ওঠেছে। রাখালতলা ও ভৈরবতলায় মাঝে মধ্যে কীর্তন হয়ে থাকে এবং বাতাসা বা নকুলদানা দিয়ে 'লুট'ও হয় কিন্তু মেলা বসে না। কয়েক ঘণ্টার জন্য গান-বাজনার উৎসব হয়ে থাকে।

কুলাউড়া ও জুড়ি উপজেলার প্রত্যন্ত কিছু গ্রামে ত্রি-নাথের গাজনসেবা হয়ে থাকে।

গাঞ্জার চিরল চিরল পাত
গাইঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে হে
নাচে ভোলানাথ।

এই গান খুবই জনপ্রিয়।

৫. ওরস

মৌলভীবাজার, রাজনগর, বড়লেখা, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া ও জুড়ি উপজেলায় বহু মাজার, দরগা, খানকা বা হাউলী রয়েছে। এইগুলো হিন্দু-মুসলিম উভয়েই শ্রদ্ধা করেন। মানত করে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। পুরাতন মাজারগুলো নির্জন ও লোকালয় থেকে দূরে অবস্থিত। প্রায় সব মাজারেই 'খাদেম' রয়েছেন। তারাই মাজারগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করেন ও বার্ষিক 'ওরস'-এর আয়োজন করেন। সন্ধ্যার সময় মাজারে মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালানোর কাজ 'খাদেমরা' স্বেচ্ছায় করে থাকেন। অনেক মাজারে শরিয়তপন্থীরা কমিটিতে আসার পর দেখা যায় তারা মাজারে নর-নারীর একত্রে গান ও নাচ করতে বাধা দিচ্ছেন এবং ওয়াজ হওয়ার পক্ষে থাকেন। মাজারে বার্ষিক উৎসবের সময় বহু জায়গা থেকে ভক্ত আশেকানরা এসে কাফেলা বানিয়ে মারফতি, মুর্শিদি, বাউলগান পরিবেশন করেন। সাধারণ কৃষিজীবী, নিম্ন আয়ের পরিবার ও ভাসমান অসহায় পরিবারের লোকজনকে মাজারে বেশি আসতে দেখা যায়। গ্রামের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে মাজারে গিয়ে থাকেন। ওরস উপলক্ষে মাজারের আশপাশে অস্থায়ী দোকান বসে। মোমবাতি-আগরবাতি, শিশুদের খেলনা, মহিলাদের বেশভূষণের দ্রব্যাদি ও খাবারের দোকান উৎসবকে জীবন্ত করে তোলে। মাজারের পিরসাহেবকে সবাই শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁর সম্পর্কে কিংবদন্তি লোকমুখে আলোচিত হয়। ওরসকে কেন্দ্র করে লোকউৎসব চলে কুলাউড়া ও জুড়ি উপজেলায়। উল্লেখ্য, ওরস উপলক্ষ্যে কোনো আশেকান, ভক্ত ও দোকানীকে নিমন্ত্রণ দিতে হয় না। আপন তাগিদ থেকে ভক্ত-শিষ্য বা আশেকানরা ছুটে আসেন মাজারে।

মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় মাজার রয়েছে। এসব মাজারকে কেন্দ্র করে প্রতি বৎসর ওরস পালিত হয়ে থাকে। মনা শাহ, কমলগঞ্জ; মফিজ শাহ,

www.pathagar.com

শমসেরনগর; জালাল শাহ, আদমপুর; জাহাঙ্গীর শাহ, আদমপুর; চান মিয়া, আদমপুর; কালা শাহ, শমসেরনগর; মকদ্দছুশ শাহ, ঠাণ্ডা শাহ, আদমপুর; ইয়াসিন শাহ, শমসেরনগর; সৈয়দ নিমাত্রা শাহ, কুলাউড়া; সৈয়দ রফাসত আলী, বালিকান্দি, মৌলভীবাজার; সরদার শাহ, টেংরাবাজার, রাজনগর; সর্বোপরি হযরত শাহ মোস্তফা (র.) মৌলভীবাজার-এর ওরসে লোকে লোকারণ্য হয় এবং মেলা বসে।

কুলাউড়ার লক্ষ্মীপুর চা-বাগানের পশ্চিম প্রান্তের জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে পাঁচপীরের মাজার ও শা-গাজির মোকাম। এলাকাবাসী খুবই সম্মানের চোখে এই মাজার ও মোকামকে দেখেন। ওরসের সময় সারারাত ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে এলাকা সরগরম হয়ে ওঠে। কুলাউড়া উপজেলার বরমচালের (শ্রীপুর) শাহ কালার মোকাম, বিজয়া চা-বাগান পাঁচপীরের মোকাম, জ্বালাই পাহাড়ে বিবির মোকাম, রাজকী পাহাড়ের আদাআদির মোকাম, ব্রাহ্মণ বাজারের মামুপিরের মাজার, পূর্ব জালালাবাদের ছনু শাহের মাজারে রয়েছে সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও ভক্তি। ওরসের সময় বা বার্ষিক উৎসবের সময় লোকজন ছুটে যায় তাদের প্রিয় পির সাহেবের মাজারে। যেখানে নারী-পুরুষ একাকার এবং বাউলগানের মাধ্যমে আশেকানরা মাসুকের প্রেমাকাঙ্ক্ষী হয়ে সারারাত ঝুরে মরেন। ওরসের মেলার মধ্যে হাজার-হাজার লোক কেনা-বেচা করেন। জুড়ি উপজেলার উত্তর-ভবানীপুরের পাঁচ পিরের মাজার, রত্না চা-বাগানের জীবনজ্যোতির মোকাম, ফুলতলার নিমাত্রা শাহের মাজার, জুড়ীর রাখাল শার মাজার এবং সোনারূপার চা-বাগানের নিকটবর্তী ভোতাই শাহের (জাবেদ আলী) মাজারের ওরসে ভক্ত, আশেকানরা মরমিগান পরিবেশন করেন। ঢোল-ডপকি-একতারা বাজিয়ে গান চলে। বিশেষত দীন ভবানন্দ, রাধারমণ, হাসন রাজা, দুর্বিন শাহ, ইয়াছিন শাহ, বাউল করিমের গানের মাধ্যমে ভক্তরা তাদের প্রাণের বেদনা প্রকাশ করেন।[২]

৬. আশুরা উৎসব

দক্ষিণ কুলাউড়ার রবির বাজারে শিয়া সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব হচ্ছে আশুরার তাজিয়া মিছিল ও মেলা। শত শত শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন নিজের শরীরে চাবুক মেরে রক্ত ঝরিয়ে থাকেন। শত শত তাজিয়া নিয়ে হাতি দ্বারা মিছিল হয়। সুন্নিরা জারি কুটেন। আশুরা উপলক্ষে রবিরবাজারের দক্ষিণ মাঠে মেলা বসে। মেলায় দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রী এবং শৌখিন দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।[৩]

৭. মণিপুরী রাস উৎসব

কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, জুড়ী, কুলাউড়া উপজেলার মণিপুরীদের প্রধান ও বিখ্যাত উৎসব হচ্ছে রাস উৎসব, যা রাসলীলা নামে পরিচিত। মণিপুর যুদ্ধের কারণে স্বভূমি থেকে মণিপুরীরা উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন ঠিকই কিন্তু স্বভূমির ধর্ম-সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক পরিচয় থেকে তারা কখনোই নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখেননি। উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান নিয়ে মণিপুরীরা তাদের বংশপরম্পরায় বিভিন্ন ধর্ম-সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রতি বছর রাসপূর্ণিমার তিথিতে তাদের রাস উৎসব অব্যাহত রেখেছেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে বাংলাদেশের সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ জেলায় বসতি স্থাপনকারী মণিপুরীরা আজ থেকে

www.pathagar.com

প্রায় দেড় শতাধিক বছর পূর্বে ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম এই দেশে তাদের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রধান উৎসব রাসলীলার সূচনা করেন। রস থেকে রাস কথাটির উৎপত্তি আর রস আস্বাদনের জন্য পালিত হয় বলে এর এরূপ নামকরণ হয়েছে। বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক রাসলীলার অনুকরণে রাসমেলা হয়ে থাকে। রাসমেলার প্রধান দিক হলো চিরাচরিত মণিপুরী পোশাকে শিশুদের রাখালনাচ ও তরুণীদের রাসনৃত্য। দেশ-বিদেশ থেকে আগত বহু দর্শনার্থীর ভিড়ে এ এলাকা তখন মহোৎসবে পরিণত হয়। রাস উৎসবে সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান হয় কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুর ও আদমপুর নামক স্থানে।

৮. রথযাত্রা

হিন্দুদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এতে রথের উপর দেবতাদের মূর্তি স্থাপন করে রথ চালানো হয়। মণিপুরীরা প্রতি বছর আড়ম্বরে রথযাত্রা উৎসব পালন করে থাকে। রথযাত্রা অনুষ্ঠান কমলগঞ্জ উপজেলার কালারায় বিল, দেবীপুর, মাধবপুরে হয়ে থাকে।

এই রথযাত্রার মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ এই লীলা করেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা থেকে কুরুক্ষেত্রে আসেন সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যকুণ্ডে স্নান করতে আসেন। এ সময় বৃন্দাবন থেকে এগারোশো গোপিনীসহ যশোদা বাড়ি আসেন। ষোলোশো গোপিনী যার প্রধান রুক্মিণী। কৃষ্ণ বলরামসহ নগরকীর্তনের ছলে যশোদাকে রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করে জানতে চান রাধা প্রেমলীলার স্বরূপ কি– তিনি বলতে না চাইলে তার পাপাচারীতে যশোদা দ্বাররক্ষী হিসেবে সুভদ্রাকে রেখে তিনি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনা দিতে থাকেন। তার এ বর্ণনায় গীত আবেগ হিল্লোলিত হয়ে এমন এক মোহনীয় সময় তৈরি করে যাতে বহির্জগতের কান হারিয়ে ফেলেন। এসময় নগর প্রদক্ষিণ শেষে কৃষ্ণ এসে হাজির হলে যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপস্থিতি টের পাননি। এ সময় প্রেমের বিস্ময়াভিভূত রূপ ধরে রাখার জন্য পুরীধামে এই প্রেমের রূপ নিহিত রাখা হয়। এটা হয় জগন্নাথের রথযাত্রা। দ্বারকা থেকে বৃন্দাবনে রথে চড়ে যে যাত্রা হয় তাই রথযাত্রা হিসেবে ভক্তরা মেনে চলেন। এভাবেই এই জগন্নাথের রথযাত্রা হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বিরাট চাকাধারী রথ টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। রথের উপরে ভক্তরা থাকেন, তার নীচে দল বেঁধে লোকজন টেনে নিয়ে চলেন নির্দিষ্ট পথে। গীত অনুষ্ঠান চলতে থাকে। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এই রথযাত্রা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আর একাদশী তিথিতে হয় প্রত্যাবর্তন বা উল্টোরথ। অর্থাৎ রথটি প্রথম দিন যেখান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, আট দিন পরে আবার সেখানেই এনে রাখা হয়। একেই বলে উল্টোরথ। রথযাত্রার সময় বিশাল জনসমাগম হয়ে থাকে।[৪]

৯. ওয়ানগালা

গারোদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ওয়ানগালা। নতুন ফসল বপন ও সংগ্রহের সময় এই অনুষ্ঠান করা হয়। আদিকালে সূর্যদেবতা নিশি দেবতাকে পাঠিয়ে দেন খাদ্যসামগ্রী, বীজ ইত্যাদি মানবজাতিকে দিয়ে আসার জন্য। তিনি এই বীজ মানবজাতির হাতে প্রদান করেন। এসব বীজ কিভাবে রোপণ করতে হয়, ফসল কিভাবে ফলাতে হয়, কিভাবে চাষ করতে হয় তা জানিয়ে দেওয়া হয়। মানুষ ভালো ফসল ফলানোর পর খুশি

www.pathagar.com

হয়ে উৎসব করে। ভালো বীজগুলোর কারণে ফসল ভালো হয়েছে, তার জন্য যে বীজ দিয়েছে, তাকে তারা খুঁজতে থাকে। সূর্যদেবতাকে কাছে না পেয়ে তার নামে উৎসব হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তাই ধান-ফসলের একটা অংশ মন্দিরে দেওয়া হয়। এটাই ওয়ানগালা। সমগ্র গারো এলাকা তখন হয়ে ওঠে আনন্দমুখর। বিভিন্ন গোত্রের যুবক-যুবতীরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে, দেহ-মুখ চিত্রিত করে নাচ-গানে মাতাল হয়ে ওঠে।

আগে গারো সমাজে নতুন ফসলের সময় ওয়ানগালা উৎসব করতেই হতো। খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণের পর এগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি আবার গারো ঐতিহ্য রক্ষার জন্য কিছু কিছু চেষ্টা চলছে।[৫]

১০. অন্যান্য উৎসব

মৌলভীবাজার জেলায় বহু আখড়া, দুর্গা-মন্দির, শিব-মন্দির, কালী-মন্দিরকে কেন্দ্র করে লোকউৎসব হয়ে থাকে। উৎসবে কীর্তনের আসর বসে। কীর্তনে সকল শ্রেণির মানুষ অংশ নেয়। কীর্তনীয়ারা বসে বা দাঁড়িয়ে গান করেন। শ্রোতারা তন্ময় হয়ে গান শোনেন। মহিলা-শ্রোতার সংখ্যা বেশি থাকে। উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা বসে।

শাহ মোস্তফা (র.)-এর ওরস উপলক্ষ্যে মৌলভীবাজার শহরে ৩০ পৌষ তারিখে মেলা বসে। যাকে ভাতের মেলা বলা হয়।

জুড়ী উপজেলার হরিপুরের রাধামাধব সেবাশ্রমে মাঘ মাসের ৮ তারিখে কীর্তন ও মেলা বসে। এছাড়া জুড়ী রেলস্টেশনের সন্নিকটে বাছিরপুর গ্রামে ৩ দিনব্যাপী বনদুর্গার মেলা হয়। বনদুর্গা এ অঞ্চলে বিলুপ্ত প্রাপ্ত পূজা। উপজেলার দশল পাহাড়ে চৈত্র মাসে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঙ্গল উপজেলার নির্মাই শিববাড়িতেও মেলা বসে।

ধামাই চা-বাগানের দুর্গা-মন্দিরে ফাল্গুন মাসের গৌড় পূর্ণিমায় কীর্তন ও মেলা হয়ে থাকে। এখানে শ্রোতা হিসেবে থাকেন মূলত চা-শ্রমিকরা। শীলঘাট চা-বাগানের কালভৈরব মন্দিরেও কীর্তন ও মেলায় প্রচুর লোক হয়। জুড়ীর সোনারূপা চা-বাগানে ৩ দিন ব্যাপী পৌষ মেলা বসে।

সাঁওতালদের পূজাপার্বণ

সাঁওতালরা উৎসবপ্রিয় জাতি। বাঙালিদের মতো এদেরও বারো মাসে তেরো পার্বণ। তাদের বছর শুরু হয় ফাল্গুন মাসে। প্রায় প্রতি মাসে বা ঋতুতে রয়েছে পরব বা উৎসব যা নাচ-গান-বাজনা সহকারে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

সোহরাই উৎসব

পৌষ সংক্রান্তির দিন তাদের জাতীয় উৎসব সোহরাই উৎসব পালিত হয়। অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে এই উৎসব পালন করা হয়। সবাই মিলে দল বেঁধে নেচে গেয়ে ফসলের দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সাঁওতাল তরুণীদের দলবদ্ধ নৃত্য এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ।

বাহা উৎসব

সাঁওতালদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের নাম বাহা বা ফুল ফোটার উৎসব। বসন্তের শুরুতে এ উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। নাচ-গান ও বাদ্যের সমারোহে নানা রঙের ফুল ফোটার সৌন্দর্যকে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন জানানো হয়।[৬]

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. শেখ এ আর রফিকুজ্জামান, পেশা : শিক্ষকতা, মুকুন্দপুর, কুলাউড়া
২. কবি শহীদ সাগ্নিক, কমলগঞ্জ; সৈয়দ আব্দুল মোত্তালিব রঞ্জু, মৌলভীবাজার সদর; ঈশুতোষ চক্রবর্তী, বড়লেখা, সংগ্রহের তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২
৩. কৃষক নেতা আব্দুল মালিক, পৃথিমপাশা, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ১০ আগস্ট ২০১২
৪. হাম্মুম তনু বাবু, আদমপুর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ: ১০ জুলাই ২০১১
৫. রণিজিৎ মান্দ্রব, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ১৫ আগস্ট ২০১১
৬. লাল বাবু সরেন, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২০ নভেম্বর ২০১১

www.pathagar.com

লোকমেলা

উৎসবকে উপলক্ষ্য করে প্রায় প্রতিটি স্থানে মেলা বসে এবং এসব মেলায় প্রচুর লোকসমাগম হয়ে থাকে।

১. চড়কপূজার মেলা বা চৈত্র সংক্রান্তির মেলা

অনার্য রক্তস্নাত লোকজন মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বসবাস করছেন। তাদেরকে স্থানীয় ভাবে 'ডুগলা'[১] বলা হয়, তারা অচ্যুত বা অন্ত্যজ। এ অঞ্চলে চড়কপূজা মূলত শব্দকররা করে থাকেন। কুলাউড়ার উচাইল গ্রামে ও কুলাউড়া মৌলভীবাজার সড়কের পাশে 'ঢুলিপাড়া' রয়েছে। সে জায়গায় একসময় চড়কপূজা হতো এবং মেলা বসতো। বর্তমানে এখানে কিছুই হয় না। কিছু ঢুলি বা শব্দকর কুলাউড়ার দক্ষিণাংশ পাবই ও রবিরবাজার এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করছেন। জুড়ী এলাকার ভবানীপুর এলাকায়ও তাদের বসতি ছিল। মালাকার সম্প্রদায়ের লোকজনকেও মাঝে মধ্যে চড়কপূজায় অংশ নিতে দেখা যায়। চড়কপূজকরা শিবের উপাসক। কালী সাধনাও করে থাকেন। চড়কপূজার সময় শিব-কালীর নৃত্য দেখতে শত শত মানুষ ছুটে আসে। বড় বড় 'দা' স্থানীয়ভাবে যাকে বলা হয় 'বলিচ্ছেদ'[২] তা নিয়ে তারা নৃত্য করে, শরীরে শিকল ঢুকিয়ে দেয়। চড়কপূজার দলের প্রধানকে 'তান্ত্রিক ওস্তাদ' বলা হয়। তার আদেশ খুবই কড়া, নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলিত। তিন মাস তারা নিরামিষ খাওয়া-দাওয়া করে। অল্প খেতে হয়, নারীসঙ্গ বর্জন করতে হয়। পুরো দল একত্রে আলাদাভাবে মাটিতে বসবাস করে। তারা শিব-গৌরীর নৃত্য প্রদর্শন করে। তারা একটি গান বলে–

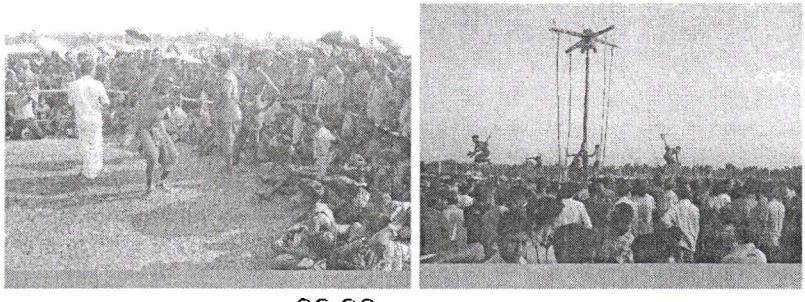

ছয়ছিরি দিঘির পাড়ে চড়কপূজা

হরগৌরী প্রাণনাথ
মাথার উপর জগন্নাথ।

www.pathagar.com

এইবার উদ্ধার কর হে শিব
বম্ বম্ বম্ ।

প্রতিটি চড়কপূজার জায়গায় ২ দিনব্যাপী মেলা বসে। চড়কের মধ্যে পিঠে বড়শি গাঁথা ও চড়কগাছে চক্কর দেওয়ার দৃশ্য দেখতে শত শত নারী-পুরুষের ভিড় জমে ওঠে। কুলাউড়া-জুড়ী লোকমেলার অন্যতম জায়গা হলো চড়কপূজার স্থান। কুলাউড়া উপজেলার কয়েকটি স্থানে চড়কপূজা ও মেলার বিলুপ্তি ঘটেছে। তন্মধ্যে ঢুলিপাড়ার চড়কপূজা, ভাটেরার চড়কপূজা, তিলাশিজোড়ার চড়কপূজা ও মুকুন্দপুরের চড়কপূজা বর্তমানে বিলুপ্ত।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ঢুলি বলা হয়, ২. ইস্পাতের তৈরি অনেক লম্বা ও ভারী।

২. বারুণী মেলা

ফাল্গুন থেকে চৈত্র মাসের মধ্যে মৌলভীবাজার জেলার অসংখ্য জায়গায় বারুণী মেলা বসে। বারুণী মেলায় কৃষি উপকরণ যেমন– লাঙল ও লাঙলের ঈশ, মই, জোয়াল, চাটি, ফাল, উকইন (ধানের খড় সরানোর জন্য বাঁশ নির্মিত যন্ত্র), কোদাল, দা, হেইত (পানি সেচের যন্ত্র), ডাবা, চিলিম, খড়ম, পাজইন (গরুকে প্রহার করার বাঁশের দণ্ড) প্রভৃতি পাওয়া যেত। মৎস্যজীবীদের হরেক রকম জাল মেলায় উঠত। যেমন- উড়াল জাল, পারইন জাল, টানা জাল ইত্যাদি। আবার মাছ ধরার স্থানীয় উপকরণ যেমন- পলো, এছু (মাছ মারার যন্ত্র), ডরি, (মাছ মারার যন্ত্র), উকা (মাছ মারার যন্ত্র), পারইন (মাছ মারার যন্ত্র), ইত্যাদি পাওয়া যায়। গৃহস্থালির নানা দ্রব্যাদির মধ্যে ছিক্কা, পাতিল, ছত্রা, চাকু, কাটাইল, পাটা, দড়ি, পাগা (গরুকে বেঁধে রাখার জন্য তৈরিকৃত বিশেষ প্যাঁচযুক্ত রশি) বিক্রি হয়। মেলায় খই, উড়কা (খই এবং গুড় দ্বারা বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি খাবার), কাঠালকুশি (গুড় ও ময়দা দ্বারা তৈরি বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি খাবার, যা আজ বিলুপ্তির পথে) ইত্যাদি খাবার বিক্রি হয়। তাছাড়া তেতুই (তেঁতুল জাতীয়) প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বৈশাখ মাসে কৃষক জমিতে নামার আগেই বারুণী মেলা থেকে এসব সংগ্রহ করতেন। বর্তমানে বারুণী স্নানের প্রথা বিলুপ্তি হলেও মেলার বিলুপ্তি হয়নি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কুলাউড়া-জুড়ীর সবচেয়ে বড় লোকজ মেলা হচ্ছে বারুণী মেলা। চৈত্র-বৈশাখ মাসে বিভিন্ন জায়গায় মেলা বসে। লালবাগের বারুণী মেলা অতি পুরাতন ও বিখ্যাত মেলা। এই মেলা ৩ দিন ব্যাপী হয়। হাজার হাজার লোক মেলায় আসে। এই মেলাকে মৌলভীবাজার জেলার প্রাচীন এবং সবচেয়ে বড় মেলা হিসেবে ধরা হয়। এছাড়া কুলাউড়া উপজেলার কর্মধা ইউনিয়নের 'নলডরী' গ্রামে বারুণী মেলা হয়। পূর্বে এ মেলাকে কৃষ্ণবারুণী মেলা বলা হতো। বর্তমানে নলডরী বারুণী মেলা বলা হয়। প্রতি বছর চৈত্র মাসের বাসন্তি পূজার অষ্টমীতে এ মেলা হয়। কুলাউড়ার নিকটবর্তী ধলিয়ার হাওরের মধ্যে মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণীর স্নান ও মেলা বসতো। এই হাওরের পুরাতন বারুণী মেলাস্থানে আজো লোকজন ছুটে যায়।[১]

www.pathagar.com

৩. শাহ মোস্তফার মেলা

৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম সহচর হযরত শাহ মোস্তফা (র.)-এর মাজার মৌলভীবাজার শহরে খলাপাড়া মৌজায় বর্তমান শাহ মোফা সড়কের পাশে অবস্থিত। প্রতি বছর ১ মাঘ বার্ষিক ওরস উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে। স্থানীয় লোকজন এই মেলাকে ভাতের মেলা বলে থাকেন। মাজারের আশপাশে দোকানীরা পসরা সাজিয়ে বসেন। এই মেলায় বাঁশ-বেত ও কাঠের তৈরি মালামাল প্রচুর বিক্রি হয়। মেলাটি ২ থেকে ৩ দিন পর্যন্ত চলে।[২]

৪. শেরপুরের মাছের মেলা

মৌলভীবাজার সদর উপজেলার শেরপুর নামক স্থান মাছের জন্য বিখ্যাত। কুশিয়ারা নদীর তীরে প্রাচীনকাল থেকে এই বাজার গড়ে উঠে। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন শেরপুরে মাছের মেলা বসে। হাজার হাজার মৎস্যজীবী বিশাল বিশাল মাছ নিয়ে শেরপুর মাছের মেলায় উপস্থিত হন। দূর-দূরান্ত থেকে ক্রেতারা এই মাছের মেলায় মাছ কিনতে চলে আসেন। উল্লেখ্য যে, মৌলভীবাজার অঞ্চলে পৌষ সংক্রান্তির দিন হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে মাছ খাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। মাছের মেলা খুবই দৃষ্টিনন্দন হয়ে থাকে।[৩]

৫. মাধবকুণ্ড বারুণী মেলা

বড়লেখা উপজেলার পাথারিয়া পাহাড়ের মধ্যে মাধবকুণ্ড নামক স্থানে নয়নাভিরাম জলপ্রপাত রয়েছে। কথিত আছে, মাধব নামে একজন ঋষি এই নির্জন বনে ধ্যান করে মাধবকুণ্ডের জলপ্রপাত আবিষ্কার করেন ও সেখানে স্নান করেন। মাধবকুণ্ডের পাশেই প্রাচীনকালে গড়ে উঠে শিবমন্দির। মাধবকুণ্ডের পাশে রয়েছে খাসিয়া পল্লি। প্রতি বছর মধুপূর্ণিমা ত্রয়োদশ তিথিতে মাধবকুণ্ডকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীরা সেখানে সমবেত হন এবং স্নান করেন। এই স্নানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বারুণী মেলা।[৪]

তথ্যনির্দেশ

১. নৃপেন্দ্র লাল দাস, আব্দুল মালেক, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২
২. সৈয়দ আব্দুল মোতালিব রঞ্জু, সুলতানপুর, মৌলভীবাজার সদর, সংগ্রহের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১২
৩. শ্যামল ভট্টাচার্য (শিক্ষক), শেরপুর বাজার, মৌলভীবাজার সদর, সংগ্রহের তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২
৪. জয়ন্ত পাল, গাংকুল, বড়লেখা, সংগ্রহের তারিখ : ১৫ মার্চ ২০১২

www.pathagar.com

লোকাচার

মৌলভীবাজার জেলার লোকসমাজ পারস্পরিক ঐতিহ্যে ও আত্মিক সম্পর্কে যেন একে অপরের সাথে বাঁধা পড়েছেন। অনুসন্ধানে দেখা যায়, আজও গ্রামের বা পরগনার বা পঞ্চায়েত মুরুব্বি বা সম্মানীয়দের কথায় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত হয়। যদিও তা কালের প্রবাহে অনেকটা শিথিল রয়েছে। গ্রামে কারো বিয়ে বা পারলৌকিক কার্য ইত্যাদি অনুষ্ঠান আয়োজনের পূর্বে সমাজের মুরুব্বিরা কথাবার্তা বলেন। এমন কী খাওয়ার আইটেম বা পদ কী কী হবে, কাদের নিমন্ত্রণ যাবে ইত্যাদি থেকে শুরু করে বাজার পর্যন্ত গ্রামবাসীরা অংশগ্রহণ করেন। মনে হয় নিজেদের বাড়ির কোনো উৎসব। মানুষের মধ্যে প্রচুর সহমর্মিতা রয়েছে। দূরের আত্মীয়তার সম্পর্কের লোকও এখানে রক্তের সম্পর্কের চেয়েও আপন বলে মনে হয়। হিন্দু-মুসলমান একই বৃন্তের দুটো ফুল বলেই চিহ্নিত। সিলেটিদের মতো মৌলভীবাজার জেলার মানুষও তাদের ঐতিহ্য বজায় রাখেন এবং শ্রদ্ধাশীল থাকেন।

উৎসব-অনুষ্ঠানে পালিত লোকাচার

পূজা-পার্বণ ঈদে অথবা পারিবারিক অনুষ্ঠানে যার যার ধর্মীয় প্রথা রক্ষা করেন বা সম্মান দেখিয়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় অথবা 'সিধা' দেওয়ার প্রথা এখনো কেউ কেউ করে থাকেন। বিশেষত জ্যৈষ্ঠ মাসে মেয়ের বাড়িতে 'জইটআড়ি' পাঠানোর নিয়ম রয়েছে। অর্থাৎ প্রথম বিয়ের কয়েক বছর পর্যন্ত জ্যৈষ্ঠ মাসে মেয়ের বাড়িতে ঘটা করে আম-কাঁঠাল-আনারস প্রভৃতি ফলসহ খই-মুড়ি পাঠানোর আচার করতে হয়। ধনীরা বড় আকারে জইটআড়ির আয়োজন করে থাকেন। তখন গ্রামবাসী বা পাড়া-মহল্লার লোকদের মধ্যে শ্বশুরবাড়ির অর্থাৎ বাপের বাড়ির খাবার বিতরণ করা হয়। বর্তমানে রমজান মাসের ইফতারিও মেয়ের বাড়িতে বড় আকারে পাঠাতে দেখা যায়।

মহরমের প্রথম দিন থেকে কুলাউড়ার পৃথিমপাশার বিভিন্ন বাড়িতে জারিগান ও পুথিপাঠ শুরু হয়ে যায়। অনেক মহিলারা রোজা রাখেন। শিয়া সম্প্রদায় মাতম করেন ও দেহ থেকে রক্ত ঝরান। সুন্নি সম্প্রদায়ের কিছু বাড়িতে মহরমের গান করতে দেখা যায়।

বিবাহের লোকাচার

হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের বিবাহের সময় লোকাচার খুব বেশি। বিশেষত হিন্দুদের বিয়ের পর্বগুলো শেষ করতে ১৫ থেকে ২০ দিন সময় নেয়। যেমন জামাই বা কন্যার চুল-নখ কাটতে বাড়িতে 'ক্ষৌরকার' আসে। যাদেরকে নাপিত বলা হয় (এখন পাওয়া যায় না)। তারা ঐ পরিবারের বংশানুক্রমিক কাজ করেন। নাপিত যখন ক্ষৌরকর্ম করবেন, তখন আনুষ্ঠানিকভাবে গান গাওয়া হয় এবং ক্ষৌরকারকে অনেক উপঢৌকন দিয়ে খুশি করতে হয় (মুসলিম পরিবারে তা কমে এসেছে)। বিবাহে পঞ্চায়েতের পান

www.pathagar.com

অবশ্যই পাঠাতে হবে– এই প্রথায় ভুল হবে না। এই পান সমাজের বা বাড়ির মুরুব্বির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিবাহের সময় কন্যাস্নান বা জামাইস্নান আনুষ্ঠানিকভাবে হয়ে থাকে। হিন্দুবাড়িতে দীর্ঘ সময় ধরে গান গেয়ে মহিলাদের পুকুরের ঘাট থেকে পানি আনতে হয়। রঙ্গিলা বৌদিরা জামাইকে স্নান করান ও রং-ঢং করে।

শ্বশুরবাড়িতে কন্যা প্রথম দিন আনুষ্ঠানিক ভাবে রান্নার আগে মুরুব্বিদের সালাম বা ভক্তি করেন। বর আনুষ্ঠানিক বাজার করেন। আগে নিয়ম ছিল নতুন জামাই রুই মাছ বাজার থেকে ক্রয় করে নিয়ে আসবেন। সেই দিন পঞ্চায়েত, সমাজ বা গ্রামের মুরুব্বিদের বা আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ানো হয়। হিন্দুরা এই প্রথাকে বলেন 'হস্তগ্রহণের খাওয়া'।

জামাই প্রথম শ্বশুরবাড়ি এলে 'ফিরা যাত্রা' বলা হয়। এ সময় আনুষ্ঠানিকভাবে 'জামাই স্নান' করানো হয় হিন্দুবাড়িতে। গান-বাজনা চলে এবং নিকট আত্মীয়রা আপ্যায়িত হন। মুসলিম সমাজেও 'জামাই প্রথম' শ্বশুরবাড়ি এলে আনুষ্ঠানিকতা করা হয়। বিয়াই-বিয়াইনকে ও বোনের জামাইকে নতুন কাপড় দেওয়া হয়। এটাকে 'বেবার-আচার' বলা হয়। প্রথমবার জামাই শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে এসে আড়াই দিনের বেশি থাকতে পারবেন না। যদি কোনো কারণে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া না হয়, অগত্যা নিকটাত্মীয় বা গ্রামবাসীর বাড়িতে যাত্রায় যেতে হয়।

বিয়ে-শাদির সময় বংশ এবং জাত দেখা হয়ে থাকে। কেউ বংশের চৌহদ্দির বাইরে বিয়ে দিতে রাজি হন না (তবে বর্তমানে অর্থ ও বিদেশযাত্রার কারণে তা শিথিল হয়ে পড়েছে)। হিন্দুসমাজে এই প্রথা বেশি। সমাজচ্যুতি বা একঘরে করে রাখার মতো ঘটনা ঘটে গ্রামে। তখন সমাজে মুরুব্বি বা পঞ্চায়েতের কথামতো বিধান মেনে নিলে আবার সামাজিক চলাফেরা শুরু হয়।

অন্যের বাড়িতে খাওয়ার কাঁচা উপকরণ পাঠানোর প্রথা হিন্দু বিয়ের অনেক আচারের মধ্যে শেষ ধাপ।

জন্ম সংক্রান্ত লোকাচার

মেয়ের বিয়ের পর তার গর্ভধারণ হলে পাঁচ মাস এবং সাত মাসে পিতৃগৃহ থেকে ঘটা করে মিষ্টি-ফল ইত্যাদি খাওয়ানো হয়– এটাকে 'স্বাদভক্ষণ' বলা হয়। কেউ বলেন হাদা খাওয়ানো। হিন্দু পরিবারে বিরাট আকারে স্বাদভক্ষণের আয়োজন চলে। এই সময় মহিলারা গান ও ধামালি দিয়ে থাকেন।

শিশু জন্মের 'ষঠী' দিনে 'ষষ্ঠী' বা 'ষঠী' করতে হয়। তখন ক্ষৌরকার এসে মা ও শিশুর নখ ও চুল পরিষ্কার করেন। সে দিন রাতে হিন্দু পরিবারের আচার হচ্ছে মামার কোলে আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুকে তুলে দেওয়া। 'বউল পাতা' নামক এক প্রকার গাছের পাতা রাতে আঁতুড়ঘরে মামা পুড়িয়ে থাকেন শিশুর মঙ্গলের জন্য। ধারণা করা হয়, এ রাতেই শিশুর কিছু ভাগ্য লেখা হয়ে থাকে। পাড়া-পড়শিদের নিমন্ত্রণ করা হয়। শিশুর মামাকে রঙ্গিলারা (অর্থাৎ জামাইর ভাই-বোন, বৌদি) রং-ঢং করেন। মুসলিম পরিবারেও ঘটা করে 'ষষ্ঠী' হয়। শিশুর নাম রাখা হয় সুন্দর পদ্ধতিতে। একটা থালায়

www.pathagar.com

সাতটি প্রদীপ জ্বালিয়ে তার পাশে নাম রাখা হয়। যে প্রদীপ শেষে নিভে যাবে সেই নামটিই শিশুর আসল নাম হবে।

পারিবারিক লোকাচার

পির-ফকিরের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো এবং মানত করা এখানকার সহজাত ব্যাপার।

এ অঞ্চলের প্রতিটি বাড়িতে বেড়াতে গেলে ন্যূনতম পান দ্বারা আপ্যায়িত হবেন।

মহিলারা কোনো অনুষ্ঠানে শাড়ি-গহনা পরে যাতায়াত করেন।

হিন্দু পরিবারে ভাইফোঁটার মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার প্রথা প্রচলিত ছিল।

হিন্দু পরিবারের মহিলারা সূর্যোদয়ের সাথে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে গরুর গোবর দিয়ে সারা বাড়িতে ছিটিয়ে থাকেন (বর্তমানে কিছু পরিবারে তা হচ্ছে)।

মহিলারা জামাই, ভাসুর, মামাশ্বশুরের সাথে কথা বলেন খুবই হিসাব করে এবং সসম্মানে। আগে কথা বলার রেওয়াজ ছিল না। বর্তমানে প্রয়োজনের তাগিদে কথা বলা শুরু হয়েছে।

শ্রাদ্ধের সময় ১২ থেকে ১৪ পদের বেশি রান্না করার ঐতিহ্য রয়েছে। শ্রাদ্ধের খাওয়া শুরু হয় ঘি দিয়ে এবং শেষ হয় টক ও দই-মধু দিয়ে।

গৃহপালিত পশু কেন্দ্রিক লোকাচার

কৃষকের গাভী বাছুর জন্ম দেওয়ার পর ষাঁড় বাছুর হলে ২১ দিন এবং গাই বাছুর হলে ৭ দিন পর প্রথম গাভীর দুধ সংগ্রহ করে ঘোরচণ্ডী ((গরুর দেবতা)-র উদ্দেশ্যে নিবেদন করে গঙ্গাজলে দুধ বিসর্জন দেওয়ার নিয়ম ছিল, যাকে বলা হতো হুদ।

কৃষি কেন্দ্রিক লোকাচার

কৃষিকেন্দ্রিক বহু কর্মে নারীদের প্রাধান্য লক্ষণীয়। কৃষি, ধান ও গরু কেন্দ্রিক কিছু পার্বণ মহিলাদের হাত ছুঁয়ে পালিত হয়। কিছুদিন আগেও তারা প্রথম বীজটি বপন করতেন। শানের চারাকে স্থানীয়ভাবে আলি বলে। প্রথমে ধানবীজ কয়েকদিন (২/৩ দিন) পানিতে ভিজিয়ে রেখে ধানবীজ থেকে চারা গজালে (স্থানীয়ভাবে খেং দেওয়া বলে) কৃষক তার তৈরিকৃত বীজতলার নরম মাটি একটি কলাপাতায় নিয়ে এসে সংরক্ষণ করতেন এবং ঐ মাটিতে কৃষানি ধানবীজ ছিটিয়ে দিতেন। এটা ছিল শত শত বছরের পুরাতন প্রথা। সম্ভবত নারীরা কৃষিকর্ম থেকে বিরত থাকার পর উর্বরাশক্তির প্রতীক হিসেবে নারীকে দিয়েই ধানবীজ ছিটানোর প্রতীকী ধারা কুলাউড়া-জুড়ী অঞ্চলে অব্যাহত রয়েছে।

মাসভিত্তিক লোকাচার

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে ধানের ক্ষেতে উলা দেওয়া হয় ভালো ফসল উৎপাদনের জন্য। এদিন আট প্রকার সবজি দিয়ে তরকারি রেঁধে লক্ষ্মীদেবীর ভোগ দেওয়া হয়। আঞ্চলিকভাবে বলা হয়ে থাকে–

www.pathagar.com

আশ্বিন যাইতে কাতি আইতে
ধানে দিলাম উলা,
গুন্দা মেতি চইলতার পাত
ছড়া মেলিছ আড়াই হাত।

আশ্বিন মাসে ধানের হাদা খাওয়ানোর প্রথা ছিল। অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলার মতো ধানের শিষ বের হওয়ার সময় সাধভক্ষণ দেওয়া হয়। আশ্বিন মাসের শেষ দিনে চালতা গাছের সুন্দর পাতা সংগ্রহ করে সুন্দি, কাঁচা তেঁতুল, মেথি, চন্দন, ধান, দুর্বা, তেল ইত্যাদি কৃষিজ উপকরণ রেখে বিশেষ পদ্ধতিতে সেই পাতা ভাঁজ করা হতো। যাকে বলা হয় টুয়া, টুই বা টগা। সেই টগা নিয়ে মহিলারা বা শিশুরা একটা ছড়া বলে ধানগাছের গোড়ায় রেখে দিতেন। ছড়াটি হলো–

আশ্বিন যাইতে কার্তিক হামাইতে
চুয়াচন্দনে বরিলাম তোমারে
যুগে যুগে না ছাড়িও আমারে।
চইলতা পাতায় ধরছে কাড়া
ধান দিও নব ভাড়া।

আশ্বিনের শেষ দিন কৃষক পরিবার তাদের ঘর-দোয়ার পরিষ্কার করেন। গরু-বাছুরকে পানি দ্বারা স্নান বা গোসল করিয়ে থাকেন। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে বেশি পিঠা তৈরি হয়। বিন্নি চাউলকে ছিদ্রযুক্ত মাটির পাত্রে রেখে নিচে একটা পাত্রে পানি দিয়ে তাপ দিলে বিন্নি চাউল শক্ত ও লাশা যুক্ত ভাতে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে 'ঘাইয়াড়ি'তে রান্না। এই ভাত গুড় বা মাংস দিয়ে খাওয়া হয়।

ছোট ছোট বাচ্চারা আশ্বিনের শেষ সন্ধ্যায় রাধাচক্কর দিত। বাঁশের গায়ে লাগানো বড় খুল শুকিয়ে গেলে পড়ে যায়। সে খুল সংগ্রহ করে একটা বাঁশের কঞ্চির মধ্যে আটকিয়ে দেওয়া হতো এবং সন্ধ্যার সময় সেটাতে আগুন ধরিয়ে মাথার উপর দিয়ে দীর্ঘক্ষন চক্কর দেওয়া হতো। এতে করে বালা-মুসিবত দূর হয়ে যেত বলে বিশ্বাস করা হয়।

কার্তিক মাসে হিন্দু মহিলারা কার্তিক ব্রত করতেন কৃষি সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য।

কার্তিক মাসের শেষ দিন ভোলাভুলি দেওয়া হতো। গৃহস্থ তার গরুকে ভালো করে ধুয়ে রাতা নামের গুল্ম বা কলার ডাটা নিয়ে গরুর গায়ে বাড়ি দিয়ে ছড়া কাটতেন–

ভুলা ছাড় ভুলি ছাড়
বার মাইয়া পিছাইয়া ছাড় ছাড়।
দল খাইলে বল অয়
নেড়া খাইলে ছেড়া অয়...

অগ্রহায়ণ মাসে ধান সংগ্রহের সময় কৃষানি ধান সিদ্ধ করার সময় চাউলের গুঁড়া বা কাইকে কলাপাতায় বেঁধে তা ঐ পাত্রে রেখে রকমারি পিঠা তৈরি করতেন। আবার গুড় তৈরি করার সময়ও বিভিন্ন পিঠা বানানোর রেওয়াজ ছিল।

www.pathagar.com

অগ্রহায়ণ মাসে ঘরে ধান উঠানোর কাজ শেষ হলে হিন্দু কৃষানিরা বাড়ির উঠানে আলপনা আঁকতেন। আলপনার কেন্দ্রে রাখতেন ফুল, গরুর গোবর, শেষ মাড়াইয়ের খড় ইত্যাদি। বিভিন্ন লতাপাতা অঙ্কনের সাথে সাথে সেখানে স্থান পেত গরু, লাঙল, জোয়াল, মই, কাটিয়া, হুক্কা, পেঁচা, লক্ষ্মীর পা, মচা ইত্যাদি কৃষিজ উপাদান। এই আলপনা আঁকা শেষ হতো ধান রাখার বড় জায়গা যাকে বলা হয় উগার সেখানে গিয়ে। আলপনার নাম ছিল মেউয়া। আলপনা ব্রত, পার্বণ, পূজা, অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে অন্যতম বিশিষ্ট মাঙ্গলিক উপাচার, যা বহুকাল ধরে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশরূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। এই শিল্পের নান্দনিক এবং মাঙ্গলিক উভয় দিকই রয়েছে।

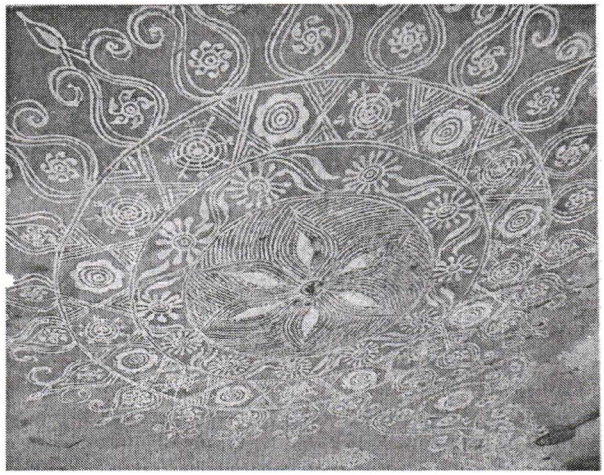

অগ্রহায়ণ মাসের শেষে ধান তোলার পর কুলাউড়ার কৃষানিরা উঠোন জুড়ে আলপনা অর্থাৎ 'মেউয়া' এঁকেছেন

পৌষ সংক্রান্তির সময়ও ঘরবাড়ি পরিষ্কার ও সুন্দর করা হয়। কাঁথা-কাপড় ধোয়া হয়। পৌষ সংক্রান্তির দিন প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে পিঠা তৈরি হয়, একজন অন্যের বাড়িতে যান। পৌষের শেষ দিন বাজার থেকে ভালো মাছ ক্রয় করা হয়। এই পারিবারিক অনুষ্ঠান সর্বজনীন ও বহুকাল পূর্ব থেকে চলে এসেছে। হিন্দুরা ভোরে উঠে স্নান করেন এবং 'ভেড়া ঘর' পুড়িয়ে আনন্দ উদ্‌যাপন করেন।

বৈশাখ উপলক্ষ্যে কিছু অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়। চৈত্রের শেষ দিন বাড়ি-ঘর, পোশাক ইত্যাদি পরিষ্কার করা হয়। গৃহস্থ তার গরুকে ভালো করে ধুইয়ে দেন। কৃষানিরা আগের দিন ভাত ও পিঠা রান্না করে রাখেন, পরের দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ সকালে সকালে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খাওয়ার উদ্দেশ্যে। অনেকে আগের দিন রান্না করেন ও পরের দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ সকালে তা খেয়ে থাকেন, কিন্তু দুপুরবেলা ভালো তরকারি (মাছ বা মাংস) রান্না করে খাওয়া হয়। মহিলারা সাত বা আট পদের সবজি দিয়ে ল্যাবড়া রান্না করেন। ঐদিন তিতা জাতীয় খাবার যেমন নিম

www.pathagar.com

বা করলা বা টক খাওয়া হয়। গরিব পরিবারে সকালে পান্তাভাত-আলুসিদ্ধ থাকলেও দুপুরে ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। সম্পন্ন কৃষক সকালে বেল খেয়ে আনন্দময় দিনের পর্ব উদ্বোধন করেন। অনেকেই চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় ছুটে যান। সাধারণ অনুষ্ঠানকে আনন্দঘন করে তোলার রেওয়াজ রয়েছে এই জেলার মানুষের মধ্যে।

বিপদ বা রোগ থেকে রক্ষা সংক্রান্ত লোকাচার

চৈত্র মাসে আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে বসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। তখন গ্রামের মহিলারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাউল সংগ্রহ করে শীতলা ব্রত যৌথভাবে পালন করেন। বিশ্বাস, এই ব্রতের ফলে শীতলা দেবী সন্তুষ্ট হলে বসন্ত রোগ আর হবে না।

বৈশাখ মাসে দুর্দান্ত কালবৈশাখির তাণ্ডবলীলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পুরুষলোক বড় দা দিয়ে মাটিতে কোপ দিয়ে রাখেন। কেউ কেউ উল্টামুখী হয়ে উঠানে বসার জন্য ব্যবহৃত পিঁড়ি ছুঁড়ে দিতেন। তুফানের শক্তিকে দৈত্য হিসেবে কল্পনা করে এই প্রক্রিয়ায় তাকে প্রতীকী হত্যা বা ভয় দেখানো হয়। বিশ্বাস ছিল, তুফানের দৈত্য এসে উঠানের পিঁড়িতে বসবে, আর ধ্বংস করবে না। কেউ কেউ দোহাই দিয়ে বলতেন-

পাহাড়ে যা, পর্বতে যা, নলের আগা ভাঙিয়া খা
দোহাই, পির-ফকিরের দোহাই।

এ অঞ্চলে বন কেটে বহু চা-বাগান হয়েছে। তখন চা-শ্রমিকরা বন কাটার পূর্বে 'বাঘাহুত' পূজা দিতেন, ফলে বনদেবতার উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। গ্রাম পুনর্গঠনে এবং বন কেটে চা-বাগান তৈরির সময় এ অঞ্চলে 'বনদুর্গার' পূজা হতো। এই পূজা প্রথা এখন আর নেই।

ঘর নির্মাণ সংক্রান্ত লোকাচার

নতুন ঘর তৈরির সময় লোকঐতিহ্য ছিল। ঘর তৈরির প্রারম্ভিক অবস্থায় পঞ্জিকা দেখে বা মুরুব্বিদের ঠিক করা তারিখ অনুযায়ী একটা বাঁশের খুঁটিকে ধুয়ে মুছে তার মাথায় আমপাতা দিয়ে মুকুটের মতো পরানো হয়। ঈশান কোণে গর্ত করে ঐ গর্তের মধ্যে লোহা, মরা মাকড়, কাঁচা হলুদ ইত্যাদি রেখে সেই খুঁটির মধ্যে নতুন কাপড় লাগিয়ে সাত অথবা পাঁচজন পুরুষ একসাথে ধরে ঐ গর্তে ঈশানের বাঁশ রাখা হতো। ঐ গর্তের মধ্যে সোনা-রূপার পানি দেওয়া হয়। ঐ প্রক্রিয়াকে বলা হতো ঈশান দেওয়া।

ব্রত উৎসব

কুলাউড়া-জুড়ি অঞ্চলের প্রান্তিক সমাজ, কৃষক সমাজ ও নিম্নজীবী হিন্দু পরিবারের মেয়েরা সারা বছরই নানা কারণে ব্রত উৎসব পালন করে থাকেন। অবশ্য মেয়েরা শিক্ষিত হওয়ার সাথে সাথে ব্রত উৎসবের সংখ্যা কমে এসেছে।

কয়েকটি ব্রত এককভাবে একজন ব্রতী নিজে করেন। কয়েকটি ব্রত আবার কয়েকজন মহিলা মিলে-মিশে করেন, যেমন শীতলা ব্রত। কোনো-কোনো ব্রতের সময় গান বাজনা হয়। যেমন রূপসী ব্রত ও সূর্য ব্রত। সূর্য ব্রতের সময় ধামালি দেওয়া হয়।

আবার শীতলা, লক্ষ্মী, বিপদতারিণী, সংকট তারিণী, এক পুতের মায়ের ব্রত, টনকির পান, ঝটপট-এর পান দেওয়ার সময় কয়েকজন মহিলা বসে কেবল কিচ্ছা

www.pathagar.com

বলেন। এ অঞ্চলে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে কর্মদা সংক্রান্তি ব্রত। প্রতি বাড়িতেই কর্মপুরুষের ব্রত হয়। জৈষ্ঠ্য মাসের শেষ দিন কর্মদা বা কর্মপুরুষের ব্রত করতে হয়। মূলত সঞ্চয়ী মনোভাব গঠন ও কৃচ্ছতা সাধন করা এবং ব্রতে বিশ্বাসী থাকাই এর প্রতিপাদ্য বিষয়। এই ব্রতের সময় প্রত্যেকটি হিন্দুবাড়িতে খৈ ও চাউল ভাজি করা হয়। দুপুরে ব্রতের পর খৈ ও চাউলের গুঁড়াকে গুড় ও কাঁঠাল দিয়ে খেতে দেওয়া হয়। মেয়ের বিয়ের সময় মা যেমন রূপসী ব্রত করেন; তেমনি সন্তানের জন্মের আগে ও পরে এ অঞ্চলে রূপসী ব্রত করতে হয়।

অবিবাহিত মেয়েরা ভালো স্বামী পাওয়ার জন্য মাঘী ব্রত করতেন। মাঘী ব্রত বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত।

ভাদ্র মাসে স্বর্ণ ব্যবসায়ী বা ধাতব জিনিসের ব্যবসায়ীরা ধুমধামের সাথে বিশ্বকর্মা পুজো করে থাকেন।

শব্দকর মহিলাদের ব্রত

শব্দকর সম্প্রদায় অনেকগুলো ব্রত পালন করে থাকে। সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এসব ব্রত বেশি করেন। শব্দকর সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ ব্রতগুলোর মধ্যে আছে–

গঙ্গার ব্রত

এই ব্রত ছোট ছোট বাচ্চাদের মঙ্গলের জন্য করা হয়ে থাকে। ফল-ফসল সাজিয়ে তা পুকুরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। শনিবার বা মঙ্গলবার এই ব্রত করা হয়ে থাকে।

শিতলী বসন্তের ব্রত

গ্রামে অসুখ-বিসুখ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ব্রত করা হয়ে থাকে। ঢোল-করতালসহ নেচে নেচে গান করা হয়। এই ব্রত অনুষ্ঠান করতে হলে ঠাকুর লাগে। চাউলের গুঁড়া, ফল-ফসল ইত্যাদি সাজিয়ে কোনো গাছের নীচে বা মাঠে নিয়ে যেতে হয়।

সাবিত্রী ব্রত

এই ব্রত মূলত জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বামীর মঙ্গল কামনা করে করা হয়। স্বামীর যাতে কোনো বিপদ-আপদ না ঘটে তার জন্য এই ব্রত। এই ব্রত পালনকালে স্ত্রী তিন দিন উপবাস থাকবেন। চার দিনের দিন স্ত্রী-স্বামীকে স্তুতি-ভক্তি করেন। স্বামী স্ত্রীকে শাড়ি-কাপড় উপহার দিবেন। স্ত্রী উপবাস থাকাকালীন সময়ে লাঙ্গলের দ্বারা উৎপাদিত কোনো খাদ্য গ্রহণ করতে পারবেন না।

কর্মপুরুষের ব্রত

এই হচ্ছে ফল-ফসলের ব্রত। ফল-ফলাদি সংগ্রহ করে এই ব্রত করা হয়। ফল-ফসলের ব্রত মূলত সন্তুষ্টি পাওয়ার ব্রত। ফল-ফসল দেহ, মন, আত্মা খুশি হয়ে এই ব্রত দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

www.pathagar.com

অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান

মানস পূজা

চা-বাগানে মানস করার লোকমুখে রেওয়াজ বা প্রচলন আছে। কেউ কেউ বিভিন্ন দেবতার নামে, কেউ কালীর নামে ষাঁড় মানস করে।

মন্দিরের কর্তা আহ্নিকা দেখে ষাঁড় মন্দিরে এনে মন্ত্রপাঠ ছেড়ে দেবেন। ষাঁড় মুক্ত হয়ে অবাধে বাগানে ঘুরে বেড়াবে, ইচ্ছামতো খাবে। কেউ এই ষাঁড়টিকে অবহেলা করে না। সম্মানের সঙ্গে তাকে চলতে দিয়ে থাকে। ষাঁড়কে পবিত্র হিসেবে সকলে মান্য করে। এভাবে পাঁঠা ছেড়ে দেওয়ারও প্রথা আছে। বাগানে অবাধে পাঁঠাও চরে বেড়ায়। কেউ তার বিপদ ঘটায় না। এই প্রথা বাগানে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

চা-বাগানে এটি লোকমানস। বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যেমন গ্রাম পূজা করা হয়, তেমনি শীতলা দেবীরও পূজা করা হয়ে থাকে। পাঁঠা, ষাঁড় ইত্যাদির মানসও লোকপূজার অংশ। দেবতারূপী ষাঁড় এর ভেতর শক্তি খোঁজে, বিপদ থেকে চলে যেতে চায়।

পিড়িয়া প্রথা

চা-বাগানে ধর্মীয় প্রথার মতো একই প্রথা হচ্ছে পিড়িয়া। পিড়িয়া অর্থ কি জানা না গেলেও তার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ঘৃণা। শত শত বছর আগে থেকে এ প্রথা চলে আসছে। লোককাহিনি অনুসারে, একদা এক বজ্জাত কুখ্যাত নারীলোভীর যন্ত্রণায় সমাজের নারীসমাজ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তার হাত থেকে বাঁচার কোনো পথ ছিল না। তার কুকর্ম এমন বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল তা কিছুতেই ভোলা যাচ্ছিল না। তাই সমাজের নারীরা প্রতি বছর তার কুকর্ম স্মরণ করে ঘৃণা প্রকাশ করেন। কালীপূজার দিনে এই ঘৃণার অনুষ্ঠান করা হয়। কালীপূজার দিন থেকে প্রতিদিন ১ মাস ৭ ১/২ দিন পর্যন্ত চলে। সোয়া এক মাস পর এক দিন উপবাস থাকে ।

তারা প্রতীকী হিসাবে ইট গাইলে (ধান বা চাল কুটার দেশীয় যন্ত্র) ফেলে দিয়ে তাকে কুটতে থাকবে। গাইলে গাইলে এটা ফেলবে এবং এদিক ওদিকে যাবে। এভাবে এই ইট কুটাতে অসৎ ব্যক্তির কুকর্মের বিনাশ ঘটায়। পরে নাচ-গান করার নিয়ম আছে। অসৎ ব্যক্তির বিপক্ষে ঘৃণা প্রকাশের এ প্রাচীন নিয়মাবলী পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর নিয়ম বলে দেখা হলেও বা তুচ্ছ ভাবা হলেও অধুনা নাগরিক সভ্যতায়ও কোনো দুরাত্মা বা সমাজে অকল্যাণকর হিসেবে চিহ্নিত মানুষের বিনাশ ঘটাতে এরূপ প্রতীকী বিচারের আশ্রয় নেয়। এসবের নানা প্রতীকী হিসেবে গণআদালত, কুশপুত্তলিকা দাহ অনুষ্ঠান বিবেচনা করতে পারি।

গ্রামপূজা

বৈশাখ মাস থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত বাগানে গ্রামপুজা চলে। বাগানে সব জাতের লোকজনেই গ্রামপূজা পালন করে। বিপদ-আপদ হতে রক্ষার জন্য এই গ্রামপূজা দেওয়া হয়। এই শীতলা দেবীর ঘৃণা।

www.pathagar.com

দণ্ড ব্রত পালন

চা-বাগানে এই ব্রত পালন কম হয়। এটি একটা কঠিন ব্রত। চৈত্র মাসে এই ব্রত পালন আরম্ভ হয়। ধুতি-গামছা পরে ও হাতে লাল পতাকা নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে ব্রত পালনকারীরা পাড়া থেকে পাড়ায়, বাগান থেকে বাগানে ভিক্ষুকের মতো গান গেয়ে ঘুরে বেড়ায়। এসময় তারা কোনো বিছানা-বালিশ ব্যবহার করবে না। লোকজন স্বেচ্ছায় কিছু দিলে খায়। তেল ছাড়া সিদ্ধ খাবার খাবে।

পৌষ সংক্রান্তি

এই দিনে ঘরদোর পরিষ্কার করা হয়। বাড়িতে তুলসী গাছের নীচে এসে ব্যক্তির নামে বস্ত্র রাখা হয়। এ সময় বাসাবাড়িতে বাইরের কোনো লোক এলে মনে করা হয় সে মৃত ব্যক্তির রূপ ধরে এসেছে। এই ব্যক্তিকে সম্মান করা হয়।

গোয়ালপূজা

মাদ্রাজি বা তেলেগুরা গবাদিপশু বা গরুর পূজা করে থাকে। গাছকে দেবতাতুল্য মনে করে। গরু যেখানে থাকে তাকে গোয়ালঘর বলে। তাই তারা গোয়ালপূজা করে। গোয়ালপূজা উপলক্ষ্যে ঘরে ঘরে গিয়ে দল বেঁধে কীর্তন করে।

মণিপুরী সম্প্রদায়ের আচার

মণিপুরী সম্প্রদায়ের কিছু প্রথা বা নিয়ম আছে এগুলো ধর্মের সাথে যুক্ত হলেও এসব প্রথা চিরাচরিত নিয়মে চলে আসছে। এসব প্রথা একাধারে ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ হলেও লোকবিশ্বাস একই।

বিবাহের আচার

বিবাহ অনুষ্ঠানের পাত্র-পাত্রীর পক্ষের মধ্যে আড়ালে থেকে জানাজানির পর প্রাথমিক কাজ শেষ হয়। যে বা যিনি বিবাহের প্রস্তাব দেবেন সে সূত্র হিসেবে তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা পালন করেন। উভয়ের প্রাথমিক জানাজানির পর আলাপের প্রস্তাব চলে। এ আলাপ অনেকটা আনুষ্ঠানিক। মণিপুরীদের মধ্যে একই গোত্রে বিবাহের নিয়ম নেই। প্রাথমিক জানাজানিতে প্রথম থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

প্রচলিত একটা রীতি আছে যে, বর ও কনের জন্মবার এক দিনে হলে বিবাহ শুভ মনে করা হয়। তখন কোষ্ঠী দেখার প্রয়োজন অনুভব হয় না। বিয়ের আলাপের দিনে কিউলার ঝুড়ির মতো বেতের পাত্রে খই, ফলমূল নিয়ে যাওয়া হয়।

বিবাহের দিনে জামাই পক্ষের লোক একটি পাত্রে জীবিত চেং মাছ যত্ন করে কনের বাড়িতে নিয়ে যান। কনের পক্ষের লোকজন চেং মাছের অবস্থান কোন দিকে আছে তা নির্ণয় করে বিবাহের শুভাশুভ চিহ্নিত করেন।

নগর কীর্তন

বছরের শেষ চৈত্রে বিষু সংক্রান্তি উৎসব হয়। বিষু সংক্রান্তির পর বৈশাখের ১ তারিখ থেকে ৫ দিন এক নাগাড়ে রাত্রে গ্রামে, পাড়ার রাস্তায় দল বেঁধে ১০/১২ জন

www.pathagar.com

নগরকীর্তন করেন। তাদের সঙ্গে করতাল, ঝান, ঢোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র থাকে। পথে পথে হেঁটে কীর্তন গেয়ে গ্রাম, পাড়ার রাস্তা গভীর রাত পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করেন। গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় কৃষিকাজ শেষে যখন বাড়ির লোকজন বিছানায় ঘুমাতে থাকেন তখন কীর্তনের সুর বেজে উঠবে। তারা ঘরে থেকে কান পেতে কীর্তনীয়াদের গ্রাম প্রদক্ষিণ ও গান শুনবেন। এই গ্রাম বা প্রদক্ষিণ বা কীর্তন মঙ্গল-বুধ থেকে পরিচালিত হয়। দেশের মানুষ বলে বিপদ-আপদ অসুখ-বিসুখ থেকে রক্ষার জন্য কীর্তন করা হয়।

পুথিপাঠ

কার্তিক মাসে মণিপুরী পাড়া ও সমাজে পুথিপাঠের ধুম পড়ে। তাদের বিশ্বাস এই কার্তিক মাসে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। পঞ্চ পাণ্ডবরা নাকি এই সময়ে শাস্ত্রকথা, বৈদিক আচার-নিয়ম অনুষ্ঠান করতেন। কার্তিক মাসে মহাত্মা স্মরণ করে তারা মণ্ডপে মণ্ডপে পুথিপাঠ করেন। মাসব্যাপী এই পুথিপাঠে ২ জন থাকেন। একজন পাঠ করে যাবেন, একজন তার ব্যাখ্যা করে যাবেন। এইভাবে পুথিপাঠ চলতে থাকে।

সাঁওতালদের বিবাহের আচার

একই গোত্রে সাঁওতালদের বিবাহ হয় না। গোত্র ভিন্ন ভিন্ন হতে হবে। বিয়ের সময় দল বেঁধে পাত্র পাত্রীর বাড়ি যায়। এই বিবাহকে কেন্দ্র করে একটা সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে। ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক পছন্দের পর যে কাজটি করা হয় তা হচ্ছে, টুকরির মতো একটা পাত্রে মেয়েকে বসানো হয়। ছেলে বা পাত্রকে একজন শক্তিশালী ব্যক্তি কাঁধে তুলে নিবে। তখন পাত্র কনের কপালে সিঁদুর লাগাবে। এই নিয়ম পাত্রের বাড়িতে হয়।

তথ্যসহায়ক

১. প্রমোদ শর্মা (৮৫), গ্রাম: বিজলী, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ১ জানুয়ারি ২০১১
২. আব্দুর রাজ্জাক, গ্রাম : তারাপাশা, রাজনগর, সংগ্রহের তারিখ . ৫ জানুয়ারি ২০১১
৩. সৈয়দ আব্দুল মোতালেব রঞ্জু, গ্রাম : সুলতানপুর, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার
৪. কবি শহীদ সাগ্নিক, শমসেরনগর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
৫. ঈশুতোষ চক্রবর্তী, গ্রাম : যোগডোবা, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
৬. রামকৃষ্ণ সরকার, গ্রাম : রুস্তমপুর, সাতগাঁও, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
৭. রনজিত ভর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ১৭ নভেম্বর ২০১১
৮. শিপ্রা রানী মোহান্ত, ঘোষপুর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ১২ জুলাই ২০১১
৯. মিতা রানী শব্দকর, নছরতপুর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ১২ জুলাই ২০১১
১০. হাম্মুম তনু বাবু, কোণাগাঁও, আদমপুর, কমলগঞ্জ
১১. ফরনা অমানিক, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ১৭ নভেম্বর ২০১১
১২. লাল বাবু সরেন, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২০ নভেম্বর ২০১১

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

প্রাচীনকালে রাজনগরসহ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে অস্ট্রিক জাতীয় লোক প্রথমে বসবাস শুরু করে। আদি অস্ট্রেলিয় লোকেরা প্রথম প্রাচীন কৃষিসভ্যতার সূচনা করে। তারা পশুপাখি শিকার ও ফলমূল আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। হাওর, বাওর, খাল, বিল, নদীনালাতে মাছ ধরে খাদ্য সংগ্রহ করত। অতিরিক্ত মাছ ধরা পড়লে তা শুকিয়ে খাদ্য হিসেবে সংরক্ষণ করত।

সিলেটের বৈশিষ্ট্য হলো তরকারিতে প্রচুর ঝোল বা রস দিয়ে রান্না করা যাকে বলে জাবড়াইয়া খাওয়া। অর্থাৎ থালার মধ্যে তরকারির ঝোলে হাত ডুবে যাবে। মুসলিম পরিবারে ঝুল বা ঝোলকে বলা হয় সুরুয়া এবং তরকারিকে বলা হয় ছালন। প্রাচীনরা ঝুলকে বলতেন খর আবার টক জাতীয় ঝোলকেও খর বলা হতো। যেমন-টমেটো, লালশাক, চালতা, বরই, তেঁতুল ইত্যাদি ও টককে কেউ কেউ খর বলতেন। তিল-তিশি দিয়ে মিষ্টি টক রান্না করা হতো। অড়হর, মুগ, ফরাস, শিম ইত্যাদি ডালের প্রচলন ছিল।

এ জেলার মানুষ প্রচুর পরিমাণে শাক-সবজি খেয়ে থাকেন। একসাথে বিভিন্ন প্রকার সবজি রান্না করাকে বলা হয় ল্যাবড়া। বর্ষাকালে শিমবিচি, অড়হরবিচি বা ফরাসবিচি ভেজে সরিষা বাটা দিয়ে ডুপা রান্না করা হতো। তাছাড়া বিভিন্ন বিচি ভাজি বা চাউল ভাজি খেতে অনেকেই পছন্দ করেন। সকালবেলা চা-এর সাথে চাউল ভাজি যাকে বলা হয় করই ভাজি খাওয়া হয়।

এলাকায় পুড়া খাওয়ার প্রচলন আছে। যেমন- চেং (টাকি মাছ) পুড়া, আলু-বেগুন পুড়া ও শুটকি পুড়া খুবই জনপ্রিয় খাবার। এছাড়া রান্নাকে সুস্বাদু করার জন্যে বিভিন্ন সুগন্ধি পাতা ব্যবহার করা হয়।

পিঠা

অগ্রহায়ণ মাসে কৃষকের ঘরে নতুন ধান আসত। ধান সিদ্ধ করে বিভিন্ন ধরনের ভাপা পিঠা তৈরির প্রচলন ছিল। পিঠাগুলোর বিচিত্র নাম ছিল টুই পিঠা, কাছলি পিঠা, মচা পিঠা, সিদ্ধ পিঠা ইত্যাদি। চাউল গুঁড়ো করে পাটিসাপটা বানানো হতো, একে কেউ বলত ফুলকাপাটি। আঠালো বিন্নি ধানের চাল বিশেষ পদ্ধতিতে রান্না করা হতো। গরু দিয়ে ধান মাড়াই করতে করতে অনেক রাত হয়ে যেত, তখন কাজের ফাঁকে পিঠা খাওয়া এবং কিস্‌সা বলার রেওয়াজ ছিল।

পৌষ-পার্বণে কুলাউড়া ও জুড়ী অঞ্চলে অতি প্রাচীনকালের একটি বিশেষ পিঠা তৈরির ঐতিহ্য আজো রয়েছে– যার নাম চুঙ্গি পিঠা। কচি মুলিবাঁশের মধ্যে বিন্নি চাউল ভরে আগুনের তাপে সিদ্ধ করা হয়। এই পিঠার মধ্যে কচি বাঁশের ঘ্রাণ সত্যিই

www.pathagar.com

উপভোগ্য। এই চুঙ্গার বাঁশকে বলা হয় ডলু বাঁশ, যা পাওয়া যায় কুলাউড়া-জুড়ীর গভীর জঙ্গলে।

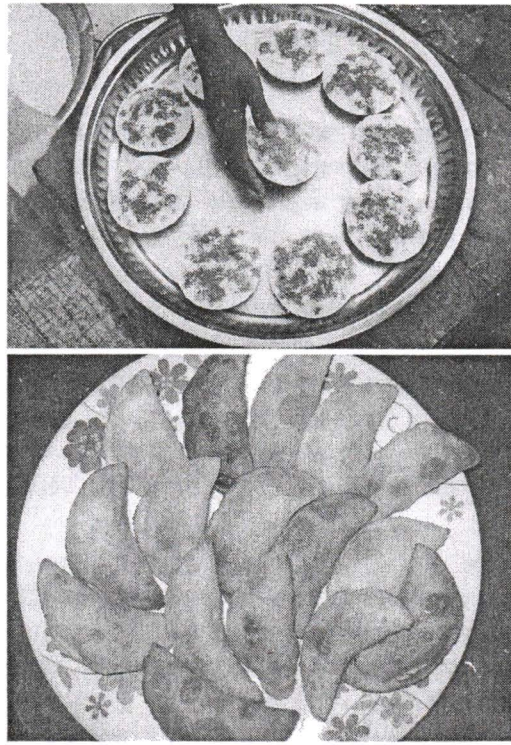

ভাপা পিঠা এবং পুলি পিঠা

গুড় বা রাব

পৌষ-মাঘ মাসে আখ বা ইক্ষু সংগ্রহ করা হতো। আখকে স্থানীয়ভাবে বলা হয় কুইয়ার। আখের রস দীর্ঘক্ষণ জ্বাল দিয়ে তৈরি হয় গুড় বা রাব। গুড় তৈরির পূর্বে যে ঘন তরল রস থাকত তা খুবই সুস্বাদু। একে বলা হতো লালি। রাব বা লালি দিয়ে চিতল পিঠা খেতে খুবই মজা। গুড় দ্বারা তৈরি একটি খাবারের নাম ছিল কাঁঠালকুশি। বারুণী মেলায় দোকানিরা খৈ এবং গুড় দ্বারা বিশেষ ধরনের খাবার তৈরি করতেন যার নাম ছিল উড়কা।

তিলুয়া

বিশেষ এক ধরনের চিনি মিশ্রিত শুষ্ক ও শক্ত মিষ্টি, স্থানীয়ভাবে এর নাম তিলুয়া। পৌষ-পার্বণের সময় মিষ্টির দোকানে এই মিষ্টির অনেক চাহিদা থাকে। এই দিনে লোকজন সারা দিন আনন্দে কাটায়। অনেকে বাজার থেকে কিনে নিয়ে বাড়ি বাড়ি

www.pathagar.com

বেড়াতে যায়। বিভিন্ন বাড়িতে তারা পিঠা ও তিলুয়া দ্বারা আপ্যায়িত হয়। পৌষ-পার্বণকে স্থানীয় ভাবে বলা হয় তিলর সংক্রান্তি।

বাঁশের মূল

কুলাউড়া-জুড়ী অঞ্চলে একটি সুস্বাদু খাবার হচ্ছে কচি বাঁশের মূল বা মুড়া পাতলা করে কেটে ডাল বা হাঁসের মাংস দিয়ে রান্না করা। কচি বাঁশের মূলকে বলা হয় করিল। সাধারণত আঞ্চলিকভাবে জাই বা বরোয়া বাঁশের কচি মূল খাওয়ার প্রচলন ছিল।

মণিপুরীদের খাদ্য

ঐতিহ্যগতভাবে মণিপুরীদের নিজস্ব খাবার রয়েছে। তাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অধুনা নাগরিক সভ্যতার প্রভাব, বৃহৎ বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রভাব ইত্যাদি থাকলেও তারা নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধরে রেখেছেন। এখানে তাদের নিজস্ব খাবারের কতিপয় বিষয় উল্লেখিত হলো–

খার : এক ধরনের উদ্ভিদজাত তরকারি। লতা-পাতা থেকে রস নিঃসৃত করে তৈরি হয়।

খুত : এ খাবার চাউল গুড়ো করে চিংড়ি মাছ বা অন্য ছোট মাছ একত্র করে পানি মিশিয়ে দিয়ে আঠালো করে তৈরি করা হয়। এতে তেল, পেঁয়াজ, রসুন ব্যবহার করা হয় না।

ইরলপা : সবজি সিদ্ধ করার পর লবণ, মরিচ ও সিঁদল একত্র করে ইরলপা তৈরি করা হয়।

পানতেই : কাঁচা মরিচ, লবণ ও শুটকিসহ তৈরি করা হয়।

ভসইর ইরলপা : কচিবাঁশ বা কুরিল সংগ্রহ করে কুচি কুচি করে কেটে নিয়ে এটি তৈরি করা হয়।

সিঞ্জু : সালাদ জাতীয় কিন্তু সালাদ না। আদার পাতা কুচি কুচি করে ভেষজ উদ্ভিদ পাতা কেটে নিয়ে লবণ, কাঁচা মরিচ মিশিয়ে তৈরি করা হয়। অথবা বিভিন্ন জাতের কাঁচা-পাকা ফল একত্রে করে ছোট ছোট করে কেটে নিয়ে তৈরি করা হয়।

গুড়া : চাল ভেজে তার সঙ্গে শুটকি, কাঁচা মরিচ ভাজা করে পিষিয়ে গুড়া করে নিতে হয়। এগুলো একত্র মিশিয়ে খাবার তৈরি করা হয়, কাঁঠালপাতা চামচের মতো ব্যবহার করে খেতে হয়।

নিরামিষ : মণিপুরীদের মাঝে বাড়িতে এখনও নিরামিষ খাবার প্রবণতা আছে। ডিম, মাছ খেলেও হিসাব আছে। ঢালাও মাংস খাবার নিয়ম নেই।

সবজি : মণিপুরীরা সবজি উৎপাদন করে। তাদের ঘরে আশে-পাশে বারোমাস সবজি তরিতরকারি লেগেই থাকে। ভাতের থেকে সবজি তাদের প্রিয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেদের উৎপাদিত সবজি খেয়ে থাকেন।

উতি : নিজস্ব একটা খাবার। ডাল জাতীয় মাসকলাই, লতাপাতা, কলার ছড়ির অংশ জ্বালিয়ে ছাই পাওয়া যায়। তা সংরক্ষণ করে রাখা হয়। ডাল পাক করার সময় ছাঁকনির ভেতর নিয়ে পানি ডেলে দিলে ছালিবাহিত স্বচ্ছ রসটুকু ডালে দেওয়া হয়। এই ডাল খেতে সুস্বাদু।

www.pathagar.com

ইয়ামতকরা : চাউলের গুড়ো।

চাকেম পোমবা : চাউল পিষে গুড়া করা হয়। পানিতে নিয়ে লোহার কড়াই বা পাত্রে নাড়িয়ে তৈরি করা হয়।

পাকৌবা : ডালের তৈরি এক জাতীয় বড়া।

ইবমবা : ভর্তা বা চাটনির মতো মুখি, আলু ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয়।[১]

সাঁওতালদের খাদ্য

সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, বিভিন্ন ধরনের তরকারি। এরা কাঁকড়া, শূকর, হাঁস-মুরগি, গরু-মহিষ, হরিণ, খরগোস, কচ্ছপ, পাখি এমনকি কাঠবিড়ালির মাংসও খেয়ে থাকে। পাটশাক বা নালিতা শাক এদের প্রিয় খাদ্য।[২]

গারোদের খাদ্য

গারোদের প্রধান খাদ্য ফলমূল। এছাড়া তারা চাল, ডাল, সবজি, জোয়ার, ভুট্টা, ছাগল, মোরগ, হাঁস, শুকর ইত্যাদি খেয়ে থাকে। মাংস ছাড়া এদের অতিথি আপ্যায়ন হয় না। উৎসবাদিতে অতিথিরা মোরগ, শূকর ইত্যাদি নিয়ে আসেন। এরা বাঁশের চোঙায় রান্না করে এবং প্রচুর পরিমাণে মদপান করে। গারো সমাজে শুটকি মাছ প্রিয় খাদ্য।[৩]

তথ্যনির্দেশ

১. সঞ্জু সিংহ, ঘোড়ামারা, আদমপুর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ৩ জুলাই ২০১১
২. লাল বাবু সরেন, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২০ নভেম্বর ২০১১
৩. রণিজিৎ মান্দ্রব, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ১৫ আগস্ট ২০১১

www.pathagar.com

লোকনৃত্য

মণিপুরী সংস্কৃতির সবচেয়ে সমৃদ্ধ শাখা হচ্ছে মণিপুরী নৃত্য। মণিপুরী ভাষায় নৃত্যের প্রতিশব্দ হচ্ছে জাগই। এই নৃত্যে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার মাধ্যমে বৃত্ত বা উপবৃত্ত সৃষ্টি করা হয়। অত্যন্ত প্রাচীন এই নৃত্য শাস্ত্রীয় নৃত্য হিসেবে স্বীকৃত। নৃত্য মণিপুরীদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১. রাসনৃত্য

মণিপুরী সংস্কৃতির সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে রাসনৃত্য। রস থেকেই রাস কথাটির উৎপত্তি। আর রসাস্বাদনের জন্য যে ক্রীড়া বা লীলা তাই রাসলীলা। এই রাসলীলা সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। পৌরাণিক কাহিনী থেকে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাধাকে নিয়ে একটি নির্জন স্থানে রাসলীলা করতেন। শিব রাসলীলা দেখতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে রাসমণ্ডলীর দ্বাররক্ষক নিযুক্ত করেন। শিব যখন দ্বাররক্ষী রূপে রাসলীলার সুললিত সংগীত শ্রবণে মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত, তখন সেখানে পার্বতী এসে উপস্থিত হলেন। পার্বতী শিবের নিষেধ অমান্য করে রাসমণ্ডলীর দ্বার খুলে রাসলীলা দর্শন করেন। পার্বতী শিবের সাথে রাসনৃত্য করার জন্য উপযোগী স্থান খুঁজতে থাকেন। কৈলাস পর্বত থেকে নেমে এসে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে অবশেষে মণিপুরকেই রাসলীলার উপযোগী স্থান নির্বাচন করেন এবং সেখানে সাত দিন-সাত রাত শিব-পার্বতী রাসলীলা করেন।

এর দীর্ঘদিন পর মণিপুর রাজ্যের রাজা ভাগ্যচন্দ্র স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে রাসলীলার প্রবর্তন করেন। ১৭৭৯ সালের কার্তিকের পূর্ণিমায় প্রথম রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। সংগীত ও নৃত্যপ্রেমী রাজার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাজ্যের নৃত্যগুরুদের সহযোগিতায় রাসনৃত্যের আঙ্গিক, পোশাক, সংগীত ও অন্যান্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হয়। রাসলীলার পোশাক-পরিচ্ছদে, নৃত্য-গীতে এবং মঞ্চ অলংকরণে যে রাজকীয় গাম্ভীর্য দৃষ্ট হয় তা আর অন্য কোনো সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় দেখা যায় না। রাসের জন্ম হয়েছে রাজদরবারে, কিন্তু সাধারণ মণিপুরী জনগণ তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। কোমলতা ও নম্রতা এই নৃত্যের বিশেষত্ব।

২. থাবানচৌবি

বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই নাচ হয়। ১০/১২ পাঙ্গন বা মুসলিম মণিপুরী যুবক-যুবতী একত্রিত হয়ে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে জোড়া জোড়া হয়ে হাতে হাত ধরে মাটিতে জোরে শব্দ করে ছন্দের তালে হাঁটতে থাকে। একটা নির্দিষ্ট গতি রেখে গভীর রাত পর্যন্ত এই নাচ চলতে থাকে। ভরা যৌবনে বিবাহ অনুষ্ঠানে যুবক-যুবতীদের আনন্দের

www.pathagar.com

এক ধরনের উন্মাদনা বা জীবন-যৌবনের দাপট ফুটে ওঠে। সাম্প্রতিককালে ধর্মের দোহাই তুলে অনেকে এ নাচটি নিরুৎসাহিত করে চলেছেন।[১]

৩. কাটি নাচ

চা-বাগানে এর প্রধান নাম কাঠি নাচন। ফাল্গুন মাসে এই কাঠি নাচন সাধারণ হয়ে থাকে। তেলেগু সম্প্রদায়ের ১০/১৫ জনের মতো লোক এই নাচে অংশগ্রহণ করে। হাতে লাঠি বা কাঠি থাকে, এগুলো মাথার উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নৃত্য করে। একটা কাঠির সাথে আরেকটা কাঠির আঘাত লাগবে। এবং একই সঙ্গে ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ হতে থাকবে। এটা একটা চমৎকার নৃত্য।[২]

তথ্যনির্দেশ

১. সিতারা বেগম, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ৭ জুলাই ২০১১

২. ফরনা অমানিক, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ১৭ নভেম্বর ২০১১

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

জীবনের সৃষ্টির উষালগ্নে প্রাণীকুলের দৈহিক কসরত থেকে খেলাধুলার উদ্ভব। ক্রীড়া জীব মাত্রেরই সহজাত প্রবৃত্তি। ক্রীড়া থেকে সংস্কৃতির জন্ম। মৌলভীবাজার জেলার লোকজন অনেক ধরনের খেলা করে থাকেন। বর্তমানে ক্রিকেটের প্রাধান্য বিস্তারে অন্যান্য খেলা মলিন হয়ে পড়েছে। ক্রিকেটের আগে এই জায়গায় বহু বছর ফুটবলের আধিক্য ছিল। ফুটবলের পর জনপ্রিয় ও সবচেয়ে বেশি খেলা হয় কবাটি খেলা। এই খেলাকে স্থানীয় উচ্চারণে 'কপটি' বলে। এই খেলায় জাতীয় নিয়ম-কানুন অনুসৃত হয়। বিভিন্ন বয়সের মানুষের জন্য স্থান-কাল ভেদে খেলার প্রচলন ছিল। যেমন ছোট ছেলেদের জন্য ছিল কানামাছি, লুকালুকি, বাজার-বাজার, জামাই-বৌ ইত্যাদি। মেয়েরা আট-দশ বছর বয়স পর্যন্ত ফুলগুটি, কানামাছি, রান্নাবাড়া, গোল্লাছুট ইত্যাদি খেলা খেলত।

১.লাই খেলা

ছেলেরা জলের মধ্যে 'লাই'[১] খেলা খেলে থাকে। এই খেলার নিয়ম হচ্ছে জলের মধ্যে একজনের হাতে কোনো বস্তু দেওয়া হবে (অথবা না দিলেও চলবে) অর্থাৎ ধরে নিতে হবে তার হাতে 'লাই' আছে । জলের মধ্যে তাকে যে প্রথম স্পর্শ করবে তার হাতে 'লাই' চলে যাবে। পানিতে ডুব দিয়ে, সাঁতার কেটে 'লাই' রক্ষা করা হয়। অন্যজন তার কাছ থেকে 'লাই' নেওয়ার জন্য সেই রূপ প্রচেষ্টা করবে।

২. নন দাঁইড়

ছেলে-মেয়েদের কাছে জনপ্রিয় 'নন দাঁইড়' খেলা। প্রায় আট বা দশজন এই খেলায় অংশ নেয়। এই জন্য মাটিতে 'কোট' বা ছক কাটা হয়। চার/পাঁচজন খেলোয়াড় কোটের নির্ধারিত লাইনে থাকে, অন্য চার/পাঁচজন সেই লাইন অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা চালায়। প্রবেশের সময় সব খেলোয়াড়কে খুব সতর্ক থাকতে হয়। লাইনে থাকা খেলোয়াড়রা যদি ভেতরে যাওয়ার পর তাদেরকে স্পর্শ করতে পারে, তাহলে পরাজয় হবে। এভাবে লাইনের খেলোয়াড়দের এড়িয়ে একবার ভেতরে গিয়ে আবার প্রথম জায়গায় সবাই ফিরে আসতে পারলে একটি দল বিজয়ী হবে। এভাবে পরাজিত একদল লাইনে যাবে।

৩. ডাংগুটি

রাখাল ছেলেরা গরু চরাতে গিয়ে অবসর সময়ে অনেক খেলা খেলে থাকে। এই সময় 'ডাংগুটি' খেলা বেশি জনপ্রিয়। এই খেলাগুলো এখন হারিয়ে গেছে।

এক হাতে লম্বা মজবুত গাছের ডাল কেটে বানানো হয় 'ডাং' এবং হালকা কাঠ দ্বারা চার আঙ্গুল লম্বা (প্রস্থ) গুটি থাকে। ৫/৬ জন খেলায় অংশ নেয়। একটা গর্ত করে

www.pathagar.com

এর চারপাশে রেখা টেনে দেওয়া হয়। এই স্থানের ভিতর থেকে একজন খেলোয়াড় হাতের ডাং দ্বারা গুটিকে আঘাত করে দূরে ফেলে। যদি উপর দিকে থেকে সেই গুটিকে অপর খেলোয়াড়রা ধরে ফেলে তবে যে 'ডাং' মারছে সে 'আউট' হয়ে যাবে। সামনের দিকে থাকা অপর খেলোয়াড়রা গুটি আটকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। যে স্থানে গুটিকে আটকানো হবে সেই জায়গা থেকে ঐ গর্ত লক্ষ্য করে গুটিকে ছুঁড়ে দেওয়া হবে, যদি গর্ত বা তার চারপাশে এক হাতের তিন ভাগের এক ভাগ পরিমাণ জায়গায় গিয়ে গুটি পৌঁছতে পারে তবে এই খেলোয়াড় আউট হবে। যদি তা না হয়, তবে অপর খেলোয়াড় কর্তৃক যে জায়গায় গুটি গিয়ে পড়েছে, সে জায়গা থেকে ঐ 'ডাং' দ্বারা একটা চাড়ার মাধ্যমে জায়গা পরিমাপ করে গেইম সংখ্যা নির্ধারিত হবে। ছড়াটি হচ্ছে–

গাইয়া, দুইয়া, তিনা, চাইরা, পাঞ্চা, ছইল, মইল, কেরম, গুট।

অর্থাৎ নয় 'ডাং' পরিমাণ জায়গাতে একটি গেইম হবে। এভাবে এক গেইম, দুই গেইম করে পরিমাপ করতে হবে। যে প্রথম ডাং দ্বারা গুটি ছুঁড়বে তাকে আউট না করা পর্যন্ত সে খেলা চালিয়ে যাবে।

৪. সাতঘর খেলা

মাটিতে একপাশে সাতটি অন্য পাশে সাতটি ছোট গর্ত করা হয়। মাত্র দুইজন এই খেলা খেলবে। প্রত্যেক গর্তে পাঁচটি/সাতটি করে কোনো বিচি (অথবা ছোট কচুর ডাটা কেটে টুকরো করে অথবা ছাগলের শুকনো বিষ্ঠা) রেখে দিতে হয়। প্রথমজন তার দিকের সাতটি গর্তের শেষ ডানটি থেকে গুটি নিয়ে প্রত্যেকটি ঘরে দিয়ে যাবে। গুটি যেখানে শেষ হবে সেই ঘরের পর এক ঘর রেখে অন্য ঘরের গুটি সে পেয়ে যাবে। দু'জনে এই খেলা খেলে থাকে। এই খেলায় আরো অনেক নিয়ম আছে।

৫. গোল্লাছুট

অপেক্ষাকৃত কিশোর বয়সের ছেলে-মেয়েরা মাঠে এই খেলা খেলে থাকে। একটা ঘরের মধ্যে একদল খেলোয়াড় থাকবে সমান সংখ্যক, অন্যদল খেলোয়াড় তাদের আটকানোর চেষ্টা করে। দূরবর্তী একটা সীমারেখাকে ঘরে থাকা খেলোয়াড়রা দৌড়ে গিয়ে ছুঁয়ে দেবে বা ঐ জায়গা পাড়ি দেবে। অপর দলের সদস্যরা চেষ্টা করবে দৌড়ের সময় তাদেরকে ছুঁয়ে ফেলতে। যদি দৌড়ের খেলোয়াড়কে স্পর্শ করা যায়, তবে ঐ খেলোয়াড় বাদ পড়বে। এর আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে দল গঠন প্রক্রিয়া জোড়ায় জোড়ায় হবে। জোড় ছাড়া খেলা হবে না। এক জোড়া খেলোয়াড় নিজেদের নাম পরিবর্তন করে যে কোনো নাম রাখবে বা যে কোনো বস্তু হাতে রাখবে। দলনেতার কাছে এসে তারা ছড়ায়-ছড়ায় ডাক বলবে। এই দু'জনকে একত্রে 'ছলধরা' বলে। এই প্রক্রিয়ায় দল গঠন করা হয়।

৬. বন্দি

কিশোর বয়সের ছেলে-মেয়েরা এই খেলা খেলে থাকে। কুলাউড়া ও জুড়ীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের এই খেলা খেলতে দেখা গেছে। একাধিক জনকে একত্র করে একটা বৃত্ত এঁকে দেওয়া হয়। সেই খেলোয়াড়রা এই বৃত্তের মধ্যে থাকবে। অন্য

www.pathagar.com

কয়েকজন বৃত্তের বাইরে থাকবে। তাকে একটি সীমানা করে দেওয়া হবে যে, সে এক শ্বাসে ছড়া কেটে ঐ সীমায় পৌঁছার চেষ্টা করবে। যদি শ্বাস ফেলে, তবে অন্যরা ছুঁয়ে ফেললে তার পরাজয় হবে। কিন্তু যাওয়ার পথে এই খেলোয়াড় যদি অন্যজনকে ছুঁয়ে ফেলে তবে ঐ খেলোয়াড়ের পরাজয় হবে এবং খেলা থেকে বাদ পড়বে। তবে খেলার ডাক দেওয়ার ছড়াটি আকর্ষণীয়।

৭. বাঘবের

মাটির মধ্যে ঘর এঁকে বা শক্ত কাগজে ঘর এঁকে অবসর সময়ে এই খেলা করা হয়। অনেকটা দাবা খেলার মতো এই খেলা বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। তথ্য অনুসন্ধানকালে কুলাউড়ার রফিকুজ্জামান (শিক্ষক, মুকুন্দপুর) ও জুড়ি উপজেলার জহির মিয়া গরু চরানোর মাঠে নিয়ে এ খেলা দেখান। মধ্য বয়সী পুরুষরা এ খেলা দীর্ঘ সময় নিয়ে খেলেন। খেলার ছকের মধ্যে দুটো বাঘ থাকে অর্থাৎ বড় বিচি বা কাটি রাখা হয়– তারা হলো বাঘ। অপর দু'দিকে চার পুঞ্জ গরু থাকে। নির্ধারিত ছকের পথে বাঘ যাবে এবং গরুকে হত্যা করবে কিন্তু পর পর তিনটি গরু থাকলে বাঘ সামনে যেতে পারে না। আবার চারদিক থেকে গরু যদি বাঘকে ঘিরে ফেলতে পারে তবে বাঘ বন্দি হয়ে যায় এবং খেলায় বাঘের পক্ষে খেলোয়াড়ের পরাজয় ঘটে। এই খেলা দু'জন মিলে হয়। খেলাটিতে বেশ স্থির বুদ্ধির প্রয়োজন পড়ে। দীর্ঘ সময় নিয়ে এই খেলা চলে। এই জাতীয় আরেকটি খেলা হচ্ছে 'মঙ্গলকাটা'।

৮. ফেছকুনার লেঞ্জ

ফিঙে পাখিকে কুলাউড়া অঞ্চলে 'ফেছকুনা' বলা হয়। তার লম্বা লেজ অনুসারে সম্ভবত এই খেলার ঘর তৈরি করা হয় বিধায় এই খেলাকে আঞ্চলিক ভাষায় ফেছকুনার লেঞ্জ বলা হয়। মাটিতে পাখির লেজের মতো দুদিকে পরস্পর বিপরীতমুখী ঘর আঁকা হয়। মধ্যে বড় কাঠি বা বিচি থাকে। অন্যান্য ঘরে ছোট গুটি থাকে। ছোট গুটি দ্বারা ছক অনুসারে বড় গুটিকে আটকানো হয়। যদি বড় গুটি আটকানো সম্ভব হয়, তবে সে খেলোয়াড়ের পরাজয় হয়।

৯. নৌকা বাইচ

রাজনগর উপজেলার কাউয়া দিঘি হাওরে প্রতি বছর নৌকা বাইচ হয়। হাওরের চতুর্পার্শ্বের গ্রামগুলির জনসাধারণ নৌকা বাইচ উপভোগ করে থাকেন। কাউয়া দিঘি হাওরের নিকটেই অন্তেহরি গ্রাম। এ এলাকার মধ্যে গ্রামটি বেশ বড়। বর্ষার সময় শহরের সাথে তাদের যোগাযোগ এখনও নৌকা ছাড়া উপায় নাই।

অন্তেহরি গ্রামে প্রাচীনকাল থেকেই নৌকা বাইচের জন্য লম্বা নৌকা তৈরি হয়ে আসছে। প্রতি বছর বর্ষায় নৌকা বাইচ হয়। অন্তেহরি গ্রামে বাবু গোপেন্দ্র দাশের দুটি লম্বা নৌকা রয়েছে। গ্রামের বাছাই করা বাইচা রয়েছে। নৌকা বাইচের সময় তাদের মধ্যে কেহ ঢোল, কেহ কর্তাল, কেহ ঝান বাজিয়ে থাকেন। এদের মধ্যে একজন মধুর সুরে গান করেন। বাকি সকল বাইচা দোহার দিয়ে থাকেন। নৌকাগুলি সাধারণত ৫০-৬০ হাত লম্বা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

কাউয়া দিঘি হাওরের পূর্ব প্রান্তে বড়গাঁও গ্রামের মৃত আব্দুর রউফ (সাবেক চেয়ারম্যান ও লন্ডন প্রবাসী) শখ করে নৌকা বাইচের জন্য পর্যায়ক্রমে কয়েকটি লম্বা নৌকা তৈরি করেছিলেন। আব্দুর রউফ প্রথম নৌকা তৈরি করে কাউয়া দিঘি হাওরে প্রথম নৌকা নিয়ে বাতাসা দিয়ে লুট দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ লাভের জন্য বুড়িকোনা (একাটুনা ইউনিয়ন) অজ্ঞান ঠাকুরের আস্তানায় গিয়েছিলেন। প্রথম প্রতিযোগিতায় নৌকা বাইচে জয়লাভ করে তার উৎসাহ বাড়তে থাকে। তিনি তার লম্বা নৌকা নিয়ে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার পেয়েছিলেন।

আব্দুর রউফ মৃত্যুবরণ করলে তার প্রিয় নৌকাটি তার বাড়ির নিকটে রেখে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নৌকার গলুই-এ মোমবাতি জ্বালানো হতো। আব্দুর রউফ লন্ডনীর মৃত্যুর পর তার অনুসারী অন্নদা দাশ লন্ডনীর পরিবারকে একদিন বললেন, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন লন্ডনী সাহেবের নৌকাটি মাটির নিচে কবর দিয়ে রাখতে। তার কথামতো নৌকাটি কবর দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে লন্ডনী সাহেবের ছোট ছেলে কায়ছুল ইসলাম কাবুল লন্ডন থেকে এসে একটি লম্বা নৌকা তৈরি করলে স্বপ্নে তার পিতার নির্দেশ পান যে, পূর্বে তার পিতার নৌকা যেভাবে রাখা ছিল এই নৌকাটিও ঠিক সেভাবে রাখতে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় নৌকাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিতে হবে। উনার ছোট ছেলে পিতার কথামতো তাই করেছেন। আজও এই নৌকাটি লন্ডনী সাহেবের বাড়ির সামনে শোভা পাচ্ছে।

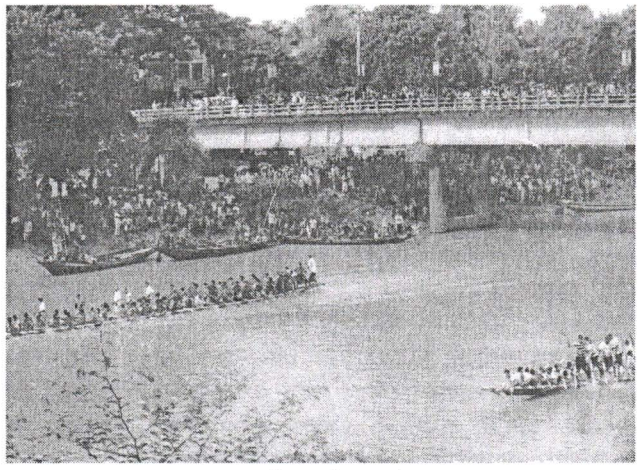

মনু নদীতে নৌকা বাইচ

মুন্সিবাজার ইউনিয়নের মেদিনীমহলের গেদু মিয়ার একটি লম্বা নৌকা রয়েছে যা বড়গাঁও নিবাসী আব্দুর রউফ মিয়ার ছোট ছেলের নিকট থেকে ক্রয় করে নিয়েছেন।

একই এলাকার বনমালী পঞ্চেশ্বর গ্রামের একজন মহিলা আমিনা বেগম (লন্ডন প্রবাসী) শখ করে নৌকা বাইচের জন্য লম্বা নৌকা তৈরি করে প্রতি বছর নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। তিনি খুব আন্তরিক, এলাকার যুব সম্প্রদায়কে

www.pathagar.com

নৌকা বাইচের মাধ্যমে আনন্দ দিয়ে থাকেন। ভানুর মহর গ্রামের একটি সমিতির লম্বা নৌকা ছিল। লম্বা নৌকাটি পরিচালনা করতেন সমিতির সভাপতি মবশ্বির মিয়া। বর্তমানে নৌকাটি বিক্রি করা হয়েছে। লন্ডন থেকে তিনি প্রায় প্রতি বছর দেশে আসতেন। ভানুর মহল, বড়গাঁও, অন্তেহরি, বনমালী পঞ্চেশ্বর, মেদিনীমহল অঞ্চলের নৌকাগুলি প্রতি বছর নৌকা বাইচে অংশগ্রহণ করে থাকে। কাউয়া দিঘি, মনু নদী ও কুশিয়ারা নদীতে এই নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা হয়ে আসছে। স্থানীয় কিছু সংগঠন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকেন।

১০.লাঠিখেলা

কুলাউড়াতে লাঠিখেলার প্রচলন রয়েছে। বর্তমানে কুলাউড়ার মুকুন্দপুরের কয়েকজন বয়স্ক লোক এই খেলা করে থাকেন। বাদ্যযন্ত্রের তালে-তালে তারা লম্বা লাঠি দ্বারা একে অপরকে আক্রমণ করেন। এই খেলায় দু'জন অংশ নেয়। আক্রমণ প্রতিআক্রমণ চলার সময় যিনি হাতের লাঠি ফেলে দেবেন, তিনি পরাজিত। কিন্তু সমান তালে শক্তি থাকলে বাজনার তালে তালে দুজন একত্রে রণভঙ্গ করেন। এটি খুবই উপভোগ্য খেলা।

১১. শক্তি পরীক্ষার খেলা

এক সময় বলবান পুরুষরা আনুষ্ঠানিক কুস্তি করতেন। শক্তিবান দু'জন পুরুষ পরস্পরের হাতে ধরে পাঞ্জা লড়তেন। এই খেলাও ছিল আনন্দের।

শক্তি পরীক্ষার অপর খেলার নাম 'ছটা' বা 'ছটাক টানা'। দুজন শক্তিধর ব্যক্তি সামনা-সামনি বসে একটা লাঠির মধ্যে দু'জন হাত রাখবেন। রেফারি সংকেত দেওয়ার সাথে সাথে দুজন টানাটানি শুরু করবেন; যে যাকে বসা থেকে উঠাতে পারবেন তিনি পরাজিত হবেন।

১২. অন্যান্য খেলা

কুলাউড়া অঞ্চলের প্রাচীন লোকদের সাথে আলাপ করে জানা যায়– আগের আনন্দপূর্ণ বহু খেলা হারিয়ে গেছে, যেমন দুরন্ত ছেলেরা গাছে গাছে উঠে একটা খেলা খেলে। একজন বলবে- ডাংডিং ভাই গাছও কেনে?

অন্যজন বলবে- বাঘের ভয়ে।

আবার প্রশ্ন- বাঘ কোথায়?

উত্তরে বলবে- মাটির তলে।

পুনরায় প্রশ্ন- তোমরা কয় ভাই?

উত্তর- সাত ভাই।

আমারে একজন দাও না?

ছুঁইতে পারলে দিব।

এই বলে উত্তরদাতা ছেলেটি গাছে উঠে যাবে। এবং অন্যরা গাছে গাছে চড়ে তাকে ছুঁয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে।

www.pathagar.com

এছাড়া ছোট ছোট ছেলেরা 'দুন্দিঘিলা' নামে একটা খেলায় আনন্দ পেত। মাটিতে ছোট এক ধরনের পোকা খুঁজে সেটা মাটির উপরে নিয়ে এসে চারদিকে আঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত করে বলত–

দুন্দিঘিলা নাচ দে।
সাবরে দেখে সালাম দে।

পোকাটাও ঘুরত এবং শিশুরা আনন্দ পেত।

আরেকটি খেলা ছিল কাদামাটি দ্বারা রং-ঢং-এর সম্পর্কিত ব্যক্তিকে ছিটানো।

কুলাউড়া উপজেলায় এক সময় খেলাধুলার বাইরে বিনোদনের জন্য ষাঁড়ের লড়াই ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। এগুলো এখন প্রায় বিলুপ্ত।

১৩. বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর প্রচলিত খেলা

গদা খেলা

চা-বাগানে প্রাচীন খেলা হচ্ছে গদা খেলা। শক্তিশালী দুজন ব্যক্তি ১৫/২০ কেজি ওজনের গদা হাতে নিয়া মাথার উপর দিয়ে চক্কর বা ঘুরাতে থাকবে। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এটি ধরে রাখতে পারলে বিজয়ী হবে। এখনও গদা খেলা চালু আছে।

কুস্তি খেলা

কুস্তি চা-বাগানে একটা প্রাচীন খেলা। নির্দিষ্ট নীতি মেনে এই খেলা চালাতে হয়। নাগ প্রতিষ্ঠার দিনে সাধারণ এই খেলাটি হয়ে থাকে। এ খেলায় নির্দিষ্ট তারিখ থাকে। খেলায় প্রতিপক্ষকে চিত করে শুইয়ে দিতে না পারলে জয় হবে না। অধুনা রেসলিং খেলা আমরা দেখে আসছি। বহু আগে থেকে কুস্তি খেলার প্রচলন আছে। এখন এর আধুনিকায়ন হয়ে দুনিয়াব্যাপী এটা দর্শনীয় হয়ে উঠেছে।

দৌড় খেলা

চা-বাগানে দৌড় খেলার প্রচলন আছে। একজন দৌড়ে গিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে সবার আগে পৌঁছাতে হবে।

মুরগের লড়াই খেলা

চা-বাগানে মুরগের লড়াই খেলা প্রচলিত। মাঠে এ খেলাটা হয়ে থাকে।

ছেলে খেলা

গারো সমাজে প্রাচীন খেলা হচ্ছে ছেলে খেলা। প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি গ্রুপে মহিলা ও পুরুষ থাকে। গানে গানে এই খেলায় দুপক্ষে প্রতিযোগিতা চলে। গানে গানে পাল্টাপাল্টি হয়।

গ্রিকা

গারো সমাজে প্রাচীন খেলা কুস্তি, গারো ভাষায় তাকে গ্রিকা বলে। সৎ মা ও মাবাকদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা হয়। দুটি গোষ্ঠীর শক্তি পরীক্ষা হয়ে থাকে। পরাজিত পক্ষকে খোটা খেতে হয়। খোটা মানে তুচ্ছ বা বদনাম পোয়াতে হয়।

www.pathagar.com

তীর ছোঁড়া

সাঁওতালদের জনপ্রিয় একটি খেলা। তীর-ধনুক মূলত শিকারের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে সাঁওতালরা কে কত দূরে তীর ছুঁড়তে পারে তার প্রতিযোগিতা করে থাকে।

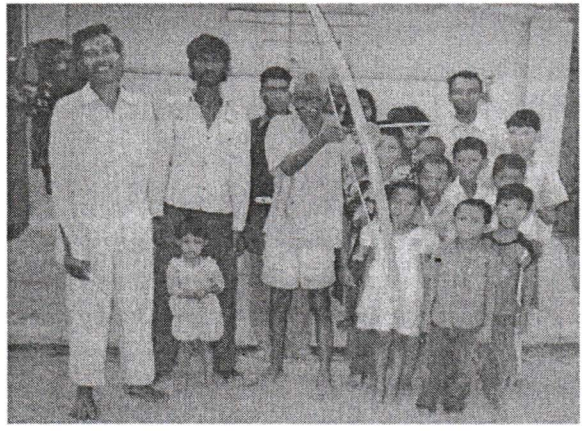

কমলগঞ্জের মাধবপুর চা-বাগানের একজন বয়স্ক সাঁওতাল
ঐতিহ্যবাহী তীর নিক্ষেপ দেখাচ্ছেন

কাং

পাথান বা মণিপুরী মুসলমানদের একটা ঐতিহ্যবাহী লোকখেলা কাং। ৬´´ লম্বা – ৪´´ পাশ মহিষের শিং কেটে গুটি তৈরি করা হয়। তাতে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুটি থাকে। ২টি গুটি এক সাথে জোড়া করে ছুঁড়ে দিয়ে এই খেলাটি চালাতে হয়। খেলাটি আকর্ষণীয়। মুসলিম মণিপুরী সমাজে এ খেলাটি বিদ্যমান আছে। এটি তাদের জাতীয় খেলা।

তথ্যসহায়ক

১. রফিকুজ্জামান, মুকুন্দপুর, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ২ নভেম্বর ২০১১
২. ঈশুতোষ চক্রবর্তী, বড়লেখা, সংগ্রহের তারিখ : ৫ নভেম্বর ২০১১
৩. সরোজ গোস্বামী, ঘোষপুর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২ ডিসেম্বর ২০১১
৪. মুকুল চন্দ্র দে, ভবানীপুর, জুড়ী, সংগ্রহের তারিখ : ১ জানুয়ারি ২০১২
৫. কবি নৃপেন্দ্র লাল দাশ, পূর্বাশা, শ্রীমঙ্গল, সংগ্রহের তারিখ : ৮ জানুয়ারি ২০১১
৬. সৈয়দ আব্দুল মোত্তালিব রঞ্জু, মৌলভীবাজার সদর, সংগ্রহের তারিখ : ৫ জানুয়ারি ২০১১
৭. সিতারা বেগম, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ৭ জুলাই ২০১১
৮. রণিজিৎ মান্দ্রব, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ১৫ আগস্ট ২০১১

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

মৌলভীবাজার জেলায় প্রাচীন কিছু লোক সম্প্রদায় দেখা যায়। তন্মধ্যে শব্দকর ও হিরালী সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি ও কৃষ্টি রয়েছে। তাদের সাংস্কৃতিক নানা তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো।

১. শব্দকর

শব্দকররা সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠী। স্থানীয়ভাবে তারা হিন্দু-মুসলমানের কাছে অচ্ছুৎ। তাদেরকে কারও ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। অথচ তারা এ অঞ্চলের আদি জনগোষ্ঠী বলে ধারণা করা হয়। তারা অতি পুরাতন ধ্যান-ধারণা ও লোকাচার নিয়ে দৈনন্দিন জীবনযাপন করেন। মূলত তারা কৃষিকাজের সাথে জড়িত। এই সমাজের নারীরা খুব মুক্ত। তারা আজও লেখাপড়ায় আসতে পারেনি। প্রবীণ শব্দকর নেতারা বলেন, এক সময় তারা সূর্য বংশের ছিলেন। মুনির অভিশাপে তারা সমাজে অচ্ছুৎ হয়ে আছেন। শব্দকররা কখনও কোনো রাজশাসনের অনুকূলে আসেনি। ধারণা করা হয়, হযরত শাহজালাল (র.) সিলেট বিজয় করলে শব্দকর সমাজ তা মেনে নিতে পারেনি। দূর অতীতে শৈব সাধনার সাথে বা শিব দেবতার সাথে নিজেদেরকে কেন মিশিয়েছিলেন তা আজও অজানা। শব্দকর পুরুষরা শিবের মতো ভাং ও গাঁজা খেতেন। দেখতে তারা সুঠাম ও কালো রংয়ের। তারা একই পাড়ায় বসবাস করেন। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের কোনো ছাপ পরিলক্ষিত হয় না। নিজেরাই নিজেদের ধর্মীয় কাজকর্ম পরিচালনা করেন। পরবর্তী সময় ব্রাহ্মণ্যবাদের কিছু প্রভাব তাদের উপর পড়ে। শব্দকর সমাজে পূজা-পার্বণের চেয়ে গান-বাজনা, ধামাইল ইত্যাদি বেশি করতে দেখা যায়। চড়ক পূজা তাদের প্রধান উৎসব। চড়ক পূজার সময় তারা শিবের নৃত্য ও কালীনৃত্য করে থাকেন। এই সময় তারা নানারূপ সংস্কার মেনে চলেন এবং পিঠে বড়শি গেঁথে চক্কর দেন। চড়ক নৃত্যের সময় বড় বড় রামদা নিয়ে তাদেরকে তাণ্ডব নৃত্য সংহারে জাতীয় নৃত্য করতে দেখা যায়। তারা নাচতে নাচতে ধারালো দায়ের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য করেন।

শব্দকরদের নিম্নজীবি পেশা গ্রহণ করতে দেখা যায়। যেমন, দীর্ঘদিন তারা তামাকের টিকি তৈরি করে বিক্রি করতেন। এই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা দিন দিন লুপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে। চরম দারিদ্র্যের কারণে জীবনীশক্তিও কম বলে অনেকে ধারণা করেন। কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, জুড়ী ও কুলাউড়া উপজেলায় একসময় শব্দকরদের বসবাস থাকলেও আজ এই সম্প্রদায় দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। কমলগঞ্জ ও শ্রীমঙ্গলে এ সম্প্রদায়ের সর্বাধিক লোক দেখতে পাওয়া যায়। শব্দকর মহিলারা ধামাইল গানে খুবই পারদর্শী। চরম দরিদ্র অবস্থায় তারা জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত হয়ে বিলুপ্তির পথ ধরেছেন।[১]

www.pathagar.com

কমলগঞ্জের শব্দকর অধ্যুষিত বাড়িটেকি গ্রামে জনৈক শব্দকর মহিলা চাটাইয়ে টিকি তৈরি করছেন

শব্দকর সমাজের প্রবীণ এক ব্যক্তির সাথে আলোচনারত প্রধান সমন্বয়কারী মাহফুজুর রহমান ও সংগ্রাহক আহমদ সিরাজ, *স্থান : মইডাইল, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার*

২. হিরালী

শ্রীমঙ্গলের হিরালী বা হিরাল জিতেন্দ্র মোহন অধিকারী বংশানুক্রমে এই পেশা পেয়ে এসেছেন। তার পিতা- মৃত মহেন্দ্র মোহন অধিকারী, মাতা- মৃত রত্না শর্মা অধিকারী, দাদা- মৃত কৃষ্ণ ঠাকুর। তার বয়স ৬৫ বছর, তিনি ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। তার জানা মতে ১৫০ বছরের বেশি সময় ধরে তারা এই পেশায় নিয়োজিত

বিলুপ্ত প্রায় হিরাল সম্প্রদায়ের জিতেন্দ্র অধিকারী, হাওর অঞ্চল শ্রীমঙ্গল

আছেন। হিরাল বা হিরালী শব্দটি কিভাবে হয়েছে তা তার জানা নেই। তবে এই ঝড়-বৃষ্টি, দুর্ভোগ-এর কবল থেকে কৃষকের ফসল রক্ষা করার জন্য মন্ত্রযোগে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিছু কঠিন নিয়ম অবশ্য পালনীয়।

তিনি জানান– এই প্রক্রিয়ার তিন মাস একাই একটা ব্রত পালন করতে হয়। ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ এই তিন মাস হিরালীকে নিরামিষ খেতে হয়। ত্রিশূল, শিঙ্গা হাতে রাখতে হয়। এসময় নিজে পাক করে খেতে হবে। তবে মাছ-মাংস খাওয়া

www.pathagar.com

একেবারে নিষেধ। অন্য লোকের হাতেও কিছু খাওয়া যাবে না। স্ত্রী-সংযোগ বা সম্পর্ক রক্ষা করা যাবে না। ঘুমানোর সময় লেপ-তোষক ব্যবহার করা যাবে না।

কোনো পাত্র দিয়ে জল খাওয়া যাবে না। এসময় তেল-সাবান ব্যবহার করা যাবে না। ছাতা মাথায় দেওয়া যাবে না। জুতা পায়ে দেওয়া যাবে না। পরনে কেবল লাল শার্ট, লাল ধুতি পরতে হবে। নখ, চুল, দাড়ি কিছুই কাটা যাবে না। ঝড়, শিলা, বৃষ্টি শুরুর আগে কৃষকের বাড়ি গিয়ে তাবিজ পুঁতে পাঠ পড়া, বালু পড়া দিয়ে আসতে হবে। এগুলো করেই অপশক্তিতে বাঁধতে হয়। তাবিজ মাটিতে পুঁততে উপতা মানে উল্টো বাঁশ, চুল্লি ব্যবহার করতে হয়। বিশ্বাস যে এই তাবিজ মাটিতে পুঁতার পর আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাঁশও পাওয়া যাবে না।

ঝড় শিলাবৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে কৃষকের কাছ থেকে জমির সীমানা, আয়তন জেনে নিয়ে হিরাল ত্রিশূল, নিজস্ব লাল পোশাক পড়ে চক্কর দিয়ে দেখে নেবে। তারপর সীমানার জমিনে মন্ত্রপাঠ করবে।

জল বা শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে প্রবল আশংকা বিদ্যমান হলে হিরাল বিশেষ ভঙ্গিমায় একের পর এক মন্ত্রপাঠ করে শিলাবৃষ্টিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

শ্রীমঙ্গল এর হাইল হাওর, পুটিজুড়ী, ইছবপুর, ভাড়াউড়া, বরুণা, মাজদি, মনারগাঁও, নয়নবিবি, রাজাপুর, সিরাজনগর, কালাপুর, ভাগলপুর, কালাপুর ইত্যাদি হচ্ছে হিরালের কাজের ক্ষেত্র। এইসব এলাকার উপকারভোগী কৃষকরা বছরান্তে সম্মানী হিসেবে চাল, ধান, টাকা দিবে। বছরে সম্মানী হিসাবে ২০০ মণের মতো হয়ে যায়। এ নিয়ে কোনো দাবি বা জোর-জবরদস্তি নেই। কৃষকরা স্বেচ্ছায় এগুলো দিয়ে থাকে।

জিতেন্দ্র মোহনরা চার ভাই। সচিন্দ্র মোহন অধিকারী, দেবেন্দ্র মোহন অধিকারী ও ধীরেন্দ্র মোহন অধিকারী এই তিনজন মারা যাওয়ার পর তিনি বেঁচে আছেন। তার লেখাপড়া জানা সন্তান এই পেশায় আসতে রাজি নয়। পড়ালেখা করার কারণে প্রাচীন লোকবিশ্বাসের এই পেশার ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

গ্রামাঞ্চলের মানুষের মাঝে এ বিশ্বাস এখনও প্রবল হয়ে আছে যে, হিরালীরা ঝড়-বৃষ্টি থামাতে পারে। আবহাওয়া প্রতিনিয়ত বার্তা দিয়ে মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়ের জানান দিলেও এই অঞ্চলে বিশেষত হাওরের লোকজন শিলাবৃষ্টির আঘাত থেকে ফসল রক্ষায় হিরালীর আশ্রয় নিয়ে থাকে। শিলাবৃষ্টি সর্বত্র একই সঙ্গে হয় না। সম্ভবত যে স্থানে শিলাবৃষ্টি হয়, পরক্ষণেই সর্বত্র সরে যাচ্ছে কিংবা কোথায়ও হচ্ছে, অন্যত্র হচ্ছে না, এই বৃষ্টির চলমানতা বিশেষ শিলাবৃষ্টির এই স্থানান্তর, এটিকে তারা হিরালীর মন্ত্রশক্তি হিসেবে দেখেছেন।[২]

৩. নমশূদ্র

নমশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের বসতবাড়ি হাওর ও নদীর তীরবর্তী স্থানে তৈরি করে। সারা বছর মাছ শিকার করে বাজারে বিক্রি করে জীবন-জীবিকা চালিয়ে আসছেন। এখনও এই সম্প্রদায়ের ৩০/৪০ ভাগ জনগোষ্ঠী এই পেশায় নিয়োজিত আছেন। কিন্তু তাদের জীবন-জীবিকা এখন খুবই কষ্টের। কারণ আগের মতো আর জলাশয় নেই। বাকি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে। কিছু লোক শিক্ষা গ্রহণ করে চাকরি করছেন। অনেকে বিদেশেও পাড়ি দিয়েছেন।

www.pathagar.com

৪. বাদ্যকর

বাদ্যকর সম্প্রদায়ের লোকজন আদিকাল থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে বাদ্য বাজিয়ে ও কাজকর্ম করে জীবিকা রক্ষা করে এসেছে। কিন্তু বর্তমানে তাদের পক্ষে শুধুমাত্র এই পেশার উপর নির্ভর করে জীবন চালানো সম্ভব নয়। তাই তারা অনেকেই নিজ পেশার পাশাপাশি রিকশা চালানো ও দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এই সম্প্রদায়ের লোক শিক্ষার দিকে অনগ্রসর। বাদ্যকর মহিলারা এঁটেল মাটি দিয়ে সিকর তৈরি করে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করে থাকেন। নিম্ন আয়ের অনেকেই এই সিকর খেতে পছন্দ করে। বাদ্যকর মহিলারা টিকি (চাই দিয়ে মণ্ড করে বাতাসার ন্যায়) তৈরি করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা পূজার সময় ধুনা দেওয়ার জন্য টিকি ব্যবহার করেন। বয়স্ক লোকেদের হুক্কা দিয়ে তামাক খেতে হলে টিকির প্রয়োজন হয়। আজকাল হুক্কা গ্রামে-গঞ্জেও দেখা যায় না। বাজারে বিভিন্ন প্রকার সিগারেট থাকায় গ্রামের মানুষও হুক্কা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।

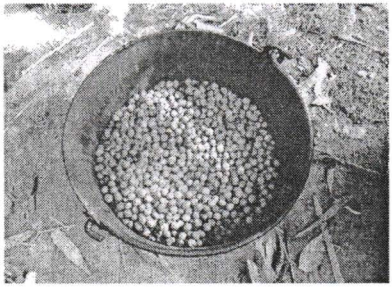

সিকর তৈরি হচ্ছে

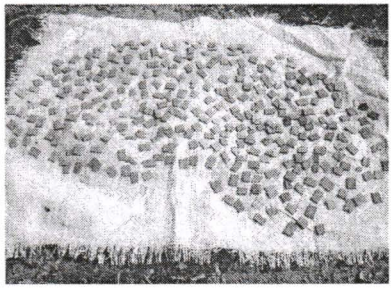

সিকর রোদে শুকানো হচ্ছে

৫. রুহীদাস

এই সম্প্রদায়কে আজকাল দেখা যায় প্রধানত শহরে জুতা সেলাই ও কালির কাজ করতে। এক সময় গ্রামে গ্রামে এদেরকে লাঠি হাতে ঘুরতে দেখা যেত। গরু মারা গেলে মৃত গরুটির শরীর থেকে চামড়া পৃথক করে চামড়া বিক্রি করে ও চামড়ার ছোট ছোট ব্যবসা করে জীবন চালাত। আজকাল গ্রামে রুহীদাস বা স্থানীয় ভাবে প্রচলিত মুচি সম্প্রদায়কে দেখা যায় না, তারা শহরে চামড়ার জুতা ও ব্যাগ সেলাই করে জীবন চালাচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায় পিছনে পড়ে আছে।

৬. ধোপা

ধোপা বা শুক্লবৈদ্য সম্প্রদায়কে আজকাল তাদের জাতি-পেশায় তেমন দেখা যায় না। মূলত কাপড় ধোয়া এদের কাজ। কিন্তু আগের দিনে গ্রামভিত্তিক সমাজে এদের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। গ্রামের কোনো পরিবারকে সামাজিকভাবে হেয় করতে চাইলে তার বাড়িতে ধোপার প্রবেশ নিষেধ করা হতো। আজ আর সেই দিন নেই। ধোপার প্রয়োজনীয়তা গ্রামে কমে এসেছে। অনেকেই তাদের কাপড় ধোলাইয়ের পেশা ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন, অনেকে অন্য ব্যবসার সাথে জড়িত হয়েছেন। কেউ চাকরি

www.pathagar.com

করছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকেই অগ্রসর। মৌলভীবাজার ও রাজনগরের বেশ কয়েকটি গ্রামে এই সম্প্রদায় বসবাস করছেন।

৭. বারই

বারই সম্প্রদায় হলো যারা পানের চাষ করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। অস্ট্রিক সমাজ থেকে পান চাষ বা পানের বরজ দেওয়ার সংস্কৃতি এসেছে। খাসিয়ারা পানচাষ করে থাকে। তাদের কাছ থেকে ক্রমে স্থানীয় বাঙালি সমাজে এসেছে। বারই সম্প্রদায় আজ আর পানচাষের উপর নির্ভরশীল নয়। তারা অন্য পেশার সাথে জড়িত হয়ে জীবন চালাচ্ছে। অনেকেই বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। শিক্ষার দিকে অনেকে অগ্রসর হয়ে গেছে। মৌলভীবাজার ও রাজনগর উপজেলাতে এই সম্প্রদায় বসবাস করছেন। এখনো কয়েকটি গ্রামে তারা পানের চাষ করছেন।

৮. মেথর

মেথর সম্প্রদায় শহরের আবর্জনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিজেদের জীবিকা রক্ষা করছে ও পাশাপাশি শহরকে আমাদের বসবাসের উপযোগী রাখছে। তাদের পেশার কোনো পরিবর্তন নেই। মেথর সম্প্রদায়ের কিছু লোক নাইট গার্ড বা পাহারাদারের চাকুরি করছে। তাদের শিক্ষার অবস্থা তেমন অগ্রসর নয়। অল্প কিছু শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেই তারা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অফিসে ঝাড়ুদারের কাজ করছে।

৯. গোয়ালা

গোয়ালা সম্প্রদায়কে স্থানীয়ভাবে ঘোষ বলা হয়। এই সম্প্রদায়ের এককালে বেশ নামডাক ছিল। তাদের পেশা দুধ ও দধি বিক্রি করে জীবন চালানো। এক সময় তাদের গোয়াল ভরা গরু ছিল। আজকাল এই পেশার লোকজন অন্য পেশার সাথে জড়িত হয়ে জীবন চালাচ্ছেন। শিক্ষার হার মোটামুটি ভালো। মৌলভীবাজার ও রাজনগর উপজেলার কয়েকটি এলাকায় এই সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করছেন।

১০. নাপিত

নাপিত বা চন্দ্রবৈদ্য সম্প্রদায়ের জাত পেশাই ছিল চুল কাটা ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়েসহ কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নখ কাটা। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নাপিতের হাত ধরেই প্রথম ঘরের বাইরে এসে পৃথিবীর আলো দেখতে পেত। আজকাল অনেকেই তাদের পূর্বপুরুষের পেশা ছেড়ে বিদেশগামী হয়েছেন। অনেকে অন্য ব্যবসা ও পেশার সাথে জড়িত হয়েছেন। শিক্ষার দিকে কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন। মৌলভীবাজার ও রাজনগর উপজেলার কয়েকটি গ্রামে তারা বসবাস করছেন।

১১. কামার

কামাররা লৌহজাত দ্রব্য দিয়ে কুড়াল, দা, কোদালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন লৌহজাত জিনিস তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। আজকাল অর্থের কারণে এই শ্রেণির লোক ঐতিহ্যবাহী এই পেশায় আগ্রহী না হয়ে অন্য পেশা ও ব্যবসার সাথে জড়িত হয়েছেন। তাদের জাতব্যবসাও অনেকে করছেন। শিক্ষার দিকে অনেকে অগ্রসর হয়েছে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে পাঁচগাঁও-এর কর্মকারগণ সমরাস্ত্র তৈরি ও যোগান দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। উপমহাদেশের অন্যতম কর্মকার জনার্দন মোগল আমলে

www.pathagar.com

মুর্শিদাবাদে জাহান কোষা তোপ নির্মাণ করে রাজনগরের পাঁচগাঁওকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেন। ঢাকাতে জনার্দন কর্মকার-এর জম জম ও বিবি মরিয়ম নামে দু'খানা কামান ব্রিটিশদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১২. কুমার

কুমার সম্প্রদায়ের মানুষ মাটির জিনিসপত্র তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। পূজার সময় তারা প্রতিমা নির্মাণ করেন। কিন্তু আজকাল প্লাষ্টিক ও মেলামাইনের টেকসই তৈজসপত্র বাজারে চলে আসায় তাদের পেশা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এই সম্প্রদায়ের লোকজন নিজ পেশা ছেড়ে অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত আছেন।

১৩. পোদ্দার

পোদ্দার বা বানিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন স্বর্ণ তৈরির ব্যবসার সাথে জড়িত। পোদ্দার এক সময় ছিল বংশানুক্রমিক পেশা। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এই পেশায় নিয়োজিত আছেন। মৌলভীবাজার ও রাজনগর উপজেলায় পোদ্দার সম্প্রদায়ের অনেক লোক বসবাস করছেন। অনেক পরিবার নিজ পেশা ছেড়ে অন্য পেশার সাথে জড়িত রয়েছেন। মৌলভীবাজার সদর ও রাজনগর এলাকায় পোদ্দার পরিবার বসবাস করছেন। ঢাকা ও অন্যান্য জেলা থেকে আগত লোকজন এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এই শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছেন।

১৪. মাঝি

মাঝিরা জলপথে নৌকা দিয়ে মানুষ ও মালামাল পরিবহন করে। নদীতীরবর্তী এলাকায় তাদের বাস। মৌলভীবাজার ও রাজনগর অঞ্চলের নদীতীরবর্তী এলাকায় কিছু মাঝি বা পাটনী পরিবার বসবাস করছেন। এরা লেখাপড়ার দিকে অনগ্রসর। নিজ পেশার পাশাপাশি অন্য পেশার সাথে জড়িত রয়েছেন।

১৫. চা-শ্রমিক

রাজনগর ও মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় কয়েকটি চা-বাগান রয়েছে। এসব বাগানে চা-শ্রমিকরা কাজ করে এবং বসবাস করে। তাদেরকে স্থানীয়ভাবে কুলি বলা হয়। তারা চা-বাগান থেকে চায়ের পাতা তুলে চা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে দেশীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা রাখছে। অধিকাংশ পরিবারই লেখাপড়ার দিকে অনগ্রসর। কয়েকটি পরিবার শিক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে।

এর বাইরে কমলগঞ্জের বাগমারা এলাকায় ফুল, শলা, ঝাড়ুর কারিগর রয়েছে। খগেন্দ্র চন্দ্র রিষি প্রায় ৪০ বছর যাবত মৃদঙ্গ, ডুলা, তবলা তৈরি ও মেরামতের কাজ করে আসছেন। বর্তমানে বংশানুক্রমিক পেশা বদলে অনেকেই চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, সাংবাদিকতাসহ বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত। অনেকে বিদেশেও পাড়ি জমাচ্ছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. রবাই শব্দকর ও ব্রজেন্দ্র শব্দকর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২ মার্চ ২০১১
২. জিতেন্দ্র মোহন অধিকারী, শ্রীমঙ্গল, সংগ্রহের তারিখ : ৪ নভেম্বর ২০১১

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

১. লোকচিকিৎসা

মৌলভীবাজার অঞ্চলে প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় এখনও কিছু সংখ্যক লোক সহজ সরল সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিশ্বাস রেখে চলেছে। তারা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির বাইরে পানিপড়া খাওয়া, তেলপড়া মাখা, কবচ, তাবিচ ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে থাকে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি লোকচিকিৎসা হিসেবে পরিচিত। এ ধরনের চিকিৎসা লোকজনের প্রচলিত বিশ্বাস, লোকাচার বা সংস্কৃতি এবং কখনও কখনও কুসংস্কারের উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয় না। গ্রামাঞ্চলের মানুষ পেটব্যথা, মাথাব্যথা, মাথা ঘুরানোসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার জন্য মসজিদের ইমামের নিকট থেকে পানিপড়া এনে রোগমুক্তির চেষ্টা করেন। এছাড়া গ্রামে অনেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বংশানুক্রমিকভাবে কবিরাজি ও ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে লোকচিকিৎসা করে থাকেন। ঔষধ হিসেবে তারা ব্যবহার করেন– ধর্মীয় বইয়ের কিছু অংশ যা তাবিজ-কবচে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রকার গাছের মূল, পাতা, ফল, ফুল, ডাল প্রভৃতি। প্রায় সব ধরনের পদ্ধতিতেই মন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে। সমাজের বয়স্ক লোক, বেদে এমনকি সাধারণ কেউও লোকচিকিৎসা প্রদান করতে পারে।

এছাড়া কৃষকের গরু অসুস্থ হলে তার দুঃখের সীমা থাকত না। বলা হতো 'গরুর পায়ে লক্ষ্মী'। মানুষের মতো গরুরও কবচ-তাবিজ, ফুঁ-পানিপড়া ছিল। গোয়াল নামের বংশানুক্রমিক এক ধরনের লোকচিকিৎসক অসুস্থ গরুর চিকিৎসা করতেন। তারা গ্রামের মধ্য দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে হ-হ ধ্বনি তুলে হাঁটতেন। আজকাল এদের আর দেখা যায় না।

২. তন্ত্রমন্ত্র

সিলেট অঞ্চল তান্ত্রিক দেশ হিসেবে খ্যাত। পাহাড়-টিলা বেষ্টিত এই অঞ্চল তন্ত্রসাধনার উর্বর ক্ষেত্র। মৌলভীবাজার জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কামরূপ-কামাখ্যা অঞ্চলের ইন্দ্রজাল যাদু-টোনা সম্পর্কে প্রবীণ লোকদের কাছে এখনো কথা শোনা যায়। বলা যায় কামরূপ-কামাখ্যা এই জনপদের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। কুলাউড়া-জুড়ির অনেক সাধকের কথা শুনা যায়। আজো দু'একজন ভূতসাধক পেত্নীসাধক বা জিন্নতসাধক রয়েছেন এ অঞ্চলে। নিম্নজীবী লোকদের তাদের কাছে বেশিমাত্রায় যেতে দেখা যায়। কয়েকজন নাম প্রকাশ না করা শর্তে জানান, একসময় খোকা পণ্ডিতের বই (তান্ত্রিক) এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কালী দেবতা, শ্মশানকালী, ভৈরব ইত্যাদির সাধনা অধুনাকালে লুপ্ত হয়েছে। প্রাচীন লোকরা এ নিয়ে কথা বলতে রাজি নন, কারণ তাদের মন্ত্রদাতারা কারো কাছে তন্ত্রমন্ত্রের মূল কথা বলতে নিষেধ করেছেন। বলা হয়–

www.pathagar.com

তিন কানে মহামন্ত্র নষ্ট।

হিন্দুসাধকদের পাশাপাশি মুসলিম সমাজেও সাধক আছেন। তারাও এ নিয়ে কিছু বলতে নারাজ। কবিরাজ বা জিন্নতসাধকরা 'জওয়াপ'[১] নিয়ে থাকেন। এই অদৃশ্য শক্তি নাকি ফলাফল বলে দিতেন। কোনো মানুষের ওপর জিন্নত বা দৈত্যের 'আছর'[২] পড়লে মুসলিম তান্ত্রিকরা 'হাজিরাত'[৩] করাতেন। এই হাজিরাত-এ মরিচ পোড়া দিয়ে করা হয়। আক্রান্ত ব্যক্তি মরিচের ঝাঁঝালো গন্ধে আবোল-তাবোল কথা বলতে থাকলে করিবাজের ধারণা হতো অপশক্তি তার মধ্যে এসে ভর করেছে। হাতের ছড়ি নিয়ে কখনো রোগীকে আঘাত করা হতো। কবজ-তাবিজ এবং চালান দিয়ে অপশক্তিকে শরীর থেকে দূর করতে হয়। এজন্য মোরগ, কবুতর, খাসি, মোমবাতি, আগরবাতি লাগে।

শত্রুকে ঘায়েল করতে 'বাণ'[৪] মারা, অনিষ্ট করতে 'থামার'[৫] মন্ত্র দেওয়া হতো। কারো 'নজর'[৬] লাগলে পানিপড়া দেওয়া হয়। ব্যক্তির অনিষ্ট করতে পানপড়া, ডিমপড়া, চুলপড়ার ব্যবস্থা ছিল। কোনো কিছু চুরি হয়ে গেলে নখ তর্পণ ও 'বাটিচালানের' প্রথায় যেমন বিশ্বাস ছিল; তেমনি 'চালপড়া' ও অন্যান্য কৌশলে চোরের নাম বের করা হতো। কুলাউড়ার প্রায় প্রতি গ্রামে এরূপ গুণীন দু'একজন লোক ছিলেন যারা এইসব কাজ করতেন। 'তুলা' রাশির লোকের খুব কদর ছিল। তাদের দিয়ে তান্ত্রিকরা অনেক কাজ করাতেন। গ্রামের বেশিরভাগ অসুখে তন্ত্রমন্ত্রের মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়া হয়। নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে এসব তন্ত্রমন্ত্র সংগ্রহ করা কঠিন কারণ বয়স্করা সংস্কারবশত সবাইকে মন্ত্র শিখাতেন না; আবার আধুনিকতার কারণে এসব তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস কমে গেছে।

মৌলভীবাজার সদর উপজেলার নাজিরাবাদ ইউনিয়নের গোবিন্দপুর নিবাসী শ্রী মিলন কান্তি দাস তন্ত্র ও মন্ত্র গুণে হিয়া পাখির শিং দ্বারা ভাঙ্গা হাড় জোড়া দিয়ে থাকেন। মিলন কান্তি দাসের পিতা-গুণেন্দ্র লাল দাস, তাঁর পিতামহ সর্বানন্দ দাস পাহাড় থেকে হাতি দিয়ে বড় বড় গাছ সমতলে আনতেন। কমলগঞ্জের মাধবপুর পাহাড়ে তাঁর গাছের মহাল ছিল। সর্বানন্দ দাস একজন সাধক ছিলেন। তিনি দেবী দুর্গার পূজা করতেন। একদিন সর্বানন্দ দাস স্বপ্নে দেখতে পান হিয়া পাখির শিংটি পাহাড়ে রয়েছে তা সংগ্রহ করে মানুষের ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগবে। সাধক সর্বানন্দ পরদিন হিয়া পাখির শিং সংগ্রহ করিয়া বিনা মূল্যে মানুষের হাড় ভাঙ্গার চিকিৎসা দিয়েছেন। বংশানুক্রমিকভাবে এখন মিলনকান্তি দাস এই চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছেন। এই পদ্ধতিতে অন্ধকারে ভাঙ্গা জায়গায় হিয়া পাখির শিং উজান ভাটি স্পর্শ করানো হয় এবং সাথে মন্ত্র পড়তে হয়।

বাতের ব্যথা হলে ওঝা দিয়ে রক্ত ঝাড়ানো হয়। এই ওঝার মধ্যে মুসলিমও আছেন। জুড়ি উপজেলার সাগরনাল গ্রামে এই সংগ্রাহকের প্রায় পঁচিশ বছর আগে তার এক আত্মীয়কে ওঝার দ্বারা ঝাড়ানোর দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা আছে। এখনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যথার জন্য ঝাড়ানো হয়। ওঝা সারা রাত গান গেয়ে বিষ নিচের দিকে নামায় এবং শেষ রাতে স্থানীয় কাকিয়া মাছের দাঁত দ্বারা পায়ের মধ্যে চিরে রক্তকে বের করে

www.pathagar.com

দেয়। বিষকে কথা শুনানোর জন্য শেষ রাতে ওঝা খুবই অশ্লীল গান গায়। প্রথম পদগুলো লিখার অযোগ্য।

'ও বিষ ঝাড়িয়া লাম রে
পুঙ্গা-ছিনালের[৭] বিষ ঝাড়িয়া লাম রে' ইত্যাদি।

তন্ত্রমন্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শিক্ষক মোহাম্মদ ফয়েজ খান-এর সাথে সাক্ষাৎ করা হয়। তার কাছ থেকে জানা গেল যে, কারো মুখের মধ্যে ঘা হলে বা ফাঙ্গাস পড়লে ধুনাকে তেল দ্বারা মেখে অথবা 'সুহাগা'কে তেল দ্বারা মেখে মুখের ভেতর দিয়ে নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পড়তে হয়-

মাকুড়ি রে মাকুড়ি সোনার মাকুড়ি
সুবন্যে বানাইলার সন্দেশ।
এই সন্দেশ খাইল ঘুণে
মাকড়িয়ে সত্তর ছিঁড়ে।
এই সত্তর লড়ে এই সত্তর পড়ে
শাহ আলী মর্তুজার দোহাই পড়ে।

আগে কলেরা রোগকে বলা হতো 'বলা বা বল্লা,'[৮] কেউ বলতেন ওলা উঠছে। হিন্দুপ্রধান গ্রামে সন্ধ্যের সময় এই রোগের অপশক্তিকে তাড়ানোর জন্য নগরকীর্তন করে বাড়ি বাড়ি যাওয়া হতো। অনেকে বাড়ির রাস্তায় গোবর দ্বারা বাঁধ দিতেন।

মুসলিমসমাজে ওলাবিবিকে মানত করা হতো। 'বলা' তাড়ানোর জন্য মুসলিম-সমাজে বয়স্করা বলতেন-

আলীর হাতে জুলফিকার, ফাতেয়ার হাতে তীর
যেই পন্থে আইস বলা, সেই পন্থে ফির॥

বসন্ত রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হিন্দু মহিলারা দলগতভাবে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এবাড়ি ওবাড়ি গিয়ে ভিক্ষা করে চাউল সংগ্রহ করেন ও সেইগুলো বিক্রি করে নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে যে কোনো বাড়িতে 'শেওড়া গাছের' নীচে শীতলা দেবীর ব্রত করেন। কলাপাতার মধ্যবর্তী শির দিয়ে সুসজ্জিত 'ভেরুয়া' তৈরি করেন ব্রতীরা। যেখানে কলাপাতায় চাউলের গুড়ো দ্বারা দুটো মূর্তি তৈরি করা হয়– একটির শরীরে কালো সাদা শিমবিচি প্রতিস্থাপন করে বসন্তরোগীর মতো করা হয়। এর অর্থ হচ্ছে– একজন সুস্থ মানুষ ও অন্যজন বসন্ত রোগীর প্রতিরূপ। সেখানে শীতলা দেবীর কিচ্ছা বলে এই দেবীর কাছে সুস্থ শরীর চাওয়া হয় যাতে পরিবারের কারো বসন্ত রোগ না হয়। মৌলভীবাজারের বহু গ্রামে-গঞ্জে মহিলারা এখনো এই ব্রত করে থাকেন।[৯]

জুড়ি উপজেলার শাহানা আক্তার (স্বামী- মো. জহিরুল ইসলাম, গ্রাম- সোনারূপা চা-বাগান, জুড়ি) এবং মো. জহিরুল ইসলাম (পিতা- মৃত আমান আলী, গ্রাম- সোনারূপা চা-বাগান, ডাকঘর- ধামাই, উপজেলা- জুড়ি, জেলা- মৌলভীবাজার) কিছু তন্ত্রমন্ত্র জানলেও তারা জীবনসংগ্রামের কঠোর কারণে সব ভুলে গেছেন। ১ জানুয়ারি ২০১১ তারিখ তাদের কাছ থেকে কিছু তন্ত্রমন্ত্র ও লোকচিকিৎসা পদ্ধতি সংগ্রহ করা হয়। যেমন, হঠাৎ করে হাত-পা মচকে বা মুচড়ে গেলে বা হালকা ভেঙে গেলে সরিষার তেল হাতে নিয়ে ঐ জায়গায় মালিশ করে সাতবার বলতে হবে–

www.pathagar.com

কচকা আইলা মচকা লইয়া
দেবী আইলা তেল লইয়া।
কার কচকা, আমার কচকা
নাই নাই নাই।

কারো শরীর হঠাৎ কেটে গিয়ে রক্ত ঝরলে তা বন্ধ করার মন্ত্র ও প্রক্রিয়াকে 'ধন্যিধরা' বলা হয়। যিনি এ মন্ত্র জানেন তিনি নিজের ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনি দ্বারা একটু মাটি নিয়ে কেটে যাওয়া স্থানের চারদিকে ঘুরিয়ে মন্ত্র পড়বেন–

ঢুর ঢুর পাটুয়া ঢুর
সিংঘের মুখে ধরলাম চুর
এই চুরকে ছুটাইয়া যে নিত পারে
আলী মর্তুজার দোহাই পড়ে।

এই মন্ত্র তিনবার পড়তে হয়। একই জিনিসের অনেক ধরনের মন্ত্র আছে। রক্তপড়া বন্ধ করার মন্ত্রকে কেউ বলেন 'ঢুর বান্ধা'।

দাঁতে ব্যথা হলে নিম্নোক্ত মন্ত্র সাতবার বলতে হয়-

অন্তরস দন্তরস নাভিরস
সুলতান স্বরূপে কয়, আমার দাঁত কী বিষ হয়-
বিছমিল্লার হিল। আমার দাঁতে মারলাম ব্রজখিল
যদি মন্ত্র লড়িবে, ঈশ্বর মহাদেবের জটা ভূমিতে ছিড়িয়া পড়িবে।

আগুনে শরীরের কোনো অংশ পুড়ে গেলে তিনবার বলতে হয়–

আগুনী যুগিনী বরমার লেখ
জ্বলিছ না পুড়িছ না কালা হইয়া থাক।

কোনো বাচ্চা বিছানায় প্রস্রাব করলে ঘুমানোর পূর্বে কয়েকবার বলতে হয়-

উতুম গুতুম
ঘরতো বারই মুতুম
সন্ধি পাতায় ধুন করছে
ঘরতো বারই মুতন করছে।

কোনো শিশুর পেট ফুলে গিয়ে ব্যথা হয়ে থাকলে পেটে 'কাঁচা তেল' অর্থাৎ সরিষার তেল মালিশ করে কলাপাতার কচি 'ডেম' (যখন কলাপাতা কচি অবস্থায় উপরের দিকে উঠে এবং লাঠির মতো দেখতে লাগে) দ্বারা স্পর্শ করিয়ে বলতে হয়–

ভোত-প্রেত-ঘর দেপতী মানুষ,
বিলাই, কুত্তার কুনজর পুড়ে যাউক।

এই মন্ত্র বলে ঐ কলার ডেমগুলোকে আগুনে পুড়তে হয়।

আবার কুমারী পোকার ঘর জ্বলন্ত আগুনে ফেলে তার যখন লাল হয়ে যায় তখন পুকুরের 'আঘাটের'[১৯] পানি গ্লাসে এনে জ্বলন্ত টুকরা সেখানে ফেলতে হয়। জ্বলন্ত মাটির টুকরা যখন পানি শোষণ করে তখন তা পেটের মধ্যে ধরে রাখা হয়। কিছুক্ষণ পর এই

www.pathagar.com

পানি সামান্য রোগীকে খেতে দিয়ে গ্লাস উল্টিয়ে মাটিতে রেখে তিনবার আঙ্গুল দ্বারা টুনকা মেরে বলতে হয়–

নাই নাই নাই।

শরীরে বিছা লাগলে মহিলাদের চুল দ্বারা সেই স্থান ঘষে বলতে হয়–

আগুনের বিছা আগুনে যা
পাড়র বিছা পাড় যা
জঙ্গল বিছা জঙ্গলে যা।

আমাশয় হলে পেয়ারা গাছের কচিকুঁড়ির সাথে গুড় মিশ্রিত করে খেতে দেওয়া হয়। আবার দুপড়া[১০] ঘাসের রস ও ছাগলের আওয়াদুধ[১১] মিশ্রণ করে তিন দিন খেতে দিলে আমাশয় ভালো হয়। কেউ কেউ মেন্দি গাছের পাতা হাত দ্বারা কচলে তার তরল কষের সাথে পানি ও গুড় মিশ্রিত করে সেই ঘন ও তরল পানি পান করেন।

বাচ্চাদের শ্বাসকষ্ট হলে মাগুর মাছের কানখার[১২] নিকটবর্তী ফুল সদৃশ্য ফুসফুসের সাথে চিনি বা গুড় মিশ্রিত করে খাওয়ানো হয়। কারো দীর্ঘমেয়াদী জ্বর-সর্দি না কমলে মাথার তেল উঠানোর জন্য কচুপাতা দীর্ঘ ঘষে নিতে হয়। শিশুদেরকে 'নজর' থেকে রক্ষার জন্য বয়স্ক মহিলারা সন্ধ্যার সময় ছন বা নাড়ার ঘরের ছাউনির তিনকোনা থেকে শ্বাস বন্ধ করে তিন গুছা ছন বা নেড়া সংগ্রহ করেন। তারপর এক পাত্রের মধ্যে সামান্য লোহা, শুকনা মরিচ, কাঁচা হলুদ, সরিষা বিচি, মরা মাকড় ইত্যাদি নিয়ে শিশুর শরীর মুছতে হয়। সন্ধ্যার একটু পর তিন-পথের মাথায় গিয়ে সেই সংগৃহীত নাড়া বা ছনসহ দ্রব্যগুলো পুড়ানো হয়। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার সময় তিনি পিছন দিকে ফিরে তাকাতে পারবেন না।

দু'তিন মাসের শিশু সবুজ রং-এর পায়খানা করলে তাকে বলা হয় 'বুনি আঘা'। কেউ বলেন কাউরা আগা। তখন শিশু বা মায়ের গলায় কাউরা জাতীয় একটি গুল্মলতা কেটে মালা দেওয়া হয়। শিশুর যদি স্বাস্থ্য কম থাকে তবে দাদিরা রং-ঢং করে মাইমালের[১৩] চাউংরায়[১৪] শিশুকে উঠানো হয়, পরে সেই মৎস্যজীবীকে দু'এক টাকা দিয়ে শিশুকে আবার ক্রয় করা হয়। প্রাচীনদের বিশ্বাস তা হলে শিশুর 'পিচাইয়া'[১৫] ছাড়ে। কখনো কখনো শিশুকে 'ডুকলা'র[১৬] দ্বারা 'ফুঁ' দেওয়ানো হয়। ডুকলা বা শব্দকর লোকেরা অতি সহজ-সরল ও দীন-দরিদ্র। অনেকের বিশ্বাস এই লোকদের 'ফুঁ' দ্বারা শিশুর শরীর ভালো থাকে। শব্দকর সমাজের মুরব্বিদের মধ্যে যারা কিছু তন্ত্রমন্ত্র জানেন তারা ভাটি জাতীয় ছোট উদ্ভিদের ডাল, সরিষা, মাকড় ইত্যাদি দিয়ে ঝাড়-ফুঁ দেন। তারা যখন মন্ত্র পড়েন তখন ভাটির দিকে অর্থাৎ উত্তরের দিকে কোনো লোক দাঁড়াতে পারবে না। সে দিকে 'বলা' বা চলে যাবে। তাদের মন্ত্রে একই কথাই শুনা যায়–

যেই নালে আইছ বলা, সেই নালে যাও।
দোহাই কালিকা চণ্ডির দোহাই,
দোহাই মহাদেবের দোহাই।

খাবারে অরুচি হলে এবং মুখে গন্ধ হলে 'সুস্থির ভরণ' দিতে হয়। রান্নাঘরের চুলার উপরের কালো ঘাণুকে দুধের সর দ্বারা মাখিয়ে বিখাউজ বা চুলকানির ঔষধ হয়।

www.pathagar.com

কোনো অসুখের সময় মাথায় ভরণ দেওয়ার নিয়ম ছিল। রোগীর তালুর সব চুল কেটে (ব্লেড দ্বারা থালুর চুল পরিষ্কার) সেই স্থানে কাকিয়া মাছের দাঁত দ্বারা ক্ষত করে উক্ত স্থানে ভরণ দেওয়া হয়।

প্রস্রাবে জ্বালা-পোড়াকে 'তাতরাংঙ্গি' বলা হয়, এর ঔষধ হচ্ছে তামার পয়সাকে নতুন মাটির পাতিলে রেখে সেই পাতিল পানি দ্বারা পূর্ণ করে গরম করে রাখতে হয়। পরে পানি ঠাণ্ডা হলে তা খেয়ে নিলে জ্বালা-পোড়া ভালো হয়।

জণ্ডিস রোগকে মৌলভীবাজার অঞ্চলে 'অলমি' বলা হয়। 'অলমি' বা জণ্ডিস রোগীকে বিনা মশলায় তরকারি রান্না করে খেতে দেওয়া হয়। কেউ কেউ মুখে সরিষা তৈল দ্বারা কুলি করেন এবং মাথায় দুর্বা দ্বারা ঝাড়ানো হয়। এই রোগের বিচিত্র চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে। যেমন অড়হর পাতা রসের সাথে দারু হরিদ্রাকে মিহি করে বেটে কয়েকদিন খেতে হয়। আরেকটি পদ্ধতি হলো 'জাওন খাওয়া'। এই জাওন তৈরি হয় ডেউঙ্গরা গাছের গোটা, ইয়লমের গুটা বা ফল, বর্ম যষ্টির মূল ও খনা গাছের ছাল একত্রে রাত্রিবেলা ভিজিয়ে রেখে সকালে যে মিশ্রিত রস পাওয়া যাই তাই 'জাওন'। এই ঔষধ সাতদিন খালি পেটে খেতে হয়।

মাথাব্যথা হলে কপালের দুপাশে চুল লাগিয়ে দুই দিকে তামার পয়সা বা তামাকের পাতা লাগানো হয়। পিত্তব্যথা হলে কালিয়ারা মাছ বা কালো বাউশের পিত্তথলি খেলে অসুখ ভালো হয়। হার্ট-এর অসুখে অর্জুন গাছের রস ও থানকুনি পাতার রস উপকার দেয়।

শরীর কেটে গেলে মাংস জোড়া লাগানোর জন্য কচি বাঁশের উপরের গাঢ় সবুজ আস্তর বিশেষ প্রক্রিয়ায় তুলে চুল মাড়িয়ে সে স্থানে দেওয়া হয়। রক্ত বন্ধের জন্য ও জীবাণু যাতে না জন্মে তার জন্য গাঁদা ফুলের পাতার রস অথবা 'রিপুঝির' পাতার রস দিলে রক্তপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

জ্বর ও মাথাব্যথার জন্য কালো তুলসীর রস উপাদেয়। মাথা গরম হলে পুরাতন তেঁতুল মাথায় 'ভরণ' দিতে হয়। তেমনি কামরাঙ্গা গাছের পাতা বেটে মাথায় রাখলে খাওয়ার রুচি বেড়ে যায়। গলাফুলা রোগ হলে আঙ্গুলে চুন নিয়ে সাতবার কলসির গলায় চুন দ্বারা চক্কর দিয়ে বলতে হয়–

তর গলা আমারে দে, আমার গলা তুই নে।

শরীরে ফোঁড়া হলে বা গুটা হলে সেটা যাতে আর না বাড়ে সে জন্য থামানো হয়। কুলাউড়া অঞ্চলে ফোঁড়াকে 'বরণ' বলে এবং ছোট ফোঁড়াকে 'বিষপুরি' বলে। বরণ থামার মন্ত্র হচ্ছে–

নেত্রের ধুলা পথের বালি
কইত আইলায় বিষপুরি
মুই দিনু ডাকের ফুঁ
ডাকছি না পাকিছ না
রাইত পুহাইলে থাকিছ না।

এই মন্ত্র সাতবার পড়ে ফোঁড়া ওঠা জায়গায় চারদিকে সাতবার আঙ্গুল দ্বারা চক্কর দিতে হয়।

www.pathagar.com

কুকুরে বা বিড়ালের কামড়ে লবণ পড়া কিংবা মাইলং থেকে হয়। লবণ পড়ার মন্ত্রে দুটো লাইন হচ্ছে–

কালিয়া কুত্তা শাখে ভুকে
নুন পড়া দিলে শরীর চুকে।

শিশুরা রাতে ভয় পেলে এক শ্বাস নিয়ে লজ্জাবতী গাছের মূল তুলতে হয় এবং এক শ্বাসে ঈশান কোণ থেকে শেওড়ার মূল তুলে একত্রে তাবিজ বানিয়ে গলায় বা হাতে দিতে হয়। তাবিজ ছাড়া এ অঞ্চলে কম শিশুই দেখা যায়।

শরীর কেটে গেলে রক্ত বন্ধের জন্য 'ধন্যি' ধরতে হয়। এই শব্দের অর্থ কেউ বলতে পারেননি। তান্ত্রিক কাটা স্থানের চারদিকে হাত ঘুরিয়ে বলবেন–

ধন্যি ধন্যি ধন্যি
সাত ধন্যির উপরে যাচ
নবনাগের মাত্রা খাছ।
উজানে বান্ধি উজানি
পাথারে বান্ধি ডুর
চান সুরুজ লুকায়তে
মোর ধন্যি শুকায়
যদি এই সত্য লড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা
ভূমিতে ছিড়িয়া পড়ে।

গলায় মাছের 'গছা'[১৭] লাগলে শুকনো চাল বা ভাত চিবিয়ে খেতে হয়। তখন কবিরাজ মনে মনে সাতবার মন্ত্র পড়বেন–

কি ছফেদ পানি
শুন গো পদ্মাবতী
হাড় থাকলে হাড় ঝরে
নাঢ় থাকি নাঢ় ঝরে।
ডাকিলে না শুন গছা হইলা নাকি কাল
লাম লাম ওরে গছা সপ্ত পাতাল
ওঝা হইলা মনসা গুড়ুলী হইয়া শিব
আদ্যমন্ত্র ঝরিয়া গছা করলাম নির্বিষ
যদি মন্ত্র লড়বে, ঈশ্বর মহাদেবের জটা
ভূমিতে ছিটিয়া পড়িবে।

বমি বা বমির ভাব হলে যে কোনো লেবুর পাতার গন্ধ নিতে হয়। কুলাউড়া-জুড়ি অঞ্চলে সর্পভয় থাকায় মানুষের বিশ্বাস ছিল যদি সাপের ওপর ছায়া পড়ে তবে রাতের বেলা সেই সাপ এসে কামড়াবে। সেজন্য ছিল মাটি পড়া। আবার রাতে ঘুমানোর সময় একটি মন্ত্র সাতবার পড়তে হয় এবং হাতে তিনটি তালি দিয়ে ঘুমাতে হয়। মন্ত্রটি এই-

কর্কট ঋতুকর্ণ
দময়ন্তি নল

www.pathagar.com

দোহাই আস্তিক মুনি
দোহাই আস্তিক মুনি
দোহাই আস্তিক মুনি।

জোঁক যদি রক্ত চুষে খায় তবে সেই স্থানে চুন বা পুরাতন কাপড় পুড়ে সেই ছাই একত্র করে দিতে হয়। কোনো দাদ বা পাঁচড়া দীর্ঘদিন ভালো না হলে ছোট পেঁপে কেটে সেই স্থানে ঘষে রক্ত বের করতে হয়। একজিমা হলে সেই ক্ষতস্থানে মরা মানুষের মাথার হাড় পুড়িয়ে তেল দ্বারা মেখে লাগানো হয়।

জলবসন্ত হলে বোতলে দুধ ভরে তার মুখ ভালো করে লাগিয়ে পুকুরে রেখে পরদিন থেকে খেতে হয়। জ্বরের পর ঠোঁটে ও মুখে জ্বরুয়া বের হলে সুহাগা পুড়ে ও মধু দ্বারা মিশিয়ে লাগালে ভালো হয়ে যায়। শরীরে চুলকানি হলে নিমপাতা সিদ্ধ পানি দিয়ে স্নান করলে ভালো হয়। প্রসব-বেদনার সময় তাড়াতাড়ি সন্তান প্রসবের জন্য তাবিজ উরুতে বেঁধে দিয়ে প্রসবের মন্ত্র পড়া হয়–

কালী কালী মহাকালী ঘুর সময় পড়িলে, মা করিবে উদ্ধার।
রক্তের টগবগ, রক্তের গোলা, রক্তের উদয়গিরি চন্দ্রখেলা আমার জ্ঞান লবিবে।
কামরূপ কামাক্ষার দোহাই ভূমিতে পড়িবে॥

যদি কারো হাড় ভাঙ্গে তবে বাঁশের ছটি দ্বারা খাটিয়া বেঁধে চিকিৎসা করা হয়।[১]

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. অদৃশ্য কথাবার্তার মাধ্যমে অশরীরী আত্মা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়, ২. কুদৃষ্টি, ৩. তন্ত্রের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে অশরীরী আত্মার আগমন ঘটানো এবং ঐ ব্যক্তি থেকে তাড়ানো, ৪. তন্ত্রমন্ত্রের মাধ্যমে অনিষ্ট করা, ৫. কোনো যন্ত্রণা বাড়ানো, ৬. কুদৃষ্টি, ৭. গালি বিশেষ, ৮. কলেরা রোগ, ৯. পুকুরের ঘাটের বাইরের অংশ, ১০. দূর্বাঘাস, ১১. যে দুধ দোহানোর পর গরম থাকে, ১২. ফুলকা, ১৩. মৎস্যজীবী, ১৪. বাঁশ নির্মিত মাছ রাখার টুকরি, ১৫. দীর্ঘদিনের রোগ, ১৬. শব্দকর সমাজের লোক, ১৭. মাছের কাঁটা।

বিষ নামানোর মন্ত্র

পদ্মাবতী বাসুকি গো তুমি মোর জননী
তুমি থাকিতে সাপে মারছে কামড়
এ গুণ নাগিনী তারায় ধরিলাম বিষ
চিপায় করলাম পানি।

অতঃপর বিষরীর রাগ ওঠাতে মন্ত্রপাঠ–

পদ্মাবতীর ঘরের পেছনে
আউসা এক গাজ ডুগি
মহাদেব দেখলে পরে
উঠিয়া দেয় উঁকি।
ব্রাহ্মণবাড়ির উপর দিয়া
উড়িয়া যায় কাউয়া
শ্বাশুড়ি-বধুয়ে ঝগড়া করইন
কার কতটুকু সাউয়া[১]।[২]

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. অশ্লীল শব্দ, নারীর যৌনাঙ্গ নির্দেশ।

www.pathagar.com

গলায় কাঁটা লাগলে তা থেকে মন্ত্র দ্বারা মুক্তি মিলে।

জারটারে ঝারটা
ঝারি তোর কাটা
উজান ছাড়ি ভাটিয়ল যা
সিদ্ধি গুরু কালিকা চণ্ডির বর
অমুকের (রোগীর নাম) পঞ্চপ্রাণ রক্ষা কর।
যদি মন্ত্র নড়ে
মহাদেবের জটা ছিড়ি ভূমিতে পড়ে।[৩]

নিয়মঃ এই মন্ত্র পাঠ করতে ঝাড়ুর ৪টা বা ৭টা আনুমানিক ৪ আঙ্গুল লম্বা রেখে যে স্থানে কাটা বিঁধেছে তার পাশে মুছে নিতে হবে এবং ৩ বার বা ৭ বার এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে।

হাত পা মচকে গেলে নিম্নের মন্ত্র পাঠ করে ক্ষতস্থানে মুছে দিতে হবে।

কচকা আইলো মচকা লইয়া
দেবী আইলা তেল লইয়া।
কার তেল বাঘের তেল
রাইত পোয়াইতে কচকা গেল।
সিদ্ধি গুরু কালিকা গুরু চণ্ডির বর
অমুকের পঞ্চপ্রাণ রক্ষা কর।[৪]

সাপে কামড়ালে বিষ নামাতে নিম্নের মন্ত্র পড়া হয়–

আগন টন টন বেগম রাশি
করাত করাত মাহা করাত
আইতে কাটে যাইতে কাটে
ধারে কাটে, ভরে কাটে।
সমুদ্রের শঙ্খ করাতে কাটে
মা কালী চণ্ডি কালী
কামরূপ কামাক্ষার কালী
উস্তাদ জয় চণ্ডি।

বিষ নামতে দেরি হলে বা না নামলে এই মন্ত্র পড়তে হয়–

বাটি বেট্টি পদ্মা বেটি (মনসা) উচায় বান্দে খোঁপা
বুক ভরা তার দুইটা থলি
উরাত ভরা সাউয়া
দক্ষিণ বাড়ি ডরাই পূজা (সাপ পূজা)
উত্তর বাড়ি বিয়া
যোগার দিবা পঙ্কজন বড়দি
আট আঙ্গুলে দিয়ে (লজ্জাস্থান)
অসৎ জাতি বেশ্যা বেটি
থাকে গাউয়ে গাউয়ে

www.pathagar.com

পর মাঝে পুরুষ পাইলে
কানাকানি করে।
সকল মাছ খাওয়াইলা রে ভাগিনা
না খাওয়াইলায় লাছ
কমরে কমরে যোগ করি
বুকের উপর নাচ।
সতী নারীর পতি যারা
জোর মসজিদের ছুঁড়া
অসৎ নারীর পতি যারা ভাঙ্গা নায়ের গুঁড়া।

অথবা

পদ্মা তুই ছিনাল
কাপড় পিনদে যেমন তেমন
জুড়ায় নিল প্রাণ।
ছোট জালে আগুন বরইন
বরইর কাট দিয়া।
ইজম জালের সাউয়া পুড়ছে
পুরঙ্গি উড়িয়া।
সাউয়া পুড়ার গন্ধ পাইয়া
উলায় মারছে ফাল।
ঝারা মারি লইয়া গেছে
বউয়ের আধা কান।
আগে কইছিলাম গো পদ্মা
গামছা দিতে তলে।
এখন কেনে তর সাউয়ার পানিয়ে
ছপাত ছপাত করে।
একটা অইল লতা ভাইগনা
আরও বুনা তেল
মোরাইতে মোরাইতে
সাউয়া ভাঙ্গি গেল।
ভাটি থাকি আইছে বাইংগনা
ভাঙ্গা পেল লইয়া
ছয় মাস চুদাইয়া গেল।
বেতর ছলম দিয়া
হুরু বাইংগন, বড় বাইংগনা
তেলে বাজি তুলে
সাউয়ায় কুচি কুচি করে
বাপর বাড়ি গেলে

www.pathagar.com

বামনবাড়ির উপর দিয়া
যায় রে একটা কাউয়া।
বামনায় দেখত গেল কাজুয়াইয়া
বামনি দেখায় সাউয়া।[৫]

মন্ত্রের মধ্যে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করলে বিষক্রিয়া শির থেকে নেমে আসবে বলে মন্ত্রের ওঝা বিশ্বাস করেন। পদ্মা দেবী মানে বিষহরি, মন্ত্রের অশ্লীল শব্দে রোগ-বালাই, বিষের ক্রিয়া নষ্ট হয়ে স্থানান্তরিত হয়ে পড়বে। বিষ নীচে নেমে আসবে এবং ওঝা বিষ নামিয়ে নিয়ে আসবেন। বিষ নীচে নেমে এলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠবেন। এই কথা যুগ যুগ ধরে মানুষ বিশ্বাস করে আসছে। এখনও নিম্ন বর্ণের পশ্চাৎপদ গ্রামীণ মানুষের মাঝে এসব মন্ত্র চালু আছে। যদিও আধুনিক নাগরিক সভ্যতা এসব বিশ্বাসে আঘাত বা ভাঙ্গন নিয়ে এসেছে। তথাপি এ বিশ্বাস বা মন্ত্র এক শ্রেণির ওঝা ও পূজা-পার্বণের লোকজন ধরে রেখেছেন।

হিরালির মন্ত্র

এই ঘোর ঘোর কালি কালি
এই কালিকার পুত
সাফিয়ানেছ আদিয়ানেছ
ধর্মের কূল
যদি মন্ত্র লড়বে, ঈশ্বর মহাদেবের জটা
ছিড়িয়া ভূমিতে পড়বে।

মেঘ শিলা-বৃষ্টি সরানোর মন্ত্র ১

ঘর অলে করইলা চতুরদিকে গহিনে
শিলবান চালাই নবরূপে নবরূপ স্কন্দের
উপর দাড়া, দাড়া, খাড়া গহিনে শিল
বাণ দেখছি ভাঙ্গা, খণ্ড বিখণ্ড করি
অনাদি তুলিয়া হনুমান লেঙ্গুড়ে
শিল আসমানে বইছে
বেড়িয়া শতেক বিল, টাটা টাটা রে
সূচি শতেক কহিলাম বাণ
শিল হাতে তুলিয়া লইলাম লোহার মুচি
লোহাদি বানাইল বাণ বরশি
চাষারে করিয়া লিও মাটি
বন সিংহের আমার আমার বন্দনা রক্ষা কর
যদি মন্ত্র লড়বে, ঈশ্বর মহাদেবের জটা
ছিড়িয়া ভূমিতে পড়বে।
কেমনি বিতাবি কেমনি তাও
কেমনি জন্ম নিলো তাও
লোহা রে লোহা লোহাদি

www.pathagar.com

বানাইল বাণ বরশি
কেমনি তাও কেমনি জন্মিলো।

মন্ত্র ২

অনাদি অনাদি লোহা
লোহাদি বানাইল বাণ বরশি
যদি মন্ত্র পড়বে, ঈশ্বর মহাদেবের জটা
ছিড়িয়া ভূমিতে পড়বে।
অং চালু, অং সিদ্ধা চালু
দুই সিদ্ধা চালু, তিন পৃথিবী চালু
চার চালু, চাইর সিদ্ধা চালু
পাঁচ চালু, পাঁচ সিদ্ধা চালু
ছয় চালু, ছয় সিদ্ধা চালু
সাত চালু, সাত সিদ্ধা চালু
পর্বত চালু, আট চালু, সিদ্ধা চালু
নয় চালু, নয় সিদ্ধা চালু
দশ চালু, দশমন্য রাবণ চালু
এগারো চালু, এগারো সিদ্ধা চালু
বারো চালু বারো সিদ্ধা চালু
তেরো চালু, তেরো সিদ্ধা চালু
পনেরো চালু, পনেরো সিদ্ধা চালু
সতেরো চালু, সতেরো সিদ্ধা চালু
আঠারো চালু, আঠারো সিদ্ধা চালু
ঊনিশ চালু, ঊনিশ সিদ্ধা চুলু
বিশ চালু, বিশ সিদ্ধা বলি
চল চল ঘোড়িয়া যক্তের
মাথা খাইয়া চল
সাত পর্বত ভাঙ্গিবে চল
ডাঙ্গায় চল, যদি না যাছ
ঈশ্বর মহাদেবের মাথা খাও
যদি মন্ত্র লড়বে
কামরূপ কামাক্ষার দোহাই পড়বে।[৬]

এই মন্ত্র কোথায় কিভাবে কার থেকে এসেছে তা জানা নেই। ওস্তাদ বা ওঝা এ মন্ত্রসমূহ পুরুষানুক্রমে পেয়ে আসছেন। এই পাঠে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাতে ভৌগোলিক ও আধ্যাত্মিকতার মিল রয়েছে। দোহাই পাড়া, শক্ত কথা বলা, দেবতার দোহাই দেওয়া মন্ত্রের শক্তির একটা বিশেষ দিক। বাণমন্ত্রতে হিরালী বজ্র-বৃষ্টি সরাতে লোহার ব্যবহার করেছেন। বারবার লোহা-বড়শির শক্তির কথা বলেছেন। বৈজ্ঞানিকভাবে লোহার সত্যতা মিলে, মন্ত্রের মধ্যেও লোহা আছে।

www.pathagar.com

আমাদের লোকবিশ্বাসে যুগ যুগের অভিজ্ঞতা আছে। হিরালীর মন্ত্রের ভেতর দিয়ে এরও একটা ইঙ্গিত পেয়ে যাই।

তথ্যনির্দেশ

১. মো. ফয়েজ খান, পিতা : মোহাম্মদ মহরম খান, গ্রাম : দক্ষিণপাড়া, ডাকঘর : কাজলধারা, উপজেলা : কুলাউড়া, জেলা : মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ: ১০ অক্টোবর ২০১১; জিতেন্দ্র মোহন অধিকারী, শ্রীমঙ্গল, সংগ্রহের তারিখ : ৫ নভেম্বর ২০১১
২. শাহানা আক্তার, জুড়ী; কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২
৩. বরাই শব্দকর, বালিটেকি, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, সংগ্রহের তারিখ : ২০ এপ্রিল ২০১১
৪. সাবুল শব্দকর, শ্রীনাথপুর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ১২ জুলাই ২০১১
৫. শিপ্রা রাণী মোহান্ত, ঘোষপুর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২০ আগস্ট ২০১১
৬. মণিন্দ্র শব্দকর, বৃন্দাবনপুর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ২৫ জুলাই ২০১১

www.pathagar.com

ধাঁধা

ধাঁধা পরিণত মনের সৃষ্টি। মানুষ তার গভীর পর্যবেক্ষণ, বুদ্ধিবৃত্তি ও মেধার সাহায্যে ধাঁধা সৃষ্টি করে এসেছে। ধাঁধার মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি, জীবনাচরণ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ধাঁধা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের কাছে সমাদৃত। মৌলভীবাজার জেলায় ধাঁধাকে সাধারণত ডিঠান, হেঁয়ালি, পই বা ছিলক বলা হয়ে থাকে। মৌলভীবাজার জেলায় প্রচলিত ধাঁধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিম্নে দেওয়া হলো।

১. ফেছাতে থইছি ভেড়ার ছাও
তিন কল্লার ছয় পাও।
উত্তর : পালকি।
অর্থ : ১. বাঁশ-বেতের ছোট ঝুড়ি বিশেষ।

২. পাগা আঠে বলদ লেটে।
উত্তর : লাউ/কদু।
অর্থ : ১. হাঁটে।

৩. উপরে দিয়া যায়রে পংকি, ডাকে ঘেত ঘেত
মুখে আঠার আধার খায়, বাজু বায় তার পেট।
উত্তর : সন্দেশ।

৪. মাটির তলে থাকে বুড়ি, কাপড় পরে উড়ি উড়ি
না নাপিত না ধুপা, তবুও বুড়ি সাফসফা।
উত্তর : রসুন।

৫. এক ঠ্যাংগে নাচে, কার বাড়ি আছে?
উত্তর : পাখা।

৬. একচা লতা, যায় কলিকাতা।
উত্তর : ট্রেন।

৭. পিপি লেজ দি পানি খায়, তার নাম কি?
উত্তর : লেম/কুপি বাতি।
অর্থ : ১. পেছনের লেজ দিয়ে।

৮. উঠান ঠন ঠন পিছে লাই
কোন বিচির বাকল নাই?
উত্তর : লবণ।

৯. গলা আছে তলা নাই, পেট আছে ভড় নাই।
উত্তর : মাছ ধরার পলো।

১০. আয়রে ভাই পাহাড় যাই
পাহাড়ে গিয়া ঘর বানাই।

www.pathagar.com

ঘর হলো কোটা কোটা
পানি পড়ে ফুটা ফুটা।
উত্তর : বলার চাকা।

১১. ঘর আছে দরজা নাই, মানুষ আছে কথা নাই।
উত্তর : কবর।

১২. বন হতে বাহির হইলা টিয়া, ভাতের উপর দিলা মুতিয়া[১]।
উত্তর : লেবু।
অর্থ : ১. প্রস্রাব করে।

১৩. আছাড় মারলে ভাঙ্গে না, টিপা দিলে গলে যায়।
উত্তর : ভাত।

১৪. হলুদের রঙ্গাবঙ্গা দুধেরই বরণ,
এ পই যে ভাঙ্গাইতে পারে না,
বৌয়ের পেটে তার জন্ম।
উত্তর : ডিম।

১৫. চার কলসি মধু ভরা, ঢাকা নাই উপইত[১] করা।
উত্তর : গাভীর বাট।
অর্থ : ১. উপুড়।

১৬. সাগরে জন্মে নগরে বাস,
মায়ের হাতে সর্বনাশ।
উত্তর : লবণ।

১৭. দুই ধারে দুই পাটি, মাঝে দিয়া লাঠি।
উত্তর : কলাপাতা।

১৮. রাজার বাড়ির ঘুড়ি, এক বিয়ানে[১] বুড়ি।
উত্তর : কলাগাছ।
অর্থ : ১. বাচ্চা প্রসব করে।

১৯. রাজার বাড়ি মেনা গাই, মেনমেনাইয়া চায়
হাজার টাকার মরিচ খাইল, আরও খাইতে চায়।
উত্তর : শিলপাটা।

২০. তুমি উঠ আই বই, তোমার সমান আমি হই।
উত্তর : কুঁড়েঘরের খুঁটি।

২১. ঘরের ভিতর ঘর, হাত বাড়াইয়া ধর।
উত্তর : মশারি।

২২. তিন পিতা মধ্যখানে গাত,
কইবে না তে খাইবে লাথ।
উত্তর : চুলা।

২৩. হাতি কিড়িমিড়ি লোহার দাঁত
এই পই যে ভাঙ্গাতে পারে শহরের জাত।
উত্তর : তালাচাবি।

www.pathagar.com

২৪. পাঁচে তোলে বত্রিশে পিষে, তকতায় বাড়ি দিয়ে বস্তা ভরে।
উত্তর : ভাত খাওয়া।

২৫. বারো মাসে কন্যা বটে, তেরো মাস গেলে
গণ্ডায় গণ্ডায় জন্ম দেয় অগণন ছেলে।
উত্তর : কলাগাছ।

২৬. গাছ নয় শুধু পাতা, মুখ নেই বলে কথা,
বুদ্ধি নেই আপন ধড়ে, বুদ্ধি বিলায় সকলের তরে।
উত্তর : বই।

২৭. পানির তলে দিয়া আসা যাওয়া, ছুবড়ার লাখান ভাসে,
মাছও নয়, মাংসও নয়, সকলে তারে খায়।
উত্তর : সন্দেশ।

২৮. ওপারে থেকে মারলাম ইটা[১],ওপারে গিয়ে চাকি পিটা।
উত্তর : গোবর।
অর্থ : ১. ঢিল।

২৯. গাঙ্গে আসে, গাঙ্গে ভাসে
তারে ভাঙ্গায় পাগল দাসে,
পড়ুয়া পণ্ডিতে ভাঙায় পুরা ছয় মাসে।
উত্তর : কচুরিপানা।

৩০. ইড়িং বিড়িং ঢিড়িং ভাই, চোখ দুটো তার মাথা নাই।
উত্তর : কাঁকড়া।

৩১. কালা মুরগি ডিম পাড়ে, গণতে বুরা লাগে[১]।
উত্তর : তারা।
অর্থ : ১. খারাপ লাগে।

৩২. আইল গাই ভেমরাইয়া[১], দুধ দিলো ছিটাইয়া।
উত্তর : মেঘ/ বৃষ্টি।
অর্থ : ১. চিৎকার করে।

৩৩. তিন তেরো মধ্যে বারো, নয় দিয়ে পুরণ করো।
উত্তর : ষাট।

৩৪. লখঠন থাকে কপঠন খায়, কাঁঠিয়া দিলে হাঁঠিয়া যায়।
উত্তর : আমের পোকা।

৩৫. পাকিলে সকলে খায়, লেমটা[১] হইয়া বাজার যায়।
উত্তর : কলা।
অর্থ : ১. উলঙ্গ।

৩৬. লম্বা হাফিজ, গলাত তাবিজ।
উত্তর : সুপারির গাছ।

৩৭. থাকি তোমার ঘরে, করি তোমার কাম
মুতি তোমার মুখে, এর কি নাম?
উত্তর : বদনা।

www.pathagar.com

৩৮. এক ভাই আমার ভালো, এক ভাই কালো
দুই ভাইয়ের দেখা হবে মরিবার কালে।
উত্তর : লেবু ও শাক।

৩৯. শঙ্ক করাতের ধার মাঝে, যদি পই যে ভাঙ্গাতে না পার বৌ তার পুড়ী[১]।
উত্তর : আনারসের পাতা।
অর্থ : ১. মেয়ে।

৪০. লাফ দিয়া মুড়াইয়া, ফাঁকা দিয়া ডুকাইয়া
বুড়ায় দেয় বার বার, জোয়ানে দেয় একবার।
উত্তর : সুই-সুতা।

৪১. খকড় মাথা পিংলা চুল, কোন জিনিসের পাঁচ লেঙ্গুর[১]।
উত্তর : চিংড়ি মাছ।
অর্থ : ১. লেজ।

৪২. পেটত খুলিয়া বাজুত[১] মারে।
উত্তর : দিয়াশলাই।
অর্থ : ১. কোমর।

৪৩. ওতগুণি পুড়ীগো লোহার উক্কা খায়
কেমন কেমন গাছের লগে ধামালি খেলায়।
উত্তর : বাতাস।

৪৪. ইকরামতির গাছে বিকরামতির ছানি
কোন দেশে দেখছেন গাছের আগায় পানি?
উত্তর : নারিকেল।

৪৫. এক বেটা হুড়ি
সারা গায় ফুড়ি[১]।
উত্তর : কাঁঠাল।
অর্থ : ১. ফুট-পাঁচড়।

৪৬. এই দেখলাম ঐ নাই
কি কইমু রাজার ঠাই।
উত্তর : বিজলি।

৪৭. আগা লক লক, গুড়িত মউ
খায়তায়নি গো ভাগ্না বউ।
উত্তর : আখ।

৪৮. নানার পেটে মাইরে থইয়া
পুত গেলগি দোকান লইয়া।
উত্তর : কলার থোড়।

৪৯. কালো কালো ভমরা কালো ঘাস খায়
রাইত হইলে ভমরা খোয়ারে লুকায়।
উত্তর : চোখ।

www.pathagar.com

৫০. কোন ফলের বীজ নাই কও দেখি দাদা?
ছিলক[১] না ভাঙ্গালে সে হবে গাধা।
উত্তর : নারিকেল।
অর্থ : ১. শ্লোক।

৫১. কাঠ কাঠ কাঠের কুম্ভীর ফিরে মাথা কুটে,
কাকইনো পাড়া দিলে কেক্কাক কইরা উঠে।
উত্তর : ঢেঁকি।

৫২. এক বেটা সাউদ, হকল গতরে দাউদ[১]।
উত্তর : আনারস।
অর্থ : ১. এক প্রকার চর্মরোগ।

৫৩. ইখান থাইকা মারলাম তাল, তাল গেল রবিশাল।
উত্তর : চিঠি।

৫৪. উত্তরে মণিপুর, মণিপুরে বাসা
বত্রিশটা ডালের মাঝে একটা পাতা।
উত্তর : জিহ্বা।

৫৫. কালিদাস পণ্ডিতে কয় হরুকালের[১] কথা
ন'কুড়ি তেতই গাছে ক'কুড়ি পাতা।
উত্তর : দুই কুড়ি।
অর্থ : ১. শিশুকাল।

৫৬. শুভংকরের ফাঁকি
তেত্রিশ থেকে তিনশ গেলে কত থাকিল বাকি?
উত্তর : ত্রিশ শ. ষ. স. এই তিন সংখ্যা বাদ।

৫৭. তোমারও নাই, আমারও নাই
বাপ, পুত কেউরই নাই।
উত্তর : নাভি।

৫৮. ঠেলার উপর ঠেলা
বর্ম যাতার খেলা
হাঁটুর উপরে ভর
কমরে কমরে মিল করিয়া
গলায় গলায় ধর।
উত্তর : পানিতে ঢেউ দিয়ে কলসি ভরা।

৫৯. এক বেটির নাম ভাগীরতী
হকলে করে যাতাযাতি
উচিত দেওয়া দিয়া কয়
আরো দে আরো দে।
উত্তর : টিউবওয়েল।

www.pathagar.com

৬০.আছিল খাড়া করলাম কাইত
হারাই[১] দিয়া ঘুমাই রইলাম সারা রাইত।
উত্তর : দুয়ার বেন্দা[২]।
অর্থ : ১. প্রবেশ করানো, ২. দরজা বন্ধ করার দণ্ড।

৬১. দুই ঠেং ছড়াইয়া
মাঝখানেদি হারাইয়া
মারো যাতা কাম হয়
কালিদাস পণ্ডিতে কয়
যা বুঝছো তা নয়।
উত্তর : ছরতা দিয়ে সুপারি কাটা।

৬২. যার লাগি যতো
তারে পাইলাম পথো
হেও ছাড়ে না
আমিও আই না।
উত্তর : মেঘ।

৬৩. আশ্চর্যের কথা! মা বড়ো সতী
পতি ছাড়া হাজার পুত, মা গর্ভবতী।
উত্তর : পৃথিবী।

৬৪. আইছি কাজে কই না লাজে
মামলত[১] রইয়াছে দুই উরাতের মাঝে।
উত্তর : গাভীর দুধ।
অর্থ : ১. আসল জিনিস।

৬৫. আগের বাড়িত আগুন লাগছে
মাইঝের বাড়িয়ে ডাইক্যা কয়
পিছের বাড়িয়ে পানি বয়।
অথবা
আগর টিলায় লাগছে আগুন
মাঝর টিলায় ডাকদি কয়
করর টিলায় পানি দেয়।
উত্তর : হুক্কা।

৬৬. তেল দে সাবান দে
আস্তে আস্তে ঠেলা দে।
দুখ পাছ তে খুয়াই লাই
না না থাউক দে
আস্তে আস্তে যাউক দে।
উত্তর : চুড়ি পরানো।

www.pathagar.com

৬৭. ঝাপড়ি ঝাপড়ি গাছটি
ফুল ধরে বারোটি, পাকিলে হয় একটি।
উত্তর : বছর।

৬৮. লড়ে চড়ে পড়ে না, ভিজা কাঁথা শুকায় না।
উত্তর : জিহ্বা।

৬৯. আমার এটা লোহার গাই[১],
যত খিরাই[২] তত পাই।
উত্তর : কল।
অর্থ : ১. গাভী, ২. দোহানো।

৭০. চুন চুনানি ঘটি, রাইতে দিনে উজান ভাটি।
উত্তর : দরজা।

৭১. আমার একটা বুলবুলি গাঙ্গের পানি খায়
গাঙ্গের পানি শুকাই গেলে বুলবুলিটি মরিয়া যায়।
উত্তর : লেম বাতি।

৭২. ঘাট পিছলা কদমের ফুল, কুরুয়ায় ডাকে কতক দূর।
উত্তর : রেলগাড়ি।

৭৩. কোঠা কোঠা নব কোঠা, বেত লাগে আশি গেছা
দেখবে কামলা ভাই, একছা বেতের বান নাই।
উত্তর : বলার চাকা।

৭৪. উচ কুচ বুক টান, কোন ঘরের চার কান?
উত্তর : চার ছালা ঘর।

৭৫. চার কলসি শরবত ভরা,
বিনা দোষে উপইত করা।
উত্তর : গাভীর বাট।

৭৬. এক গাছে এক ফল, পাকিলে ঝলমল।
উত্তর : আনারস।

৭৭. রোকের[১] গোড়া লোহার লাগাম
এই পুই ভাঙ্গাতে না পারলে গোস্ত খাওয়া হারাম।
উত্তর : ঢেঁকি।
অর্থ : ১. কাঠ।

৭৮. খিল[১] তুলিয়ে তিল পালাইলাম মাঝে দিয়া আইল
দুই পায়ে তিনজন মানুষ আইটা গেলা কাল।
উত্তর : মহিলার কোলে ও গর্ভে সন্তান।
অর্থ : ১. পতিত জায়গা।

৭৯. দিনে মরা রাতে তাজা।
উত্তর : বাতি।

www.pathagar.com

৮০. আসমানে দুই তারা, মাটিতে দুই মরা
পানিত দুই মাছ, পাহাড়ে দুই গাছ।
উত্তর : চাঁদ-সূর্য, হাসান-হোসেন, রুই-বাওস, আগর ও চন্দন।

৮১. উড়িল পক্ষি জুড়িল ফিল, সোনার কটরা রোপার কিল।
উত্তর : বিমান।

৮২. উঠান টন টন বৈঠাত বাড়ি
কোন গৃহস্তের পুনর্ধ[১] দাঁড়ি?
উত্তর : পিঁয়াজ।
অর্থ : ১. শরীরের পশ্চাত অংশ।

৮৩. আলু পাতা ডালু ডালু
বিন্না পাতার কেশ
কাগজে বেড়াইয়া কন্যা
যাইতায় কোন দেশ?
উত্তর : সিন্দুর।

৮৪. তাল ঝুন তাল ঝুন
তাল নিল চুরে
এমন পর্বতের আগুন
কে নিবাইতে পারে?
উত্তর : রোদ।

৮৫. ও বাড়ির বুড়ি, ও বাড়ি যায়
কট কটাইয়া গুয়া[১] খায়।
উত্তরঃ ছতরা।
অর্থ : ১. সুপারি।

৮৬. বারিক[১] বারিক পাতা
মোটা মোটা ডাল
এ শিলক যে ভাঙ্গাত পারে
এ বড় সিয়ান।
উত্তর : তেতইর বীজ।
অর্থ : ১. ছোটো।

৮৭. বিন্না পাতা আঁখি আঁখি
ফুল ধরে ঝাঁকি ঝাঁকি,
নবাবে তুলে ফুল
বাইশ পাতা তেইশ ফুল।
উত্তর : পদ্মফুল।

৮৮.জলে থাকে জলকুমারী
জলে তার বাসা,
হাড্ডি নাই, গুড়ি নাই
মাংস লুতলুতা।
উত্তর : জোঁক।

www.pathagar.com

৮৯. ফালাইলাম কালিজিরা
ফুটল ফুল
ধরল কামরাঙ্গা।
উত্তর : তিল।

৯০. তলে চাপ, উপরে চাপ
মাঝখানে লকলকি সাপ।
উত্তরঃ জিহ্বা।

৯১. ইর ইরি বিন্না তিরি তিরি গাছ
মাটির বিন্না চব্বিশ হাত।
উত্তর : সুপারি গাছ।

৯২. উতু উতু জ্বালা বাইন
চৌদ্দপুরে গাইল খাইন।
উত্তর : হালি বীজ।

৯৩. উপ উপ দুখ পাই
হারাই দিলে আরাম পাই।
উত্তর : চুড়ি।

৯৪. বেটারে বেটা
মাঝে দিয়া ফাটা
ধেক্কা মারি হারাই দিলে
হেও এক বেটা।
উত্তর : তালাচাবি।

৯৫. জলে গেলাম কলস নিয়ে
জল আনিতে,
আনতে গেলাম যারে
সে ছাড়ে না মোরে
কেমনে আইতাম ঘরে।
উত্তর : বৃষ্টি।

৯৬. লাল পাখি, লাল পাখি
লাল ধান খায়,
পুটকিত টিবা মারলে
দৌড়ি দৌড়ি যায়।
উত্তর : টর্চ লাইট।

৯৭. হাদেনি গো প্রেমদাসে কান্দে
একজনের পিরিতির লাগি তিনজনরে বান্ধে।
উত্তর : চিড়াকুটা।
অর্থ : ১. সাধ করে কি?

৯৮. ফুলকালে ফুলে
কার্তিক আইলে ঝুলে

www.pathagar.com

লেমটা বাজারে চলে।
উত্তর : তেঁতুল।

৯৯. এক ছাগলের তিন মাথা
খাইত চায় সে লতা-পাতা।
উত্তর : চুলা।

১০০. শোন রে ভাই কথার পতি
ছাগলে খাইলে নতুন পাটি।
যা ছিলো বাদ বাকি
ইঁদুরে নিল রাতারাতি।
উত্তর : কাঁঠাল পাকা।

১০১. যাতার উপরে যাতা রে ভাই
আটুর উপরে ভর,
কমরে কমরে জোগ করিয়া
আঞ্জা[১] করিয়া ধর।
উত্তর : জলভরা কলসি।
অর্থ : ১. দু'হাত দিয়ে চেপে ধরা।

১০২. দুই রান ছড়াইয়া
মাঝে দিয়া ঢোকাইয়া
আমার কাম করিয়া
তারে দিলাম ছাড়িয়া।
উত্তর : ছরতা।

১০৩. এরাও মা-ঝি
এরাও মা-ঝি
লেবু তিনটা জনে কয়টা?
উত্তর : জনে একটা।

১০৪. এক কুড়ি বারো ভাই
এক ঘরে থাকে তারা
এক মায়ের সন্তান তারা
মারিলে হাসিয়া বেড়ায়
বন্ধু বলে ডাকে।
উত্তর : দাঁত।

১০৫. মাতা গুরু পিতা গুরু
গুরু জ্যেষ্ঠ ভাই,
তা তনে অধিক গুরু
ভজিলে যে পাই।
উত্তর : গ্রন্থ।

www.pathagar.com

১০৬. মাইয়া লোকের আতে[১] নাচে
সাতশ মুখ কার আছে?
উত্তর : চালুনি।
অর্থ : ১. হাতে।
১০৭. ফুল নাই, গোটা নাই
বারো মাস ধরে।
উত্তর : ১. পান।
১০৮. এর তলে দি, তার তলে দি
বটর তলে দি গাটা
হিয়ালর[১] ছাও বাঘে নেয়
বেমরাই উঠে পাঠা।
উত্তর : কুলু।
অর্থ : ১. শিয়ালের।
১০৯. তিন কোনা মঙ্গলা দেবীর পাতা
আত দি লাগাল না পাইলে
হারাইদে মাথা।
উত্তর : এছু[১]।
অর্থ : ১. মাছ ধরার এক জাতীয় বেতের যন্ত্র। মাছ ধরতে কৃষকরা এটা ব্যবহার করেন। এর আকৃতি ত্রিভূজ আকৃতির। এই ধাঁধায় তার আকৃতির বর্ণনা করা হয়েছে।
১১০. বন থাকি বারইলা বট,
পুন্দলাটি তার মুখে জট।
উত্তর : আনারস।
১১১. আসমান ঘুর ঘুর, পৃথিবীর দোহাই
আনছি পানদান, তইতাম খুবাই।
আইছে পানদান, হাওয়া ভরে
তইবায় পানদান, মাটি ভরে।
উত্তর : মেঘ।
১১২. উতুবুড়ি পুয়াণ্ড লোহার ডাবা খায়
বড়ো বড়ো গাছের লগে যুদ্ধ করত চায়।
উত্তর : কুড়াল।
১১৩. পানির তলে দি যায়
সবাই তারে খায়।
মাছও নায়, মাংসও নায়
সবাই তারে খায়।
উত্তর : সন্দেশ।
১১৪. ছয় চরণ কৃষ্ণ বরণ
পেট কাটিলে হাঁটে,

www.pathagar.com

মুর্খ কি ভাঙ্গাইতে পারে
পণ্ডিতের ফাটে।
উত্তর : বন পিঁপড়া।

১১৫. হারাইলে তুকাই[১] তারে
হারাইলে আনি না ঘরে।
উত্তর : পথ।
অর্থ : ১. খুঁজি।

১১৬. ছোটো কালে ঘুমটা
বড়ো অইলে লেমটা।
উত্তর : বাঁশ।

১১৭. খান্দার উপর খান্দা
লাল কাকটি বান্দা।
উত্তর : কলার ছড়ি।

১১৮. গাঙ্গর পার মরিছ গাছ
অল অলি করে,
কাউয়ায় খুমটা মারলে
ঝুরুতি পড়ে।
উত্তর : কুয়াশা।

১১৯. ও-ঘর অর বুড়ি হ-ঘর যায়
কটকটাইয়া গুয়া খায়।
উত্তর : ছরতা।

১২০. দরিয়া উঠাইত, করিয়া চিত,
ভিতরে গেলে মন পিরিত।
নয়া ঘরর বউ তুমি
না করিও লাজ
যতই ভিতরে যাইবে ততই কাজ।
উত্তর : নয়া ভাত খাওয়া।

১২১. ঘুমায় খায়, পুড়িয়ে খায়
বুড়ায় খায়, বুড়িয়ে খায়
কাইল যে বাছা অইছে সে খাও
আনা দেখি জিতা খায়।
উত্তর : লপ।

১২২. সাদা মুরগি ডানা ঝাড়ে
কত ফইর[১] ঝইরা পড়ে।
উত্তর : তুলা।
অর্থ : ১. পালক।

১২৩. এমন একটি জিনিস আছে
সকলেই খায়

www.pathagar.com

বৃদ্ধ লোকে খাইলে পরে
মাথায় হাত দেয়।
যুবক যুবতী খাইলে পরে
বিষম লজ্জা পায়
ছেলে মেয়ে খাইলে পরে
কান্দি কান্দি মায়ের কাছে যায়।
উত্তর : আছাড়।

১২৪. উড়িতে জিকিমিকি
পড়তে ধান্ধা
আহার করিতে তার
লেঙগুড় বান্ধা।
উত্তর : জাল।

১২৫. এরাও মা-ঝি
তারাও মা-ঝি
লেবু তিনটা
জুর কয়টা?
উত্তর : ৩টা।

১২৬. সোনা মাই গো মাই
ভাদ মাইয়া কামে আমার
ছুদু বুদু নাই।
উত্তর : প্রবাদ।

তথ্যনির্দেশ

১. ঈশুতোষ চক্রবর্তী, উপজেলা, সংগ্রহের তারিখ : ১ ডিসেম্বর ২০১১ (১-২৩)
২. লাকী চক্রবর্তী, উত্তর কুলাউড়া, কুলাউড়া বাজার, সংগ্রহের তারিখ : ১৮ এপ্রিল ২০১২ (২৪-৫৪)
৩. জুয়েলী সূত্রধর, উপজেলা : জুড়ী, সংগ্রহের তারিখ : ২ নভেম্বর ২০১১ (৫৫-৮১)
৪. শৈলেন রায় রাখাল, সৈয়ারপুর, মৌলভীবাজার সদর, সংগ্রহের তারিখ : ১ জানুয়ারি ২০১১; সাবুল শব্দকর, রবাই শব্দকর, দীপালি শব্দকর, , সংগ্রহের তারিখ : ২০ এপ্রিল ২০১১ (৮২-৯৬)
৫. সতীশ শব্দকর, কমলগঞ্জ উপজেলা, সংগ্রহের তারিখ : ২৬ জুন ২০১১ (৯৭-১০৪)
৬. লীলা দাস, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, তারিখ : ২০ নভেম্বর ২০১১ (১০৫-১০৭)
৭. রমজান মিয়া, শ্রীনাথপুর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ১৬ জুলাই ২০১১ (১০৮-১০৯)
৮. আব্দুল মতিন, শ্রীনাথপুর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ১৯ জুলাই ২০১১ (১১০-১১৩)
৯. অধ্যাপক নৃপেন্দ্র লাল দাস, শ্রীমঙ্গল, সংগ্রহের তারিখ : ৭ নভেম্বর ২০১১ (১১৪-১১৯)
১০. হিরা মিয়া, শ্রীমঙ্গল, সংগ্রহের তারিখ : ৮ নভেম্বর ২০১১ (১২০-১২২)
১১. রামকৃষ্ণ সরকার, শ্রীমঙ্গল, সংগ্রহের তারিখ : ১ আগস্ট ২০১১ (১২৩-১২৬)

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

প্রবাদ লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা যা জীবন, জগত ও সমাজ সম্পর্কে মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। প্রবাদ ভাষার এক অমূল্য সম্পদ। প্রবাদ বক্তব্যকে অর্থবহ ও জোরালো করে তোলে। প্রবাদের ব্যবহার সর্বত্র লক্ষ করা যায়। কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন, বক্তৃতা এমনকি দৈনন্দিন কথাবার্তায়ও প্রবাদের ব্যবহার রয়েছে। মৌলভীবাজারের মানুষও তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রবাদের বহুল ব্যবহার করে থাকে।

১. নিজে চোর অইলে বাপরে বিশ্বাস নাই।
ব্যাখ্যা : নিজে চোর হলে আপন ব্যক্তিকেও বিশ্বাস করা যায় না।

২. কেউর খায় লাঙলে মাটি, আমার খাইছে আকালে মাটি।
ব্যাখ্যা : মানুষ কাজের ক্ষেত্রে ভুল করলে এই কথা বলে।

৩. বিয়াক্কলকে আকল দেওয়ার চাইতে এক থাল ভাত খাওয়াইয়া বিদায় করা ভালা।
ব্যাখ্যা : বুদ্ধিহীন ব্যক্তিকে পরামর্শ না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৪. দিয়া ধন দেখে মন, কাইড়া নিতে কতক্ষণ।
ব্যাখ্যা : সৃষ্টিকর্তা মানুষকে ধনসম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেন, কিন্তু এই ধনসম্পদ ধ্বংস হতেও সময় লাগে না।

৫. জিদের ভাত খায় না, ফালায়।
ব্যাখ্যা : মানুষ পরিবারের কারো সাথে রাগ করলে ভাত খাওয়া থেকে বিরত থাকে।

৬. ধান খাইছ মুরগী, যাইবায় কই।
ব্যাখ্যা : সুফল ভোগ করলে কাজ শেষ করে দিতে হয়।

৭. বাঘের বাচ্চা অইলে একটাই ভালা।
ব্যাখ্যা : সুপুত্র হলে একটিই যথেষ্ট।

৮. ভালা মাইনসর উপায় নাই, কমিনের মরণ নাই।
ব্যাখ্যা : যখন ভালো মানুষ বিপদে পড়ে আর খারাপ লোক দিব্যি ঘুরে বেড়ায় তখন এই কথা বলা হয়ে থাকে।[১]

৯. মামলার টাকা ভুতে জোগায়।
ব্যাখ্যা : মামলা পরিচালনার টাকা যে কোনোভাবে জোগাড় হয়ে যায়।

১০. পুয়া[১] মুরব্বি ডেকি[২] গাই, এ দেশে বসতি নাই।
আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ছেলে, ২. এঁড়ে বাছুর।
ব্যাখ্যা : অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে যখন বাবার অবর্তমানে মুরুব্বিয়ানা করতে চায়, তখন এই কথা বলা হয়।

www.pathagar.com

১১. গাইয়ে-বাছুরে মিল থাকলে আটুপানিত খিরানি যায়।
ব্যাখ্যা : দুইজনে মিল থাকলে যে কোনো পরিবেশে কাজ সফল হয়।

১২. ভরা থাকি শূন্য ভালা যদি ভরতে যায়।
ব্যাখ্যা : সাধারণত কোথাও যাত্রাকালে শূন্য কলসি দেখে যাত্রা করলে অমঙ্গল হয়, কিন্তু শূন্য কলসি নিয়ে যদি পানি আনার জন্য যায় এবং তা দেখে যদি কেউ যাত্রা করে তবে তাতে মঙ্গল হয়।

১৩. থাকলে কাঁচি, হারাইলে দা।
ব্যাখ্যা : কোনো সামান্য জিনিস হারিয়ে গেলে অনেকেই জিনিসটি মূল্যবান বলে প্রচার করে।

১৪. থাকলে পরার বাপের শ্রাদ্ধ হয়, না থাকলে নিজের বাপেরও শ্রাদ্ধ হয় না।
ব্যাখ্যা : টাকা থাকলে সবই হয়।

১৫. দেখাদেখি ভেকায় নাচে, ভেকারও কি আকল আছে!
ব্যাখ্যা : দেখাদেখি অনেকেই না বুঝে কথা বলে থাকে।[২]

১৬. দেশের ভাই শুকুর মুহাম্মদ আর যত পুয়া
আওরের[১] মাঝে আকালুকি আর যত কুয়া।
আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. হাওরের।
ব্যাখ্যা : এই এলাকার শুকুর মুহাম্মদ শারীরিকভাবে বড় ছিলেন এবং মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার হাকালুকি হাওর এ অঞ্চলের মাঝে বড়। তাই এই প্রবাদ প্রচলিত হয়ে আসছে।

১৭. দুই হতিনের ঘর, খদায় রক্ষা কর।
ব্যাখ্যা : যে লোকের স্ত্রী দুইজন, সেখানে ঝগড়া খুব বেশি হয়। তাই এই কথা অনেকেই বলে থাকেন।

১৮. এক বেটিয়ে হাঠা নাটা, দুই বেটিয়ে পেচি হাঠা, তিন বেটিয়ে বাজার।
ব্যাখ্যা : এক সাথে মহিলা তিন-চারজন হলেই কথা বেশি হয় বিধায় এই কথা বলা হয়ে থাকে।

১৯. অভাগীর দুটি পুত[১], একটা রাইক্ষস একটা ভূত।
আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. পুত্র।
ব্যাখ্যা : অভাগী মহিলার দুটি পুত্রই খারাপ।

২০. আসে উনা পারয় দুনা
ছাগলে পিন্দায়[১] কানের সোনা।
আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. পরিধান করায়।
ব্যাখ্যা : হাঁস ও পায়রার চেয়ে ছাগল বিক্রি করে বেশি অর্থ পাওয়া যায় তাই এই কথা বলা হয়।

২১. টে কইতে টেংরা বুজিও না।
ব্যাখ্যা : অনেকেই টে বলতে বা কিছু বলার আগেই অনেক কিছু বুঝার বাহাদুরি করে।[৩]

২২. ডালিম পাকলে পাট্টা যায়, ছোট লোক বড় হলে বন্দুরে কান্দায়।
ব্যাখ্যা : ছোটলোক হঠাৎ ধনী হলে বন্ধুকে চেনে না।

www.pathagar.com

২৩. অল্প বয়সে না কামাইলে ধন আর কাতি মাসে না কাটিলে ছন।
ব্যাখ্যা : অল্প বয়সে বিদ্যা অর্জন বা ধন সম্পদ না করলে বৃদ্ধকালে হয় না।
২৪. অতি মিঠায় পেট পাকায়।
ব্যাখ্যা : বেশি ভালোবাসা ক্ষতির কারণ বুঝানো হয়েছে।
২৫. অ-লক্ষীর তিন কাম দড়
ক্ষুধা, নিদ্রা, আলস্য বড় ।
ব্যাখ্যা : ক্ষুধা, নিদ্রা ও আলস্য যাদের তাদেরকে অ-লক্ষী বুঝানো হয়েছে।
২৬. অইব পুলা ডাকব বাপ, তে যাইব মনের তাপ।
আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. পুত্র।
ব্যাখ্যা : যে লোকের পুত্রসন্তান নেই তারা মনের দুঃখে এই কথা বলে।
২৭. আইলে গেলে[১] মাইনষের কুটুম না গেলে কিসের কুটুম।
আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. আসা-যাওয়া।
ব্যাখ্যা : আসা-যাওয়ার মধ্যে আত্মীয়তা ও সম্পর্ক বহাল থাকে।[৪]
২৮. অতি প্রণয় যেখানে, নিত্যি যাইও না এখানে
যদি যাও নিত্যি, ঘটব একটা কির্তি।
ব্যাখ্যা : অতি প্রণয় ভালো নয় ক্ষতির কারণ।[৫]
২৯. অন্তরিয়ার হন্ত নাই, করচ গাছের সীমা নাই।
ব্যাখ্যা : রাজনগর উপজেলার অন্তেহরি গ্রামে করচ গাছ বেশি জন্মে, তাই ঢং করে এই প্রবাদ বলা হয়।[৬]
৩০. উনারাইয়া যেমদি যায়, বাট্টুয়ায় তারে পায়।
ব্যাখ্যা : কপাল মন্দ যে দিকে যায়, খারাপ খবর সব দিক থেকে আয়।
৩১. উবে তল হইমু, তেও নইয়া বুর দিতাম নায়।
ব্যাখ্যা : ক্ষতি যা হয় হবে, কিন্তু মান নষ্ট করব না।
৩২. এক পুতের মা সর্গ যায়, সাত পুতের মারে হিয়াল[১] এংলে খায়।
আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. শিয়াল।
ব্যাখ্যা : চরিত্রবান ছেলে একটিই ভালো, নষ্ট ছেলে সাতটিও ভালো নয়।[৭]
৩৩. আপনা তাকি বেগনা ভালা, পেক থাকি পানি বালা।
ব্যাখ্যা : অনেক সময় আপনজন থেকে পড়শি ভালো হয়, কাদা থেকে পানি ভার বুঝানো হয়।
৩৪. আগে মাতে যে, দুয়ার ঘুচাইব সে।
ব্যাখ্যা : যে বেশি কথা বলে তাকেই কাজটি করার কথা বলা হয়।
৩৫. আইজ খায় না রাগে, কাইল হক্কলের[১] আগে।
আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. সকলের।
ব্যাখ্যা : অনেক সময় রাগ করে অনেকেই খায় না। কিন্তু ভাতের উপর রাগ করে বেশি সময় থাকা যায় না।
৩৬. আগে পিছে দর, তে ঘোড়া চড়।
ব্যাখ্যা : সময়কালে কাজ করার কথা বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

৩৭. আচারে রান্ধে বিচারে খায়, হরি[১] বোউয়ের কাম না পুরায়।
আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. শাশুড়ি।
ব্যাখ্যা : শাশুড়ি ও পুত্রবধূর পরিকল্পনা ছাড়া কাজ করে সময় নষ্ট করা।

৩৮. আজাইয়া মাগি কিতা করে, ভাউরের গায়ের ফুরা কুটে।
ব্যাখ্যা : স্ত্রী অকাজে ব্যস্ত থাকলে স্বামী স্ত্রীর উদ্দেশ্যে এই বাক্য করে।[৮]

৩৯. আগের হাল যেমদি যায়, পিছের হাল হেমদি যায়।
ব্যাখ্যা : বড় ভাই ভালো হলে ছোট ভাইগণ ভালো হয়।

৪০. আটে চাইরে যায়, খাট কান পায়
নিত নিত যায়, পুরইন বারি খায়।
ব্যাখ্যা : আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেশি বেশি আসা-যাওয়া করলে আদর কম হয়।

৪১. কার হগদা খাও গো, বান্দি ঠাকুর চিন না।
ব্যাখ্যা : অনেক স্বামী স্ত্রীকে গালি দিয়ে এই কথা বলে থাকে।

৪২. জাউয়ার চাচা।
ব্যাখ্যা : কঠিন লোক।

৪৩. আপতে পত হইব, অমানুষ মানুষ হইব
দুরা হাপ রাজ্য পাইব, জাতি সাপে বিওর লইব।
ব্যাখ্যা : যে দিকে রাস্তা নাই সেদিকে রাস্তা হবে, খারাপ মানুষ ভালো হবে, জাতি সাপ লোকালয়ে আসবে না, বিষ নাই সাপ রাস্তাঘাটে পাওয়া যাবে অর্থাৎ খারাপ লক্ষণ।

৪৪. আত্তির[১] পিচলে পাও, সুজনেরও ডুবে নাও।
আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. হাতির।
ব্যাখ্যা : শক্তিশালী লোকও বিপদে পড়ে, ঝড় আসলে মাঝিরও নৌকা ডুবে।[৯]

৪৫. খাইবার বেলা আগে, কামের বেলা ভাগে।
ব্যাখ্যা : সমাজে বেশির ভাগ লোক খাওয়ার সময় আগে যায়, কাজ করার কথা বললে পিছনে থাকে।

৪৬. গাছ উটবার বাগ নাই, বড় ছাও আমার।
ব্যাখ্যা : অনেকেই কষ্ট না করে বেশি নিতে চায়।[১০]

৪৭. নাপিত দেখলে কুনি নোখ বাড়ে।
ব্যাখ্যা : কাজের মানুষ সামনে দেখলেই অনেকেরই কাজ করাতে মনে চায়।

৪৮. পাটার বলি দেইক্কা খাসিয়ে হাসে,
তোর লাইগ্গা বকরা ঈদ আছে।
ব্যাখ্যা : অন্যের বিপদে হাসতে নেই, নিজের বিপদও আসবে।

৪৯. ভালার পাও ধুয়ানি ভালা, কমিনের হাত ধয়ানিও ভালা নয়।
ব্যাখ্যা : ভালো মানুষকে শ্রদ্ধা করা ভালো, খারাপ মানুষকে প্রশ্রয় না দেওয়া ভালো।[১১]

৫০. পরার পুতে নাও বায়, তেল তেলি করে
নিজের পুতে নাও বায়, আইক্কায় টার পায়।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা : অন্যের ছেলে নৌকা বায়, খুব আরামে যায়। নিজের ছেলে নৌকা বায়, বড় কষ্ট পায়।[১২]

৫১. সিংহের গর্জন সয়, মশার ভেনভেনানী সয় না।
ব্যাখ্যা : বড়লোকের শাসন সহ্য করা যায় ছোটলোকের দুষ্টামি সহ্য করা যায় না।

৫২. সময়ের গিত সময়ে গাও।
ব্যাখ্যা : সময় মতো সময়ের কাজ করা।

৫৩. সাতাইর মার মুখ কানা মিটা
সারা দিন কাম করাইয়া আধখানা পিঠা।
ব্যাখ্যা : কথা মিষ্টি, দুষ্টের যম।[১৩]

৫৪. হাপ[১] মাইরা লেংগুরের[২] বিষ রাইক্ক[৩] না।
আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. সাপ, ২. লেজ, ৩. রেখে।
ব্যাখ্যা : ঝগড়া-বিবাদ শেষ করার ক্ষেত্রে কিছু শেষ কিছু রাখা ঠিক নয়।

৫৫. পনর দিন আইন্দাইর পনর দিন চন্দনী।
ব্যাখ্যা : সব দিন সমান যায় না।[১৪]

৫৬. ধনির বাড়িত কাঙ্গাল যায়, কান্দিয়া কান্দিয়া বাড়িত আয়।
ব্যাখ্যা : অনেক ধনী আছেন গরিবদের মূল্যায়ন করে না।

৫৭. খাওরে বেটিন খাও, পুয়া-পুরি ওইবার আগে খাও।
ব্যাখ্যা : ছেলেমেয়ে জন্মিবার আগে মেয়েরা এই কথা বলেন, কারণ ছেলেমেয়ে হলে নিজে ভালো জিনিস খাওয়া যায় না।[১৫]

৫৮. যেচাখান বইও না, হকল জেগাত মাইত না।
ব্যাখ্যা : যেখানে সেখানে বসতে নেই, যে কোনো জায়গায় কথা বলতে নেই।

৫৯. আয় পবন আয় পবন, চুচা নিয়া ধান তইয়া যা।
ব্যাখ্যা : অগ্রহায়ণ মাসে গ্রামের মহিলাগণ ধান থেকে চুচা আলাদা করতে বাতাসের মধ্যে ধান উঁচু করে ধরে এই ভাবে ডাকেন।[১৬]

৬০. গরিবের গরিবানা, নুন দিয়া পিঠা খানা।
ব্যাখ্যা : গরিবের খাওয়া-দাওয়ার মান যেমন হয়।

৬১. ফল পাকলে মিঠা, মানুষ পাকলে তিতা।
ব্যাখ্যা : ফল পাকলে মিষ্টি হয়, মানুষ বৃদ্ধ হলে কর্কশ হয়।

৬২. তোপান যায় বড় গাছের উপর দিয়া।
ব্যাখ্যা : যার বিবেক-বুদ্ধি বেশি সেই ঝামেলা প্রতিরোধ করে।[১৭]

মণিপুরী প্রবাদ প্রবচন (পাউরৌ)

১. ঙাখা নাঙারেন হৌদবনি
অর্থ : ডানকানা মাছের তরকারি দিয়ে ভোজন হয় না।

২. শামু মায়া থিন্দোরকপা
মঙ্গে থেঙ্গুনা য়ৈশনবা য়াদবনি।
অর্থ : হাতির দাঁত বেরুলে শক্ত মুগুরের বাড়িতেও আটকানো যায় না। অর্থাৎ খারাপ লোককে ভালো পথে ফেরানো কঠিন।

www.pathagar.com

৩. ওয়াতোন্না ওয়াংঙবদি
ক্বাক্না কমদেকই।
অর্থ : বাঁশের মাথা যদি খুব উঁচু হয়, তবে কাক বসে তা ভেঙে ফেলে।
৪. হৈনৌ পাম্বীদা থৈবোং পান্দাবনি
অর্থ : আমগাছে কাঁঠাল ধরে না।
৫. অখোংবা হুই চিক্তবনি।
অর্থ : যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে সে কুকুর কামড়ায় না।
৬. ইখুৎ লাম্থোক্লাগা মীখুৎ লাম্থোক্লকপনি
অর্থ : নিজে হাত বাড়ালে অন্যেও হাত বাড়ায়।
৭. খোঙ চোৎলগা চীন চোৎপনি
অর্থ : পা ভিজলে মুখও ভিজে।
৮. লিনসু শিবা চৈসুসু তেক্তবা।
অর্থ : সাপও যেন মরে, লাঠিও যেন না ভাঙে।
৯. চল চপ্প তেনশিল্লি
মল্ল মল্ল শোল্লক্লি।
অর্থ : কাটতে কাটতে ছোট হয় আর বাছতে বাছতে নরম হয়।
১০. কলিদা খুদৈ কংদবনি।
অর্থ : কলিকালে গামছা শুকাবার সময় মেলে না।
১১. খুবাক নাম্মতা খূবা মখোল থোক্তে।
অর্থ : এক হাতে তালি বাজলে শব্দ হয় না।
১২. হুইবু দোলাই তোংহল্লগা খিগংদা চোংথৈ।
অর্থ : কুকুরকে পালকিতে রাখলেও আবর্জনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।
১৩. হুইনা নুমিৎকীদমক ওয়াই।
অর্থ : সূর্যের জন্যে চিন্তায় মরে কুকুর।
১৪. লু কোকদা লেন তাবা।
অর্থ : ন্যাড়া মাথায় 'শিল' পড়া।
১৫. কাংখুলদা মপান শাবা।
অর্থ : চারাগাছেই ফুল ফোটা।
১৬. অপাৎপদা হয়িং থাজনবা।
অর্থ : স্বেচ্ছায় নিজের বিপদ ডেকে আনা।
১৭. ইকাই খঙদবনা পুকথনবা।
অর্থ : যার লজ্জা-শরম নাই, তারই পেট ভরে।
১৮. কৈসু কিবা মথীসু কিবা।
অর্থ : বাঘেও ভয়, বাঘের মলেও ভয়।[১৮]

খাসিয়া প্রবাদবাক্য

১. মহামপ্রারাঃ চো খি প্যানস্টে
পোনকেত হা কা ওয়া।

www.pathagar.com

অর্থ : যে জন নাচতে জানে না, সেই জন উঠান বাঁকা এমন ভাব দেখায়।

২. বাহঃ শৎফো ও মিতে, ক্যাট চান্না টি-য়্যা
অর্থ : দোষ করেছে একজন আর আমাকে দোষারোপ করা হচ্ছে।

৩. কাদি আকাম কা দুহ্ নার
অর্থ : নেওয়ার চাইতে দেওয়া ভালো।

৪. কালেহ্ কাইতে চু দিমউ
অর্থ : যেভাবে কর্ম করবে, সেভাবে ফল পাওয়া যাবে।[১৯]

চা-জনগোষ্ঠীর প্রবাদ

১. রূখন্ পরাশ তাঁহাঁ রেঁড় প্রধান
অর্থ : যে দেশে মূল্যবান গাছ নেই সেখানে ভেরেন্ডাই প্রধান।

২. লিঙ্গ না পুছে খেসারিকে জলে
অর্থ : যেখানে যা দিতে হয়, সেখানে তা না দিলে নয়।

৩. আনর গুরু বাহির চেলা, মাঙ্গে গুড় ত আনে ঢেলা।
অর্থ : বললাম এক কাজ, করলে আরেক কাজ।

৪. সায়িঁকা ঘর দুর হয়, লম্বি জয়সে খাজুর
অর্থ : চড়ে তো চাখে প্রেমরস, গিরে তো চখনাচুর।

৫. ঘরে ভূঁজি ভাঙ্গ নহি, দরি বিছাওনা
অর্থ : ঘরে খাওয়ার কিছু নাই, মখমলের বিছানা ব্যবস্থা।[২০]

তথ্যনির্দেশ

১. সুনীতি বালা দাশ, স্বামীর নাম : অমূল্যচন্দ্র দাশ, গ্রামঃ দক্ষিণ বাড়ন্তি, জেলা : মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ২৮ জুন ২০১১

২. শ্রী রসময় সূত্রধর, গ্রামঃ আজমেরু, জেলা : মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ৫ জুলাই ২০১১

৩. পার্থ দাশ চৌধুরী, পিতার নাম : বিবেকানন্দ চৌধুরী, গ্রাম : অন্তেহরি, উপজেলা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ১২ জুলাই ২০১১

৪. সত্যেন্দ্র কুমার দাশ, গ্রাম : বড়গাঁও, উপজেলা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ১৫ জুলাই ২০১১

৫. শ্রী রসময় সূত্রধর, গ্রাম : আজমেরু, জেলা ও থানা : মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ১৮ জুলাই ২০১১

৬. শ্রী দিলীপ কুমার দাশ, গ্রাম : অন্তেহরি, উপজেলা : রাজনগর, জেলা ও থানা : মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ১৯ জুলাই ২০১১

৭. বিকাশচন্দ্র দাশ, ঠিকানা : নববিথী এলাকা, জেলা : মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ২১ জুলাই ২০১১

৮. আয়েশা বেগম, গ্রাম : বেহালা, কুলাউড়া, জেলা : মৌলভীবাজার

৯. সরযু বালা দাস, স্বামীর নাম : শহীদ রমেশচন্দ্র দাস, গ্রাম : শ্রী দুর্গা, উপজেলা : কমলগঞ্জ, জেলা : মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ২৫ জুলাই ২০১১

www.pathagar.com

১০. আক্কল আলী, গ্রাম : শ্রী সূর্য, উপজেলা : কমলগঞ্জ, জেলা : মৌলভীবাজার
১১. রমা দাস, স্বামীর নাম : সরিৎ কুমার দাস, গ্রাম : শ্রী সূর্য, উপজেলা : কমলগঞ্জ, জেলা : মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ১০ সেপ্টেম্বর ২০১১
১২. বিজয়কুমার দাস, গ্রাম : শ্রী বেরকুড়ি, উপজেলা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ১৫ আগস্ট ২০১১
১৩. মানিক দাস, গ্রাম : নলদাড়িয়া, জেলা : মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ৫ সেপ্টেম্বর ২০১১
১৪. চুনু মিয়া, গ্রাম : সোনাপুর, বড়বাড়ি, জেলা : মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ১৩ অক্টোবর ২০১১
১৫. অনুপ কুমার দেব রায়, ঠিকানা : পশ্চিম বাজার , জেলা : মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ২৫ অক্টোবর ২০১১
১৬. অমূল্য চন্দ্র দাশ, গ্রাম : দক্ষিণ বাড়ন্তি, জেলা : মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ২৮ অক্টোবর ২০১১
১৭. গীতি রানি দাশ, গ্রাম : বড়গাঁও, উপজেলা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার, সংগ্রহের তারিখ : ৩০ অক্টোবর ২০১১
১৮. প্রতাপচন্দ্র সিংহ, (অব. শিক্ষক) বয়স : ৬২ বছর, ভাণ্ডারী গ্রাম, কর্মদা ইউপি, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ২৬ ও ২৭ মার্চ ২০১২
১৯. পিটিশন, ব্রিলিং বাড়েক, ইছলা ছড়া পুঞ্জি, বরমচাল, উপজেলা : কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ২০ জুন ২০১১
২০. রনজিৎ কুমার কানু, লংলা চা-বাগান, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১

www.pathagar.com

লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাস

কৃষিভিত্তিক লোকসমাজে দৈনন্দিন চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি নিয়ে অনেক ধরনের বিশ্বাস ও সংস্কার রয়েছে। বর্তমানে অনেক কমে আসলেও গ্রামাঞ্চলের মানুষ এখনও পূর্বপুরুষের প্রথাকে শ্রদ্ধা জানান ও অনেকে মেনেও চলেন। বিচিত্র ধরনের এই লোকবিশ্বাসগুলির কিছু ধর্ম কেন্দ্রিক কিন্তু বেশির ভাগই লোকচিন্তা ও আচার ভিত্তিক। মৌলভীবাজার জেলায় প্রচলিত লোকবিশ্বাসের কিছুটা পরিচয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

দিন-মাস কেন্দ্রিক

১. সোমবারে বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কাটা নিষেধ।
২. শনি-মঙ্গলবারে বাপের বাড়ি যাওয়া অমঙ্গল।
৩. সোমবারে নতুন কাপড় পরতে নেই।
৪. শনি-মঙ্গল এবং জন্মবারে নখ-চুল কাটলে আয়ু কমে যায়।
৫. শনি-মঙ্গলবারে, ভোরবেলায় এবং সন্ধ্যার সময় শ্মশানে যেতে নেই।
৬. উগার বা ধানের ভাঁড়ার থেকে অমাবস্যা-পূর্ণিমা এবং শনি-মঙ্গলবারে ধান বের করা যাবে না।
৭. শনি-মঙ্গলবারে কারো মৃত্যু হওয়া ভালো নয়।
৮. বৈশাখের প্রথম দিন তিতা খেতে হয়।
৯. চৈত্র মাসে নতুন কন্যা বাপের বাড়ি নাইওর দেওয়া নিষেধ।

জন্ম-মৃত্যু সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস

১. চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের সময় গর্ভবতী নারী কোনো কিছু খেতে, তরিতরকারি কাটতে বা ঘুমাতে পারবেন না।
২. গর্ভবতী মহিলাকে তার ইচ্ছামতো খেতে না দিলে সন্তান খাই-খাই করে অর্থাৎ সব খেতে চায়।
৩. মুসলিমসমাজে ছেলেশিশু জন্ম নিলে আজান দেওয়া হয় এবং হিন্দুসমাজে সাতবার উলুধ্বনি করা হয়।
৪. সন্তান না বাঁচলে যমের অরুচির জন্য সন্তানের কান ফুঁড়ে দেওয়া বা ব্যঙ্গনাম রাখতে হয়।
৫. হিন্দু পরিবারের গর্ভবতী মহিলার পক্ষে কুমড়া কাটা ও হাঁস-মুরগি কাটা বা বলি দেওয়া নিষেধ। স্বামীকেও স্ত্রীর গর্ভকালীন সময়ে কুমড়া-হাঁস-মুরগি ইত্যাদি কাটা বা বলি দেওয়াকে নিষেধ করা হয়।
৬. মেয়ের কাছে পিতা-মাতার মৃত্যুর খবর এলে এক ডুবে স্নান করতে হবে।

www.pathagar.com

৭. মৃত্যুসংবাদ নিয়ে আসলে বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করতে নেই।
৮. মরা বাড়িতে চুলা জ্বালাতে নেই।

যাত্রা সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস

১. কোনো শুভ কাজে রওনা দিলে পেছন থেকে ডাকতে নেই।
২. আঁটকুড়ার মুখ দেখে যাত্রা করলে ফল ভালো হয় না।
৩. যাত্রাপথে বিধবা মহিলা দেখলে যাত্রা শুভ হয় না।
৪. কোনো শুভ কাজে যাত্রার সময় তিন (৩) জন বা বেজোড় লোক থাকলে কার্যসিদ্ধি না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৫. বাড়ি থেকে বাইরে যাত্রা করার সময় হাঁচি বা কাশি দিলে একটু অপেক্ষা করে যেতে হয়।
৬. বিবাহ জাতীয় শুভকাজে যাত্রার প্রাক্কালে মাটিতে সামান্য দই ফেলে পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করতে হয়।

পশু-পাখি কেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস

১. হলদে পাখি ডাকলে কুটুম আসে।
২. অসময়ে (সন্ধ্যা বা রাতে) কাক ডাকলে আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা।
৩. কুলি পাখি (এক ধরনের পেঁচা) ডাকলে মৃত্যুসংবাদ আসে। এছাড়া পেঁচা ঘরে প্রবেশ করলে অমঙ্গল হয়।
৪. ফিঙে পাখি বা কেছকেছি পাখি ডাকাডাকি করলে ঘরে ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য এ পাখির ডাক শোনা মাত্র ঘরের দুহাড়িতে পানি ফেলতে হয়।
৫. কথা বলার সময় টিকটিকি ডাকলে বিষয়টা সত্য বলে ধরতে হয় এবং মাটিতে সত্য-সত্য-সত্য বলে টোকা দিতে হয়।
৬. বাজার থেকে গরু কেনার পর বাড়িতে এনে লবণ ও গুড় খাওয়ানো ভালো।
৭. গরু রক্ষার জন্য রাতের বেলা ঘোরচণ্ডীকে (গরুর দেবতা)-কে কলা ও এক গ্লাস জল দ্বারা নবিদ বা নৈবেদ্য দেওয়া হয়।

কৃষি সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস

১. শনি-মঙ্গলবারে হাল ধরা যাবে না।
২. ধানের বিচি ছিটানোর দিন ভিক্ষা দেওয়া যাবে না।
৩. ক্ষেতের মই দাঁড় করালে বৃষ্টি আসে।
৪. ভাদ্র মাসে অতি বৃষ্টির কারণে কৃষকের ধান রোদে শুকানোর অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য বৃষ্টি থামানোর উদ্দেশ্যে প্রার্থনার পাশাপাশি কুনো ব্যাঙের পায়ে সুতো ঝুলিয়ে রাখা হয়।
৫. ছাতি মাথায় দিয়ে ক্ষেতে জমির আল ধরে যাওয়া নিষেধ।
৬. অম্বুবাচির ৩ দিন হালচাষ নিষেধ এবং বিধবারা লাঙলের দ্বারা উৎপাদিত কোনো ফসল খেতে পারবেন না।

www.pathagar.com

নারী কেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস

গ্রামাঞ্চলে এমনকি শহরেও মূলত মহিলারাই লোকবিশ্বাসগুলির ধারক ও বাহক।

১. রান্নাঘরে খাবারের আসন বা পিঁড়ি দেওয়ার সময় শব্দ করলে ঘরের লক্ষ্মী চলে যায়।

২. গ্রামের অন্যান্য মহিলাদের চেয়ে যে মহিলা অসময়ে রান্না করে এবং স্বামীকে রেখে আগেই খেয়ে নেয় মৃত্যুর পরে সৃষ্টিকর্তা তার জিহ্বা কেটে ফেলেন। অর্থাৎ স্ত্রীরা স্বামীর খাওয়ার পরে খাদ্য গ্রহণ করবেন।

৩. হিন্দু মহিলারা অতি ভোরে শয্যা ত্যাগ করে প্রথমে উঠানে গোবর ছিটা দিয়ে উঠান ঝাড়ু দেবেন, অতঃপর রান্নাঘর লেপন করে স্নান করে প্রথম চুলায় আগুন ধরাবেন। বাসি কাপড়ে রান্নাঘরে যাওয়া যাবে না।

৪. ভরা কলসের পানি পুরুষকে দেওয়ার আগে স্ত্রী খেয়ে দেখবেন।

৫. ঘরের মধ্যে মহিলাদের শব্দ করে হাঁটা নিষেধ।

৬. মহিলারা বিকালে বা সন্ধ্যার সময় চুল ছেড়ে হাঁটলে অপশক্তির কু-নজর পড়ে।

৭. রাতের বেলা মহিলারা গাছ থেকে কোনো প্রকার ফল-ফুল বা সবজি পাড়তে পারবেন না।

৮. স্বামীর নাম মুখে নিলে আয়ুক্ষয় হয়। এছাড়া শ্বশুর ও ভাসুরের নামও মুখে নেওয়া যাবে না।

৯. রাতে ঘর ঝাড়ু দেওয়ার পর সেই ময়লা ঘরের বাইরে ফেলা যাবে না। পর দিন সকালে ফেলতে হবে।

১০. কোনো রান্না করা খাবার খাওয়ার আগে সামান্য অংশ আগুনে ফেলতে হয়।

১১. খাওয়ার সময় কোনো মরাবাড়ি থেকে কান্নার শব্দ শোনা গেলে থালার নীচে একটু পানি দিতে হয়।

১২. রাতে শাক খাওয়া নিষেধ।

১৩. নাইওরি বাড়িতে পৌঁছার পর হিন্দু মহিলারা 'উলুধ্বনি' দেয়। যাকে জুকাড় দেওয়া বলে।

গার্হস্থ্য লোকবিশ্বাস

১. ভাঙা আয়নায় মুখ দেখলে চিরদুঃখ থেকে যায়।

২. রাতের বেলা ঘর থেকে অন্যকে টাকা ধার বা কর্জ বা ভিক্ষা দেওয়া যাবে না।

৩. কোনো ব্যক্তিকে একবার নাম ধরে ডাকতে নেই।

৪. লৌহ নির্মিত জিনিস যেমন-দা, কোদাল, কাঁচি বিনা কারণে মাটিতে কুপিয়ে রাখা যাবে না।

৫. ঝাড়ু দিয়ে কাউকে আঘাত করা যাবে না। রাগবশত করলে ঝাড়ুর (শলা বা সুপারি গাছের পাতা দ্বারা নির্মিত হলে) সামান্য অংশবিশেষ ছিঁড়ে থুথু দিয়ে ফেলতে হয়।

www.pathagar.com

ধর্মীয় লোকবিশ্বাস

১. গুরু বা পিরদের কথা ফিরানো যাবে না।
২. তাবিজ কেন্দ্রিক বাধা নিষেধ আছে; যেমন মরা বাড়ি যাওয়া যাবে না, মরা স্পর্শ করা যাবে না, রুই মাছ খাওয়া যাবে না ইত্যাদি।

খাসিয়াদের লোকবিশ্বাস

১. রাতের বেলায় হাতের নখ কাটা ভালো না।
২. একটা ঘরে যে রাস্তায় প্রবেশ করা হবে, সে রাস্তা দিয়ে বের হতে হবে।
৩. ভাঙা কাচের কোনো জিনিস ব্যবহার করা যাবে না।
৪. মৃত ব্যক্তির আত্মা নিজের ঘরে তিন দিন পর্যন্ত ঘুরাফেরা করে। তারপর সে আত্মা উপরে চলে যায়।

তথ্যসহায়ক

১. অপূর্ব শর্মা, সাতগাঁও, শ্রীমঙ্গল, সংগ্রহের তারিখ : ২০ মার্চ ২০১১
২. রঞ্জিত মোহান্ত, ঘোষপুর, কমলগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ৩০ মার্চ ২০১১
৩. রসেন্দ্র শর্মা, গুতগুতি, কুলাউড়া, রানী বেগম, বুকশিমুইল, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ৪ এপ্রিল ২০১১
৪. জুয়েলী রানী সূত্রধর, হরিরামপুর, জুড়ী, সংগ্রহের তারিখ : ৮ মে ২০১১
৫. পিটিশন, ব্রিলিং বাড়েক, ইছলা ছড়া পুঞ্জি, বরমচাল, কুলাউড়া, সংগ্রহের তারিখ : ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১২

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

১. লাঙল

সুপ্রাচীনকাল থেকে কৃষিকাজে ব্যবহৃত অন্যতম মাধ্যম কাঠের লাঙল। লাঙল তৈরি হয় মূলত বাবলা গাছের কাঠ ও লোহা দিয়ে। মাঝারি মোটা ভারী একখণ্ড কাঠের এক প্রান্তে থাকে ইশ, যার সঙ্গে জিহ্বার মতো লাগানো থাকে লোহার সূচালো ফলা। অন্য প্রান্তে থাকে হাতে ধরবার জন্য মুঠি। লাঙলের সাহায্যে ভূমিকর্ষণ ছাড়াও বীজ বপন, সার প্রয়োগের কাজ করা হয়। বর্তমানে কলের লাঙল এসে কাঠের লাঙলের ব্যবহার অনেক কমিয়ে দিয়েছে।

২. জোয়াল

জোয়ালের সাথে লাঙল জুড়তে হয়। গরু বা মহিষকে জোয়ালের সঙ্গে একত্রে বেঁধে লাঙল দিয়ে জমি চাষ করা হয়।

৩. মই

মই বাঁশের তৈরি এক প্রকার কৃষিযন্ত্র, যা মাটি সমান করার কাজে ব্যবহার করা হয়। লাঙল চষার পরে জমিতে মই দিতে হয়। লাঙল খুলে জোয়ালের সাথে লম্বা দড়িতে বলদের পশ্চাত ভাগে মই বাঁধতে হয়। কৃষক মই-এর উপর দাঁড়ালে চাপে মাটি সমান্তরাল হয়। দুটো মোটা বাঁশ আর বাঁশের কয়েকটি শলাকা দিয়ে মই তৈরি করা হয়।

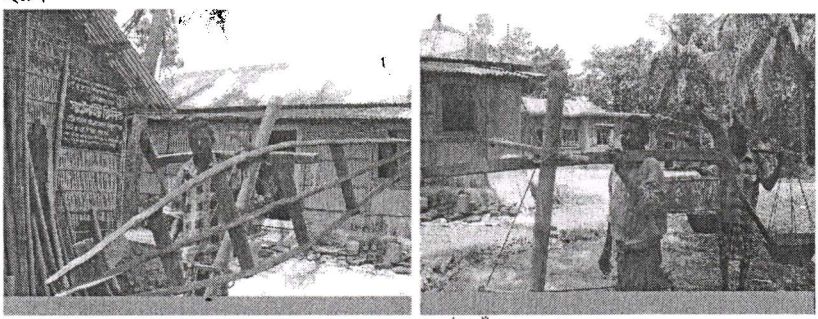

লাঙ্গল, জোয়াল এবং মই কাঁধে কৃষক

৪. কোদাল

কোদাল মূলত মাটি খোঁড়া ও মাটির শুকনো বড় ঢেলা ভাঙার কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রথমে লোহাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চ্যাপ্টা ও প্রসারিত করা হয়। প্রসারিত লোহাকে গরম করে কোদালের সাজে বসিয়ে দেওয়া হয়। কোদালের পেছনের অংশের ফাঁকের ভেতর শক্ত লাঠি প্রবেশ করিয়ে ধরার উপযোগী করা হয়।

www.pathagar.com

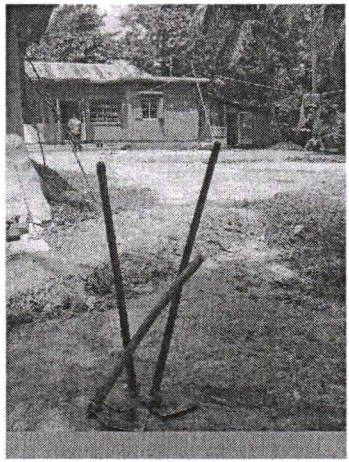

কোদাল

৫. খন্তা

মাটি খোঁড়ার কাজে খন্তা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কাঠের হাতলের সাথে লোহার ফলা যুক্ত করে খন্তা তৈরি করা হয়। সাধারণত মাটিতে খুঁটি গাড়ার জন্য খন্তা দিয়ে খুঁড়ে গর্ত করা হয়।

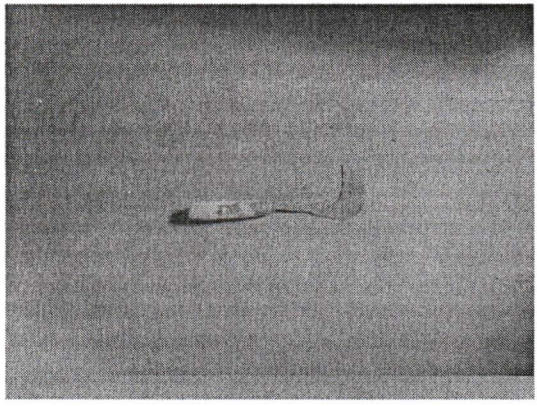

খন্তা

৬. হেইত

হেইত দিয়ে সাধারণত ছোট ডোবা, নালা বা খালের পানি ফেলা হয়।

প্রথমে পানিতে ভেজানো বাঁশের খাপ তৈরির পর চালুনির মতো আড়াআড়ি খাপের ওপর সোজা খাপকে এমনভাবে বসাতে হবে যাতে সোজা খাপটি আড়াআড়ি খাপের একটির নীচ ও আরেকটির ওপর দিয়ে যায়। লক্ষ রাখতে হবে যেন তাদের মধ্যে

www.pathagar.com

কোনো ফাঁক না থাকে। ফাঁক থাকলে পানি বের হয়ে যাবে।এরপর খাপগুলোর মাথা U আকৃতিতে বাঁকিয়ে বাঁশের শক্ত চিকন কঞ্চি দ্বারা ভালোভাবে বেঁধে দিতে হবে। খাপের দৈর্ঘ্য সাধারণত ১ থেকে ১$\frac{১}{২}$ হাত লম্বা হয়।

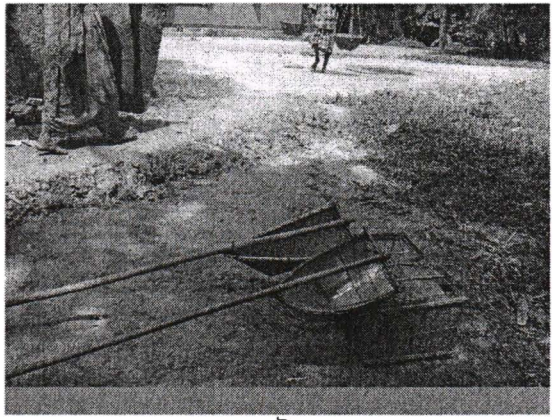

হেইত

৭. ঢেঁকি

কাঠ দ্বারা নির্মিত বিশেষ আকৃতির পদচালিত কল। সাধারণত ঢেঁকিতে প্রায় ৬ ফুট লম্বা এবং ৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট একটি কাঠের ধড় থাকে। মেঝে থেকে প্রায় ১৮ ইঞ্চি উচ্চতায় ধড় ও দুটি খুঁটির ভিতর দিয়ে একটি ছোট হুড়কা বা বল্টু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই হুড়কার উপরেই ধড়টি ওঠানামা করে।

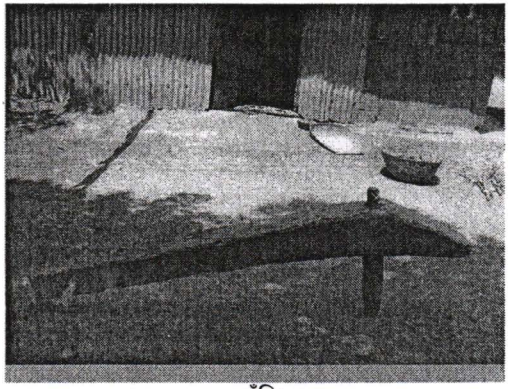

ঢেঁকি

ঢেঁকির সাহায্যে ধানের তুষ ছাড়িয়ে চাল তৈরি করা হয়। পিঠা তৈরির জন্যে করা হয় চালের গুঁড়ি। এছাড়া চাল বা গমের আটা তৈরিতে, শস্যাদির খোসা ছাড়াতে, গুঁড়ো বা পিষ্ট করতেও ঢেঁকির ব্যবহার রয়েছে।

www.pathagar.com

৮. গাইল ও ছিয়া

ধান ভানা ও চাল বা শস্য গুঁড়ো বা পিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত কাঠের পাত্র বিশেষ। ঢেঁকির বিকল্প বা ক্ষুদ্র সংস্করণ। এতে জায়গা অনেক কম লাগে। কাঠের তৈরি বড় আকারের পাত্র যাকে গাইল বলা হয়, এর মধ্যে শস্য রাখা হয়। কাঠের তৈরি মোটা দণ্ড দিয়ে পাত্রে রাখা শস্যকে গুঁড়ো করা হয়। এ কাজে অনেক শক্তির প্রয়োজন হয়। গ্রামের মহিলারা গাইল-ছিয়া দিয়ে কাজ করার সময় মেয়েলি গীত গেয়ে থাকেন।

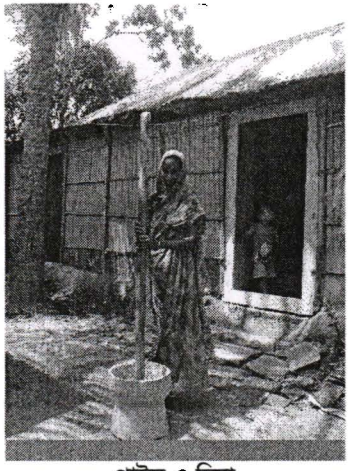

গাইল ও ছিয়া

৯. মাছ ধরার যন্ত্র

মাছ বাঙালির প্রিয় খাদ্য। মাছ ধরার জন্য মানুষ যেমন বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করে, তেমনি বিভিন্ন প্রকার সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করে। বাঙালি খালি হাতে মাছ ধরতে পটু।

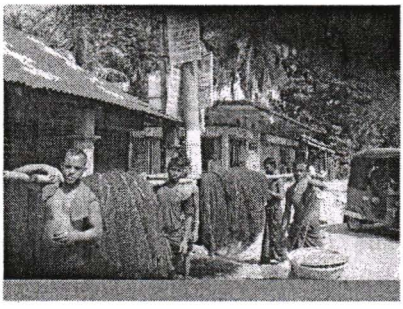

মাছ ধরার জাল

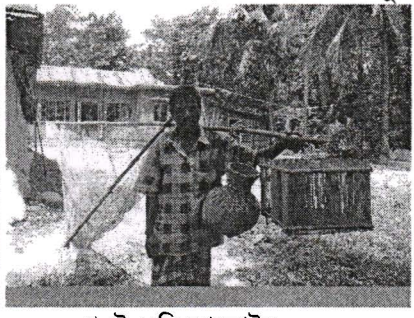

খলই, ডরি, কাকরাইন

এছাড়া জল সেঁচে মাছ ধরার প্রাচীন রীতিও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমান। মাছ ধরার উপকরণগুলিকে উপাদানগত দিক থেকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

ক. বাঁশ-বেত-কাঠ দ্বারা নির্মিত উপকরণ যেমন– পোলো, খলই, ডরি. কাকরাইন প্রভৃতি।

www.pathagar.com

খ. ধাতু দ্বারা নির্মিত উপকরণ যেমন– বঁড়শি, কোঁচ প্রভৃতি।
গ. সুতো দ্বারা নির্মিত উপকরণ যেমন– বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির জাল যার মধ্যে ঝাঁকি জাল, বেড় জাল, পুরইন জাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১০. পালকি

মানুষ বহনের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বাহন। ১ বা ২ জন যাত্রী নিয়ে ২, ৪ বা ৮ জন বাহক এটিকে কাঁধে তুলে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে যায়। আধুনিক যানবাহন আবিষ্কৃত হওয়ার আগে অভিজাত শ্রেণির লোকেরা পালকিতে চড়েই যাতায়াত

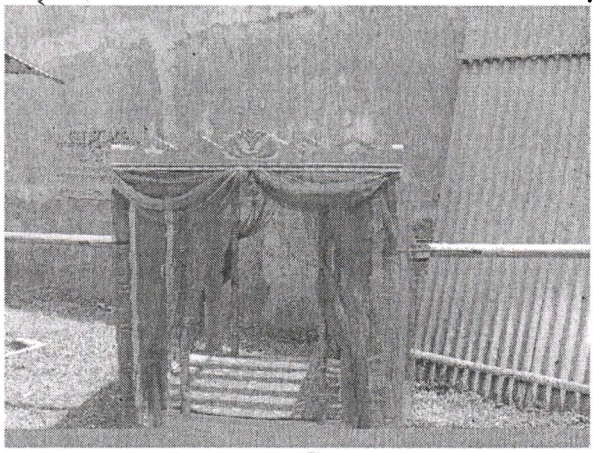

পালকি

করতেন। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বিয়ে ও অন্যান্য শুভ অনুষ্ঠানে পালকি ব্যবহার করার প্রথা চালু ছিল। এয়াড়া অসুস্থ রোগীকে চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যও পালকি ব্যবহৃত হতো।

ছুতাররা সেগুন কাঠ, শিমূল কাঠ প্রভৃতি দিয়ে পালকি তৈরি করে। বটগাছের বড় ঝুরি দিয়ে তৈরি করা হয় পালকির বাঁট বা বহন করার দণ্ড। পালকি বিভিন্ন আকৃতি ও ডিজাইনের হয়ে থাকে। সবচেয়ে ছোট ও সাধারণ পালকি যাকে ডুলি বলা হয়, ২ জনে বহন করে। সবচেয়ে বড় পালকি বহন করে ৪ থেকে ৮ জন পালকি বাহক। পালকি বাহকদের বেহারা বা কাহার বলা হয়।

বর্তমানে পালকি অতীত ঐতিহ্যের নিদর্শন বহন করছে। তবে মৌলভীবাজারের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজন এখনও বিয়ের অনুষ্ঠানে পালকির ঐতিহ্য বজায় রাখার চেষ্টা করছেন।

১১. ইমবাক

গোলাকার বেতের কাজ করা ছাতা। এই ছাতা মাথায় মণিপুরী মহিলারা দূরে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি যাতায়াত করতেন। এই ছাতা মাথায় দিলে ছাতার ভেতরে তারা

www.pathagar.com

দৃশ্যমান হয়ে ওঠবেন না। এমন সুচারু ছাতার ব্যবহার কমতে কমতে অদৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

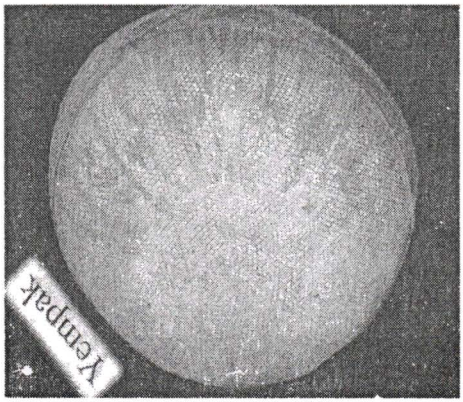

ইমবাক (বিলুপ্ত প্রায়)

www.pathagar.com

www.pathagar.com